NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

SELF LEARNING MATERIAL

UNDER GRADUATE DEGREE PROGRAMME

HBG 10

CC-BG-10

HONOURS IN BENGALI

সাহিত্যের রূপরীতি ও আন্দোলন

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাণ্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি. কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের মতই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি-প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক এবং কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (**HBG**)

কোর কোর্স ঃ **8**

CC-BG-10

মডিউল ঃ ১,২,৩,৪ **Module : 1,2,3,4**

প্রথম মুদ্রণ ঃ ....., ২০২৩

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষার ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (HBG)

কোর কোর্স ঃ 8 CC-BG-10

মডিউল ঃ ১,২,৩,৪ Module : 1,2,3,4

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

কোর কোর্স ঃ২ Core Course: 10	লেখক Course writer	সম্পাদনা Course Editor
মডিউলঃ ১ Module :1	ড. গোবর্ধন অধিকারী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চোপড়া কমলাপাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়	অধ্যাপক মনন কুমার মন্ডল বাংলা বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউলঃ ২ Module : 2	ড. মৃদুল হক, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়	
মিডিউলঃ ৩ Module : 3	অর্পিতা ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি, বীরভূম	
মডিউলঃ ৪ Module : 4	ড. শান্তনু মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

বাণীমঞ্জরী দাস, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বেথুন কলেজ, কলিকাতা

ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা

ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা

আব্দুল কাফি, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ ও

অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ

নিবন্ধক (কার্যকরী)

²Ì̸þyþ˜

~£z þyàþé/é¢,„þ̀ì˜îû ¢›%ëû þºc ˜þy!‹ ¢%¦þy¡ì ›%=þ !îÙ»!îÄyìëûîû myîûy ¢,îû!Çþþ Ð !îÙ»!îÄyëû „þ,Åþþ̀ìÇþîû !!„þ x˜%›!þ Šéyþy ~îû „þyì˜y x,ìŸîû þ%˜›%Åo' îy „þyì˜y¦þyìî þzå•,!þ ¢Á)'Å !˜!¡ìå•Ð

þ. x!¢þ îîû' xy£z‰þ !˜îr•„þ S„þyëÅ„þîû#V

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

UG : স্নাতক পাঠক্রম (বাংলা)
(HEC)

বাংলা সাহিত্য
Course :
Course Code : CC-BG-10

মডিউল - ১ : কাব্য ও নাটক

একক ১	❐ কাব্য-কবিতা ও মহাকাব্য	9 – 14
একক ২	❐ গীতিকাব্য	15 – 19
একক ৩	❐ কবিগান	20 – 25
একক ৪	❐ সনেট	26 – 29
একক ৫	❐ নাটকের বিভিন্ন সংরূপ	30 – 34
একক ৬	❐ কমেডি প্রহসন	35 – 40
একক ৭	❐ কাব্যনাট্য	41 – 43
একক ৮	❐ সামাজিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক	44 – 50
একক ৯	❐ একাঙ্ক নাটক ও এবসার্ড	51 – 55
একক ১০	❐ বেতার নাটক	56 – 61

মডিউল - ২ উপন্যাস ও ছোটগল্প

একক ১১	❐ নকশা, নভেল ও রোমান্স	65 – 72
একক ১২	❐ ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস	73 – 81
একক ১৩	❐ আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস	82 – 90
একক ১৪	❐ চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস ও পত্রোপন্যাস	91 – 99
একক ১৫	❐ ছোট গল্পের প্রকৃতি	100 – 108
একক ১৬	❐ ছোটগল্প ও রূপকথা	109 – 115
একক ১৭	❐ অণুগল্প	116 – 122

মডিউল - ৩ প্রবন্ধ ও সমালোচনা

একক ১৮ ❐ বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ, ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ 125 – 134

একক ১৯ ❐ লঘু প্রবন্ধ, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 135 – 141

মডিউল - ৪ : সাহিত্যের রূপনীতি ও সাহিত্য আন্দোলন

একক ২৪ ❐ পাশ্চাত্য সাহিত্য আন্দোলনঃ ক্লাসিসিজম, রোম্যান্টিসিজম, রিয়ালিজম 145 – 152

একক ২৫ ❐ সুররিয়ালিজম, সিম্বলিজম, ন্যাচারালিজম ইত্যাদি সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা 153 – 158

একক ২৬ ❐ রিয়ালিজম ও সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম 159 – 163

একক ২৭ ❐ কল্লোল যুগ, হাংরি আন্দোলন 164 – 168

কোর কোর্স ১০
মডিউল ১
(কাব্য ও নাটক)

একক ১ ❑ কাব্য-কবিতা ও মহাকাব্য

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ কাব্য কবিতা কাকে বলে

১.৩ মহাকাব্য

১.৪ মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য

১.৫ মহাকাব্যের শ্রেণিবিভাগ

১.৬ আদি মহাকাব্য

১.৭ সাহিত্যিক মহাকাব্য

১.৮ আদি মহাকাব্য ও সাহিত্যিক মহাকাব্যের মধ্যে পার্থক্য

১.১ উদ্দেশ্য

আমরা এই অংশে কবিতা বিষয়ে সামগ্রিক ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করব। কবিতা কাকে বলে, কবিতার শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে জানার পাশাপাশি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত মহাকাব্য, গীতিকবিতা, সনেট, কবিগান ইত্যাদি বিষয়েও এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। কবিতার পাঠ্য চারটি সংরূপই একালে সেভাবে প্রচলিত নয়। একমাত্র গীতিকাব্য চর্চিত হয়ে থাকে। মহাকাব্য, কবিগান দুটি সংরূপই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিদায় নিয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর অক্ষম অনুকরণে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন মহাকাব্য লিখতে চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যিক মহাকাব্যের ধারা সেখানেই শেষ। কবিগানও অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকের ফসল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হওয়াই ছিল অনিবার্য। সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতাও একালে আর লেখা হয় না। কোনো কোনো কবি চেষ্টা করে লিখতে চান একালে। সুতরাং সাহিত্যের এই সংরূপগুলো সম্পর্কে সম্যকভাবে জানা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের একান্ত কর্তব্য। কবিতার এই প্রকারভেদগুলো পাঠের মাধ্যমে সাহিত্যের ঐতিহ্যময় এই ধারাগুলোকে আমরা জানতে পারব। সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের গতিপথকে বুঝতে এই পাঠ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কবিগানের মতো সমকালীন একটি বিষয়ের কেন উত্থান হয়েছিল এবং কেনই বা তা অবলুপ্ত হয়ে গেল তাও বর্তমান পাঠের মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

১.২ কাব্য বা কবিতা কাকে বলে

আমরা এই অংশে সাহিত্যের একটি সংরূপ কবিতার বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব। কবিতা কী তা এককথায় বলা একটু অসুবিধাজনক। বলা যায় ছন্দ, অলঙ্কার মিলিয়ে খুব অল্প কথায় যখন আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি সাহিত্যের যে সংরূপে (genre) তাকেই কবিতা বলে। এখন কবিতা সব-সময় ছন্দ-অলঙ্কার মিলিয়ে নাও লেখা হতে পারে। অন্তত একালে কবিতায় বিধিবদ্ধ ছন্দ প্রয়োগ কবিরা বেশি করেন না। জগৎ ও জীবনের রহস্যকে পাঠকের কাছে উপস্থিত করে আনন্দ দান করাই কবিতার লক্ষ্য। কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতার একটি আকর্ষণীয় সংজ্ঞা দিয়েছেন- "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings". সংস্কৃত আলঙ্কারিক ভামহ, মম্মটভট্ট, বিশ্বনাথ কবিরাজ, কুন্তক প্রমুখের ভিন্ন ভিন্ন মতামতকে একত্র করে বলা যায় শব্দ, অর্থ, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার সংশ্লেষকে বলা যায় কবিতা। কবি কালিদাস একেই বলেছেন 'অর্ধনারীশ্বর'। এই চিত্রকল্পে দেবী পার্বতী ও পরমেশ্বর শিবের মধ্যে পার্বতী হল 'শব্দ' আর শিব হল 'অর্থ' বা 'ব্যঞ্জনা'। সুতরাং "শব্দ ও অর্থের সহযোগে মানবমনের ভাবকল্পনা যখন অনুভূতিরঞ্জিত যথাবিহিত শব্দবিন্যাসে তথা অর্থব্যঞ্জনায় ছন্দোময় রূপ পরিগ্রহ করে তখন আমরা তাকে বলি কবিতা"। [কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ২৪।]

কাব্য বা কবিতার বিষয়বস্তুগত দুটি ভাগ আছে- মন্ময় বা গীতিকবিতা (subjective বা lyrical) এবং তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ কবিতা (objective বা impersonal)। যে কবিতায় কবির আত্মগত মনোভাব বা কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে মন্ময় কবিতা বলে। আর কবিতার মধ্যে কবি বহির্জগতের বিষয়বস্তু বা ঘটনাবলীকে যখন স্থান দেয়, তখন তাকে তন্ময় কবিতা বলে। মন্ময় কবিতা কবির অন্তর্মুখী মনের এবং তন্ময় কবিতা কবির বহির্মুখী মনের পরিচয় বহন করে। আমাদের পাঠ্য মহাকাব্য তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ কবিতার উদাহরণ। গীতিকাব্য, সনেট ইত্যাদি মন্ময় বা গীতিকবিতার উদাহরণ।

১.৩ মহাকাব্য

পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক অর্থাৎ জাতীয় ইতিহাসের ঘটনা বা আখ্যানবস্তুকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ওজস্বী অর্থাৎ গুরুগম্ভীর ভাষায় শৌর্য-বীর্যের যে কাহিনি কাব্যময় ভাষায় রচনা করা হয় তাকে মহাকাব্য বলে। অ্যারিস্টটল (৩৮৪ খ্রি:পূ:–৩২২ খ্রি:পূ:) তাঁর 'Poetics' গ্রন্থের ২৩নং অধ্যায়ে মহাকাব্য বিষয়ে বলেছেন- "মিতছন্দে রচিত বর্ণনাত্মক কাব্যের (অর্থাৎ মহাকাব্য)- সঙ্গে ট্রাজেডির বেশ কিছু ঐক্য আছে। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রিয়াকে ভিত্তি করে নাটকীয় রীতিতে কাহিনিটি গঠিত হবে, তার থাকবে আদি, মধ্য ও অন্ত; সমস্ত কাহিনির মধ্যে থাকবে একটি জৈব্য ঐক্য আর তার (উপভোগের) আনন্দ হবে বিশিষ্ট। ইতিহাসের থেকে এদের গঠন আলাদা"। [অ্যারিস্টটল, কাব্যতত্ত্ব, অনু, শিশিরকুমার দাশ, প্যাপিরাস, ২০০৯, পৃ. ৮২।]

ড্রাইডেন মহাকাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন- "A heroic poem which epitomizes the feeling of many ages and voices the aspirations and imagination of all people".

বাংলা 'মহাকাব্য' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'epicos' থেকে উদ্ভূত 'epic' শব্দের বাংলা তর্জমা হয়ে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় 'epic' শব্দের অর্থ 'epic, long narrative poem recounting heroic deeds,' এবং মহাকাব্যের শরীরে কী কী স্থান পেতে পারে সে বিষয়ে বলা হয়েছে- 'An epic may deal with such various subjects as myths, heroic legends, histories, edifying religious tales, animal stories, or philosophical or moral theories.'

১.৪ মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য

মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে আলোচনা করা হল-

ক) পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক কোনো আখ্যানবস্তুকে কেন্দ্র করে মহাকাব্যের কাহিনি সৃষ্টি হবে।

খ) এই কাব্যের নায়ক হবে কোনো উচ্চবংশজাত বা কোনো দেবতা বা কোনো ধীরোদাত্ত নায়কের জীবন ও কীর্তিকে অবলম্বন করে আখ্যান রচিত হতে পারে।

গ) বীরোচিত ছন্দে এর কাহিনি রচিত হবে। অ্যারিস্টটল এ বিষয়ে স্পষ্ট বলেছেন যে "মহাকাব্যের উপযোগী ছন্দ হল শূরছন্দ বা ষট্‌পদী। যদি অন্য কোন বা একাধিক ছন্দে কেউ মহাকাব্য রচনা করতে চান তার ফল তৃপ্তিদায়ক হবে না। শূরছন্দই সবচেয়ে গম্ভীর, সবচেয়ে রাজকীয়, এর মধ্যেই অপরিচিত শব্দ ও রূপক ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য সবচেয়ে বেশী-..."। [অ্যারিস্টটল, কাব্যতত্ত্ব, অনু. শিশিরকুমার দাশ, প্যাপিরাস, ২০০৯, পৃ. ৮৪।]

ঘ) পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করার ফলে মহাকব্যের ভাষা হবে ওজস্বী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। অর্থাৎ ভাষার মধ্যে অতীতের বা পৌরাণিক পরিবেশকে স্পষ্ট করার জন্য কবি শব্দচয়নে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখবেন।

ঙ) আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত এক অখণ্ড ও সংহত কাহিনি মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ।

সংস্কৃত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থে মহাকব্যের আরও কয়েকটি লক্ষণের কথা বলেছেন-

ক) সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে মহাকাব্য কমপক্ষে ৯টি এবং সর্বাধিক ৩০টি পর্যন্ত সর্গে রচিত হতে পারে। প্রতিটি সর্গ একই ছন্দে রচিত হবে। তবে সর্গের শেষের দিকে অন্য ছন্দ ব্যবহৃত হতে পারে। প্রতিটি সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের সূচনা থাকবে।

খ) মহাকাব্যের সূচনায় আশীর্বচন, নমস্ক্রিয়া, বস্তুনির্দেশ ইত্যাদি থাকতে পারে।

গ) মহাকাব্যের প্রধান রস শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত। তবে এদের মধ্যে একটি প্রধান রস হলে অন্যগুলো হবে অঙ্গীরস।

ঘ) অলঙ্কার থাকবে।

সুতরাং বলা যেতে পারে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের মহাকাব্য বিষয়ক আলোচনায় গুরুতর কোনো পার্থক্য ধরা পড়ে না। মহাকাব্য কোনো একটি জাতির ইতিহাসকে বিস্তৃতকালে ধারণ করে রাখে। মহাকাব্য পাঠের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট জাতির প্রাথমিক পরিচয় সম্বন্ধে পাঠক ধারণা করতে পারে। জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় চরিত্র মহাকব্যের মধ্যে ধরা পড়ে। জাতির বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনিও মহাকাব্য ধারণ করে রাখে। অনেক সময়ই মহাকাব্য কোনো একজন লেখকের নয়, বহু লেখকের লেখনীর ফল হিসেবেও সার্থক রূপ পায় বা পরিপূর্ণ আকার ধারণ করে।

১.৫ মহাকাব্যের শ্রেণিবিভাগ

অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে মহাকাব্যের দুটি শ্রেণিবিভাগের কথা বলেছেন। মহাকাব্যের কাহিনি দু'প্রকার হতে পারে। একটি হল- সরল ও অন্যটি জটিল। তিনি হোমারকে মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে হোমারের 'ইলিয়াড' হল সরল এবং 'ওডিসি' হল জটিল মহাকাব্যের উদাহরণ।

মহাকাব্যের আর এক প্রকার শ্রেণিবিভাগ হল- আদি মহাকাব্য বা প্রাচীন মহাকাব্য বা Primary Epic বা Authentic Epic বা Epic of Growth। আর অন্যটি হল সাহিত্যিক মহাকাব্য বা Literary Epic বা Secondary Epic। আদি মহাকাব্য বা প্রাচীন মহাকাব্য হল যা যুগে যুগে শ্রুতির মাধ্যমে বাহিত হয়ে জাতীয় জীবনের কথা তুলে ধরে। যুগে যুগে লোকের মুখে মুখে গীত ও পঠিত হয়ে কলেবরে বৃদ্ধি পেতে পেতে কোনো এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির হাতে তা খ্যাতি লাভ করে। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত জাতীয় জীবনের গড়ে ওঠা বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এই জাতীয় কাব্যে ধরা পড়ে। যেমন, হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'। আমাদের দেশের বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ' ও ব্যাস রচিত 'মহাভারত'।

সাহিত্যিক মহাকাব্য বা Literary Epic হল কোনো একজন কবির সুউচ্চ কল্পনা ও ব্যতিক্রমী মননের ফসল। অতীতের কাহিনির পুনর্নির্মাণে বা প্রাচীন কাহিনিতে নব যুগের চেতনা আরোপের ফলে তা নতুন ভাবে পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। আদি মহাকাব্যের মতো বিপুল আয়তন এর থাকে না। মুখে মুখে যুগ যুগ ধরে বাহিত হবার ব্যাপারও সাহিত্যিক মহাকাব্যের থাকে না। আধুনিক কালের কোনো কবি যখন প্রাচীন কাহিনি বা ইতিহাস অবলম্বন করে তার মধ্যে নবযুগের ভাবনা আরোপ ক'রে প্রাচীন মহাকাব্যের ধারায় মহাকাব্য রচনা করতে চান, তখনই তা সাহিত্যিক মহাকাব্য হয়ে ওঠে। যেমন- ভার্জিলের 'ঈনিড', ট্যাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড', মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'মেঘনাদবধ মহাকাব্য'।

১.৬ আদি মহাকাব্য

'ইলিয়াড' মহাকাব্যে গ্রিক সুন্দরী হেলেনকে কেন্দ্র করে গ্রিস এবং ট্রয় দুই রাজ্যের মধ্যেকার যুদ্ধের কথা আছে। ২৪টি সর্গে গ্রিক ভাষায় হোমারের এই কাব্য রচিত। গ্রিসের পক্ষে বীর সেনা ছিল অ্যাকিলিস

এবং ট্রয়ের পক্ষে ছিল হেক্টর। যুদ্ধের শেষ দিকে অ্যাকিলিস কর্তৃক হেক্টর নিহত হন এবং ট্রয় রাজ্যের পরাজয় নিশ্চিত হয়। গ্রিক সেনারা ট্রয় নগরীতে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এই মহাকাব্যে দুই রাজ্যের দুই বীরের বীর্যবত্তা, জাতীয় সংকটের চিত্র এবং অতিলৌকিক ক্রিয়াকলাপ চিত্রিত হয়েছে। 'ওডিসি' মহাকাব্যে ইথাকা দ্বীপভূমির রাজা ওডিসিয়াস ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যেসব অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল তার বর্ণনা আছে। 'ওডিসি'ও ২৪টি সর্গে রচিত। ওডিসিয়াসের এই বাড়ি ফেরা প্রায় দশ বছর ধরে চলে এবং তাকে রাস্তায় অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ওডিসিয়াসের পুত্র ট্যালেম্যাকাস এবং স্ত্রী পেনেলোপের কথাও আছে এখানে। এই দুই মহাকব্যের মধ্যে ধরা পড়েছে প্রাচীন গ্রিসের জাতীয় জীবনের কাহিনি নিজস্ব সত্তাসহ। এই দুই মহাকাব্য খ্রি: পূ: অষ্টম থেকে খ্রি: পূ: সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বলে অনুমান করা হয়। এক কথায় বলতে গেলে হোমারের এই দুই মহাকাব্যে প্রাচীন গ্রিসের জাতীয় জীবনের কাহিনি, তাদের বীরত্বের কাহিনি ধরা আছে।

আবার 'রামায়ণ' মহাকাব্যে সীতার অপহরণকে কেন্দ্র করে রাম-রাবণের যুদ্ধ ও তাঁদের বীরত্বের কাহিনি বলা হয়েছে। অযোধ্যা এবং লঙ্কা এই দুই রাজ্যের জাতীয় জীবনের কথা এই কাব্যে ধরা পড়েছে। অন্যদিকে 'মহাভারতে' আছে কৌরব এবং পাণ্ডব পক্ষের লড়াই এবং সামাজিক জীবনের জটিলতার কাহিনি। প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক প্রথা থেকে সংস্কার সমস্ত কিছুই মহাভারতে আছে। তাই প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে'। অর্থাৎ মহাভারতের গল্পে যা পাওয়া যায় না, তা ভারতের কোথাও পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ সমগ্র জাতির জীবনকথা প্রাচীন বা আদি মহাকাব্যে বিধৃত হয়- এ তারই প্রমাণ।

১.৭ সাহিত্যিক মহাকাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ মহাকাব্য' (১৮৬১) সাহিত্যিক মহাকাব্যের উদাহরণ। আদি মহাকাব্য বাল্মীকিকৃত 'রামায়ণে'র লঙ্কাকাণ্ড থেকে মধুসূদন কাহিনির বীজ গ্রহণ করেছেন। রাবণপুত্র মেঘনাদের বধ এই কাহিনির মূল উপজীব্য বিষয়। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে উপাদান গ্রহণ করলেও মধুসূদন এটিকে তাঁর কালের প্রেক্ষিতেই নির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ আধুনিক মনন কাব্যদেহে প্রবেশ করেছে।

মধুসূদনের কাব্যে রাম নয় রাবণ অনেক বেশি পাঠকের সহানুভূতি কুড়িয়ে নিয়েছে। মেঘনাদের প্রতি দুর্বলতা মধুসূদনের ছিল। অর্থাৎ মধুসূদন আর্য মহাকাব্যের চিরকালীন আদর্শকে উপেক্ষা করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে রাক্ষস রাবণকে অনেক বেশি মানুষ রূপে চিত্রিত করলেন। পাঠকের দৃষ্টি দেবতাপ্রতিম রাম থেকে রাবণের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। নয়টি সর্গে রচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্যে কবি প্রাচ্য আদর্শের তুলনায় পাশ্চাত্য আদর্শকে বেশি গ্রহণ করেছেন। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট', ভার্জিলের 'ঈনিড', গ্রিক পুরাণ ইত্যাদি তাঁকে বেশি প্রভাবিত করেছে। অনেক সমালোচকের মতে 'মেঘনাদবধ' আদর্শ মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের আদর্শ অনুযায়ীও এটি মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি বলে তাঁদের মত। তাঁদের যুক্তি- মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' সমাপ্ত হয়েছে ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে, মিলনাত্মক পরিণতি এখানে নেই- যা মহাকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যে রাম নয়, রাবণ নায়কের স্থান দখল

করে নিয়েছে। আর রাবণ অনার্য বংশজাত। অর্থাৎ উচ্চবংশ সম্ভূত নায়ক এখানে পাওয়া গেল না। আরও অভিযোগ মধুসূদনের কাব্য ছন্দের বৈচিত্র্য নেই, যা মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়।

১.৮ আদি মহাকাব্য ও সাহিত্যিক মহাকাব্যের মধ্যে পার্থক্য

আদি মহাকাব্যের সঙ্গে সাহিত্যিক মহাকাব্যের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মহাকাব্যের এই দুই সংরূপের প্রকৃতি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে-

ক) আদি মহাকাব্য প্রাচীন কালের কোনো ঘটনা বা ইতিহাসকে অবলম্বন করে রচিত হয়। ফলত এতে কোনো জাতির দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি অঙ্কিত হয়। অন্যদিকে সাহিত্যিক মহাকাব্য তুলনায় আধুনিক।

খ) আদি মহাকাব্য কোনো একজন কবির নামে প্রচলিত হলেও তা কোনো কবির একক সৃষ্টি নয়। এতে মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্যও যুক্ত হয়। সাহিত্যিক মহাকাব্য একক কবির সৃষ্টি।

গ) আদি মহাকাব্যের নায়ক অনেকক্ষেত্রে অতিমানব চরিত্র হয়ে থাকে। প্রায় দেবতার স্থানে নায়ক চরিত্রদের বসানো হয়। সাহিত্যিক মহাকাব্যের নায়ক চরিত্র মানুষ হিসেবেই চিত্রিত হয়ে থাকে।

ঘ) আদি মহাকাব্যের উপাদান, গঠন ইত্যাদি অনুসারে রচিত হলেও সাহিত্যিক মহাকাব্য কবির সচেতন সাহিত্য প্রচেষ্টার ফল। তাই সাহিত্যিক মহাকাব্যে পাণ্ডিত্য ও কবির পরিশীলিত মনের ছাপ থেকে যায়। বিপরীতে আদি মহাকাব্যে পাণ্ডিত্যের ছাপ না থাকায় সেখানে একটা সরলতা, সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা যায়।

ঙ) আদি মহাকাব্যের আখ্যান যুগের পর যুগ ধরে বাহিত হয়ে আসে বলে অনেকক্ষেত্রেই এতে যুক্তিবোধ রক্ষিত হয় না। যা সাহিত্যিক মহাকাব্যে সম্ভব।

চ) আদি মহাকাব্যের সময়ের বিশালতা, বিস্তৃত ইতিহাস, দেশ-জাতির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সাহিত্যিক মহাকাব্যে দেখা যায় না।

মহাকাব্য একালে আর লেখা হয় না। কারণ একালে মহাকাব্য লেখা যেমন সম্ভব নয়, তেমনই পাঠকের কাছেও তা উপভোগ্য হয়ে উঠবে না। আসলে যুগের চাহিদা অনুযায়ীই সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদির চরম বাড়াবাড়ির যুগে এবং প্রবল যুক্তিবাদের যুগে উচ্চবংশজাত জাতীয় বীর যেমন পাওয়া অসম্ভব, তেমনি সেই বীরের বীরত্বকে নিরঙ্কুশ ভাবে মেনে নেওয়া পাঠকের পক্ষে আরও অসম্ভব। ফলত বর্তমান সময়ে মহাকাব্য লেখার মতো পরিবেশ-পরিস্থিতি নেই। আমরা দেখেছি মধুসূদন দত্ত মহাকাব্য লিখে 'মহাকবি' হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্বকবি' উপাধি পেয়েও মহাকাব্য না লেখায় তাঁকে 'মহাকবি' বলা যায় না। এর কারণ মাইকেল মধুসূদন দত্তর (১৮২৪-১৮৭৩) থেকে কিছু সময় পরে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আরও কিছু পরে কলম ধরেছিলেন; যে সময়টা মহাকাব্য রচনার উপযুক্ত সময় ছিল না। আগামীদিনেও মহাকাব্য লেখা হবে না বলেই মনে হয়।

একক ২ ❑ গীতিকাব্য

গঠন

২.১ গীতিকাব্য কাকে বলে

২.২ গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য

২.৩ গীতিকবিতার সাধারণ পর্যবেক্ষণ

২.৪ গীতিকবিতার শ্রেণিবিভাগ

২.৫ প্রাচীন ও আধুনিক গীতিকবিতার পার্থক্য

২.১ গীতিকাব্য কাকে বলে

"যে কবিতায় কবি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিকে এক সাবলীল ও আন্তরিক গীতিপ্রবণ ভাষায় ব্যক্ত করেন তাই মন্ময় বা গীতিকবিতা। কবির প্রগাঢ় ব্যক্তিক উপলব্ধির ধারক ও বাহক এই গীতিকবিতা বা lyric"। [কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, নভেম্বর ২০০৯, পৃ.৩১।] ইংরেজি 'লিরিক' শব্দেরই বাংলা প্রতিশব্দ গীতিকবিতা। আর এই লিরিক শব্দের উৎপত্তি lyre বা বাদ্যযন্ত্র থেকে। বীণা বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে প্রাচীন গ্রিসদেশে গায়ক ব্যক্তিগত অনুভবকে প্রকাশ করতেন। এই lyre থেকেই lyric বা গীতিকবিতার উদ্ভব। শ্রীশচন্দ্র দাশ গীতিকবিতা বিষয়ে বলেছেন- "অধুনা, যে-কবিতায় কবির আত্মানুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা তাঁহার প্রাণের অন্তঃস্তল হইতে আবেগ-কম্পিত সুর অখণ্ড ভাবমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকেই গীতিকবিতা বলে"। [শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত্য-সন্দর্শন, ১৯৫৭, পৃ.৫৭-৫৮।] আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেছেন-"যখন হৃদয়, কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয় না। ... যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকুই গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। ... যাহা অবক্তব্য, তাহাতে গীতিকবিতার অধিকার"।

২.২ গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য

ক) কবির একান্ত আত্মগত মনোভাবের প্রকাশই হল গীতিকবিতা। এই আত্মগত মনোভাবকে ভাষাগত রূপ পেয়ে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হবে পাঠকের কাছে বা শ্রোতার কাছে।

খ) গীতিকবিতা কবির আত্মগত ভাবের বহিঃপ্রকাশ হলেও তার সর্বজনীন চরিত্র বজায় থাকবে।

গ) গীতিকবিতা মনের বহিঃপ্রকাশ, মননের নয়। অর্থাৎ এই জাতীয় কবিতা চিন্তামূলক নয়, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়।

ঘ) কবির আত্মগত ভাবপ্রকাশের বাহন হলেও এই কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশপ্রীতি, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ও স্থান পেতে পারে অনায়াসে।

ঙ) কবি ও পাঠকের মধ্যে নিবিড় রসসংযোগ হলেই গীতিকবিতার আনন্দানুভূতি সার্থক রূপ পায়।

চ) গীতিকবিতায় গীত হবার লক্ষণ থাকলেও শব্দের প্রাধান্য এখানে অনস্বীকার্য। গীতিকবিতায় কথা ও সুরের সমন্বয় অনিবার্য। গানের মতো কেবলমাত্র সুরের প্রাধান্য থাকবে না।

২.৩ গীতিকবিতার সাধারণ পর্যবেক্ষণ

পাশ্চাত্যের কাব্য-কবিতা সম্বন্ধে প্রভূত আলাপ আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। জনসন কাব্য-কবিতাকে বলেছিলেন এমন এক প্রকার 'metrical composition' যা 'the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to help reason'। স্টুয়ার্ট মিল বলছেন, 'কাব্য কী?', but the thought of words in which emotion sponteniously embodies itself? আবার ম্যাকুলে বলেছিলেন কবিতার মাধ্যমে আমরা 'we mean the art of employing words in such a manner as to produce an illusion on the imagination, the art of doing by means of words what the painter does by means of colours'.। কার্লাইল কবিতাকে বলেছিলেন musical thoughts। পাশ্চাত্য রোম্যান্টিক কবিকুলের দৃষ্টিভঙ্গিতেও কাব্য-কবিতার গভীর তাৎপর্য ধরা পড়েছিল। শেলী বলেছিলেন— in a general sense may be defined as the expression of imagination and the passions। অন্যদিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে কবিতা হল— is the breath and spirit of all knowledge এবং the impassioned expression which is in the countenance of all science.। অর্থাৎ কাব্যকলাকে উৎকর্ষের নিরিখ হিসেবে দেখা হয়েছিল যার মর্মবস্তু বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা নিষ্ণাত জীবনাভিজ্ঞতাকেও ছাপিয়ে যায়। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের উদ্ভব বহু প্রাচীন। কাব্যকলার সংরূপ ও সৌন্দর্যবিচারের 'কাব্যত্ব' আলোচনার যে বিপুল ক্ষেত্র বিস্তৃত রয়েছে এই পাঠক্রমের অন্যত্র সে বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকদের আলোচনাতেও কাব্যকে সকল কলার ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছে যার মর্মার্থ কেবলমাত্র সুযোগ্য পরিশীলিত পাঠকের পাঠের মাধ্যমের যথার্থভাবে প্রস্ফুটিত হতে পারে।

গীতিকবিতায় একান্তই কবির নির্জনে বসে রচিত কোনো একটি ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যেখানে কবির ভাবনার কোনো জটিলতা থাকে না বলা যায়। মানবীয় কোনো অভিব্যক্তির সঙ্গে কবির নিজস্ব মনোমুকুরের অনুভূতি যুক্ত হয়ে গীতিকবিতার সৃষ্টি হয়। বলা যায় যেখানে কবির বস্তুনিষ্ঠভাবে কিছুই বলার নেই, অথচ তিনি কোনো একটি বিশিষ্ট মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে একটিমাত্র ভাবকে কেন্দ্র

করে অনেক কিছুই বলেন বা বলতে পারেন শব্দ সহযোগে তখনই তা গীতিকবিতা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে বলেছেন-''যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ, ঐ যেমন বিদ্যাপতির- ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর,- সে-ও আমাদের মনের বহু দিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা বাদলে ভাদ্রমাসে শূন্যঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ফিরিয়াছে; যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল অমনি সকলেরই এই অনেক দিনের কথাটা মূর্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল''। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''সাহিত্যদ, 'সাহিত্যসৃষ্টি'।] রবীন্দ্রনাথ তাঁর ''লোকসাহিত্য'' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধে বলেছেন- গীতিকবিতাই বাংলাসাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। অর্থাৎ বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে গীতিকবিতার প্রাধান্য ছিল। বৈষ্ণব পদাবলী তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

গীতিকবিতা কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ হলেও তার মধ্যে একটি সর্বজনীন ভাব থাকবে। অর্থাৎ সার্থক লিরিক কবিতায় কবির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের কথা নয়, সমষ্টির জীবন-ভাবনা প্রতিফলিত হবে। কবির একান্তই ব্যক্তিগত কথা হলে তা পাঠককে আকৃষ্ট করবে না, পাঠকের মনোহরণ করতে পারবে না। প্রাচীনকালে গ্রিসে ডায়োনিসীয় উৎসব উপলক্ষ্যে গাওয়া হোত Chorus Lyrics বা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের Psalms ইত্যাদি সমষ্টির সঙ্গীত বা যূথসঙ্গীত। আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এই সমষ্টি বা যূথসঙ্গীতের বিষয়টি হারিয়ে যেতে বসেছে। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যক্তি কবির একাকিত্ব বা বিচ্ছিন্নতা ক্রমাগত বেড়েছে। ফলে গীতিকবিতায় সমষ্টির কথা বাদ গিয়ে স্থান পেয়েছে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা।

এমন কিছু কবিতা দেখা যায় যেখানে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি গীতিকবিতার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি। অনেকসময় কোনো ঘটনা বা কোনো চরিত্র বা কোনো কাহিনি অবলম্বন করেও গীতিকবিতা লেখা হয়ে থাকে। এই জাতীয় গীতিকবিতাকে বলা যায় গীতি-গাঁথা। কবি মোহিতলাল মজুমদারের লেখা 'নবতীর্থঙ্কর' একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। কালিদাস রায়ের 'চাঁদসদাগর' একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে লেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিষ্ফল উপহার' একটি কাহিনিকে অবলম্বন করে লেখা। অর্থাৎ এই জাতীয় গীতিকবিতায় একক কবির আত্মগত ভাবনায় নির্দিষ্ট একটি বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করা হয়েছে বা কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে।

গীতিকবিতার মধ্যে কবি স্বকীয় আদর্শানুগ চরিত্র অঙ্কন করে থাকলে বা 'কোন বিষয়বস্তু অবলম্বনে চলমান জীবনালেখ্য' গীতিকবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলে তাকে বলে নাট্যগীতি। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বন্দীবীর' কবিতা। ব্রাউনিং-এর 'The Lost Leader' এবং টেনিসনের 'The Lady of Shalott'।

এবার আমরা গীতিকবির সঙ্গে মহাকবির তুলনামূলক আলোচনা করব। গীতিকবি আত্মগত এবং মহাকবি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে সর্বজনীন মানবতাকে প্রকাশ করে থাকেন। গীতিকবি যেখানে একমুখী ভাবনায় ভাবিত, মহাকবি সেখানে সহস্রচক্ষু হয়ে জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করতে পারেন।

২.৪ গীতিকবিতার শ্রেণিবিভাগ

গীতিকবিতার বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রেমমূলক, দেশপ্রেম কেন্দ্রিক, প্রকৃতিবিষয়ক, ভক্তিমূলক, বিষাদমূলক ইত্যাদি।

যে গীতিকবিতায় প্রেমই মুখ্য উপজীব্য বিষয় তাকে প্রেমমূলক গীতিকবিতা বলা হয়। প্রেমকে কেন্দ্র করে আশা-নিরাশা, ব্যথা-বেদনা যখন কবি আশ্রয় করেন, তখনই প্রেমমূলক গীতিকবিতা হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলী তো প্রেমকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। যদিও সেখানে প্রেমের আধ্যাত্মিক একটি রূপ ছিল। গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'রমণীর মন', দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'লাজ ভাঙান', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুপ্তপ্রেম' ইত্যাদি প্রেমবিষয়ক গীতিকবিতার উদাহরণ। ইংরেজি সাহিত্যে বার্নস-এর 'My love is like a red, red, rose', রবার্ট ব্রাউনিংয়ের 'The Last Ride Together' প্রেমবিষয়ক গীতিকবিতার উদাহরণ।

স্বদেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে কবি গীতিকবিতা রচনা করলে তাকে স্বদেশপ্রেমমূলক বা দেশপ্রেমমূলক গীতিকবিতা বলে। দেশের প্রতি ভালোবাসা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের অতীত বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি কবিকে দেশাত্মবোধক গীতিকবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করে। যেমন- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম্', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চল্ রে চল্ চল্ সবে ভারতসন্তান', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমার দেশ', অতুলপ্রসাদ সেনের 'ভারতলক্ষ্মী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারততীর্থ' ইত্যাদি।

প্রকৃতিপ্রেম বা নিসর্গপ্রীতির কবিতায় গীতিকবি প্রকৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করে থাকেন। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শকে কবি আত্মগতভাবে অনুভব করে যখন শব্দ ও বাক্যের সমন্বয়ে প্রকাশ করেন, তখনই তা প্রকৃতিপ্রেমমূলক গীতিকবিতা হয়ে ওঠে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দূরত্ব এখানে অতিক্রম করে যান কবি। প্রকৃতির রহস্য ও সৌন্দর্যকে গীতিকবি উপলব্ধি করে কবিতায় স্থান দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বর্ষামঙ্গল', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ঝর্ণা', মোহিতলাল মজুমদারের 'কালবৈশাখী', জীবনানন্দ দাসের 'রূপসী বাংলা' ইত্যাদি প্রকৃতিপ্রেমমূলক গীতিকবিতার উদাহরণ। শেলির 'To a Skylark', কিট্‌সর 'Ode to a Nightingale' ইত্যাদি ইংরেজি গীতিকবিতার প্রকৃতিপ্রেমের নিদর্শন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'প্রেম-প্রবাহিনী', 'সঙ্গীত শতক', 'নিসর্গ সন্দর্শন' কবিতায় প্রকৃতিপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আগে বিহারীলালের কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমমূলক গীতিকবিতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলা হয়ে থাকে।

ভক্তিমূলক গীতিকবিতায় ধর্ম বা ভক্তিভাবকে কেন্দ্র করে কবিতা লেখা হয়। যেমন- অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কোথা তুমি', রামপ্রসাদ সেনের 'পদাবলী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' ইত্যাদি ধর্মভাবনামূলক বা ভক্তিমূলক গীতিকবিতার উদাহরণ।

২.৫ প্রাচীন ও আধুনিক গীতিকবিতার পার্থক্য

কালের দিক থেকে বিচার করলে গীতিকবিতাকে প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন কালের গীতিকবিতায় একটি গোষ্ঠীচেতনা বা ব্যষ্টি চেতনার প্রতিফলন দেখা যায়। কবির আত্মগত ভাবনায় গোষ্ঠীর ভাবনা বা চেতনা প্রবেশ করত। যেমন বৈষ্ণব পদাবলী বা শাক্তপদাবলীর দিকে যদি চোখ রাখি তাহলে দেখা যায় পদকর্তারা তাঁদের সাধনমার্গের কথা প্রকাশ করেছেন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ভাবনায় ভাবিত হয়ে। আবার বৈষ্ণব বা শাক্তপদাবলী ইত্যাদি মধ্যযুগের গীতিকবিতাগুলো ছিল সুরযোগে গীত হওয়ার উপযুক্ত। গীত হবার জন্যই যেন সেগুলো রচিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁদের ধর্মীয় ভাবনা অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণের কথা ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগ ও আর্তি মিশিয়ে সংক্ষিপ্ত ও সংহতভাবে গীতিকবিতার সংরূপে প্রকাশ করেছিলেন। রাধা-কৃষ্ণ বা তজ্জনিত দর্শন কোনো একজন ব্যক্তির নয়, সমষ্টির বা একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাবনাকে প্রকাশ করে। আর সেই গোষ্ঠীগত ভাবনাকেই মধ্যযুগের কবিরা আত্মগত ভাবনায় প্রকাশ করেছিলেন গীত হবার জন্য, যাতে সকলের মধ্যে তা ছড়িয়ে যায় বা সকলেই সেই ভাবনায় ভাবিত হয়।

কিন্তু আধুনিক কালের গীতিকবিতায় গোষ্ঠী নয়, ব্যক্তির ভাবনা প্রধান্য পেয়েছে। গীত হবার জন্য নয়, আধুনিক গীতিকবিতা কবিতার সংরূপেই প্রকাশিত হতে থাকল। আধুনিক গীতিকবিতা গানের থেকেও বেশি কবিতা হয়ে উঠল। আধুনিক গীতিকবিতা হয়ে উঠল ব্যক্তিগত ভাবনা নির্ভর, স্বতঃস্ফূর্ত এবং মানসিক আবেদন সম্পন্ন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন তিরোহিত হয়ে গিয়ে মানুষের জীবনে প্রবেশ করেছে নানারকম জটিলতা, আত্মিক সংকট এবং বিছিন্নতাবোধ। ফলত গোষ্ঠীর কথা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে ত্যাজ্য এবং সেই স্থান অধিকার করেছে একান্তই ব্যক্তি-সংকটের কথা, দ্বিধা-দ্বন্দের কথা বিপন্নতার কথা। ফলত মধ্যযুগের বা প্রাচীনকালের বীণা যন্ত্র সহযোগে গীত হবার জন্য যে গীতিকবিতা রচিত হোত সেখানে সময়ের চিহ্ন বা কালের চিহ্ন থাকত না। কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতায় সমকালীন বিষয় স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ আধুনিক গীতিকবিতায় যুগধর্ম স্থান পেয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী একালের পাঠকের মন জয় করলেও আধুনিক গীতিকবিতার মতো তাঁর সমকালীন হবার লক্ষণ নেই। আর আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের জনক হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী।

গীতিকবিতা একলা কবির নির্জনে নিরালায় বসে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির ফসল। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ হয়ে আধুনিক যুগেও গীতিকবিতার জয়যাত্রা অব্যাহত। বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে জীবনানন্দ দাশ প্রত্যেকেই গীতিকবিতা লিখেছেন কালের চিহ্ন বহন করে।

একক ৩ ❑ কবিগান

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য ও ভূমিকা

৩.২ কবিগানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৩.৩ কবিগানের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য

৩.৪ কয়েকজন কবিগানের পরিচয়

৩.৫ কবিগানের দৃষ্টান্ত

৩.১ উদ্দেশ্য ও ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সমাপ্তি এবং আধুনিক যুগের সূচনার সন্ধিক্ষণে সাহিত্যের একটি নতুন সংরূপের সৃষ্টি হয় একেই কবিগান বলে। কবিগান আসলে কোনো সাহিত্যের সংরূপের মধ্যে পড়ে না। কবিগান হল প্রকৃতপক্ষে কবির লড়াই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ঝুমুর, কীর্তন, আঞ্চলিক জনপ্রিয় কোনো সঙ্গীতের সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে কবিগান রচিত হোত। বাংলার স্বাভাবকবিদের হাতে এই কবিগানের উদ্ভব। উচ্চ কোনো সাহিত্যিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়ে কবিগানের সৃষ্টি হয়নি। মূলত দুজন স্বভাবকবি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে, মূলত ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে গানের সুরে লড়াই করত; একেই বলে কবিগান বা কবির লড়াই। এই কবির লড়াইয়ে মূল কবির সঙ্গে আরও অনেকে থাকতেন যারা মূল কবিকে সাহায্য করতেন। এই এককে সংক্ষেপে সেই কাব্য-সংরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবিগান সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা শিক্ষার্থী গ্রহণ করেছেন।

৩.২ কবিগানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০)। আধুনিক যুগের প্রথম বা যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। এই দুই কবির সময়কালে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কবিগান বা কবিওয়ালাদের উত্থান এবং বিস্তারের সময়। এই সময় রাজনৈতিক পালাবদলেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। ১৫৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার পতন ঘটে। ইংরাজ ক্রমাগত ক্ষমতা দখল করতে থাকে। ফলত পূর্বের নবাবি শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং কলকাতা শহরে বণিক ইংরেজদের কেন্দ্র করে নতুন এক মোসাহেব

সম্প্রদায় বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তৈরি হয়। এই নতুন দেশীয় সম্প্রদায় ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্যবসা করে বা ইংরেজদের কোম্পানীতে কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে থাকে। এই নতুন আর্থিক সম্প্রদায়ের বিনোদনের জন্য এই কবিগান বা কবিওয়ালাদের উদ্ভব হয়। হঠাৎ করেই এই কবি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কোনোরকম প্রশিক্ষণ বা চর্চা ছাড়াই কিছু স্বভাবকবি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে কবিতা রচনা করে সুর সহযোগে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করত-এইভাবেই কবিগান বা কবিওয়ালার সৃষ্টি হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে তুর্কী আক্রমণের পর একটা শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়েছিল। ভালো কিছু সাহিত্য বা উচ্চমানের সাহিত্য এইসময় সৃষ্টি হয়নি। ১২০০-১৩৫০ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলে বলে পন্ডিতেরা অনুমান করেছেন। যেহেতু এই সময়কার উচ্চমানের কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এই কালটিকে অন্ধকার যুগ বা সুষুপ্তির কাল ইত্যাদি নামে পণ্ডিতেরা অভিহিত করে থাকেন। আবার একইরকম অবস্থা ঘটল অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বা পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭খি:) সময়। এই সময় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হল না। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সামাজিক স্থিরতাকে নষ্ট করায় সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও তার প্রভাব পড়া অনিবার্য। ভারতচন্দ্র তো এর আগেই বলেছিলেন- নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়? সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই কথার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এর ফলে মঙ্গলকাব্যর ঐতিহ্যশালী ধারার পর আমরা পেলাম কবিগান বা কবির লড়াই। হঠাৎ করে তৈরি হওয়া ইংরেজের মোসাহেব ব্যবসায়ীদের উন্মত্ত আনন্দের প্রয়োজন মিটিয়েছিল এই কবিগান ও কবিওয়ালারা। এইভাবেই যুগের প্রয়োজনেই কবিগানের উদ্ভব হয়েছিল। ফলত উনিশ শতকের প্রথমে কলকাতায় কবিগানের আসর বেশ জমে উঠেছিল। কবিগান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ-''বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবি-ওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় স্বল্প। একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়, এই কবির গানও সেইরূপ একসময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি-আকাশে আকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল- তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনো তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না''। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,''লোকসাহিত্য'',‘কবি-সংগীত’।]

কবিগানের সাহিত্যিক সংরূপ হিসেবে উঠে আসাকে মূলত পুরাতন কাব্যধারার অনুবর্তন হিসেবে দেখেছেন বাংলা সাহিত্যিক ইতিহাসকারেরা। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে– ''অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর থেকে ভাগীরথীর তীরবর্তী নাগরিক কেন্দ্র থেকে সদ্য-গঠিত কলকাতার বিত্তবান সমাজে একপ্রকার লঘু ধরনের গীতবাদ্য, যাত্রাপাঁচালী প্রভৃতির বিশেষ প্রচলন হয়েছিল। তখন পুরাতন ঐতিহ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছে। নতুন শিক্ষাব্যবস্থার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত হয়নি, অথচ নাগরিক সমাজের অনেকের হাতে কাঁচা টাকা জমেছে প্রচুর। সেই বিকৃতরুচির নাগরিকদের রসের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য একপ্রকার নাগরিক লোকগীতি, অভিনয় ও কাব্যকলার অনুশীলন হয়েছিল''। (বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, পৃ.২৬৮) অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে কবিগান কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকে মাইকেলের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত সেই ধারা আস্তে ধীরে চালু ছিল।

৩.৩ কবিগানের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য

ক) কবিয়ালরা গাম্ভীর্যপূর্ণ বা উচ্চস্তরের কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করেনি। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে ক্ষণিকের আনন্দ দান করা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-''কিন্তু ইংরাজদের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ-নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি,... তখন নূতন রাজধানীর নূতন-সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিকসম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমাদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না''। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,''লোকসাহিত্য'',‘কবিসংগীত’।]

খ) প্রতিপক্ষকে উত্তর দেওয়াই ছিল কবিয়ালদের কবিগান রচনার মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ প্রতিযোগিতার একটা ব্যাপার এর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

গ) কবিগানের জন্য দুটি দলে দুজন কবি থাকতেন। সঙ্গে অপ্রধান কবিরা থাকতেন। যাদেরকে দোহার বলা হয়। সঙ্গে কিছু বাদ্যযন্ত্রও থাকত।

ঘ) কবিগানের প্রথম উদ্ভব হয় ধর্মকে কেন্দ্র করে। কবিয়ালরা দেব-দেবীর বন্দনা করে গান শুরু করত। নিজেদের গুরুজনদেরও শ্রদ্ধা জানাতে ভুলত না তারা।

ঙ) কবিয়ালরা নির্দিষ্ট কিছু পদ আগে থেকেই তৈরি করে আসত। এরপর প্রতিপক্ষ যেরকম উত্তর দেবে কবিয়ালও ঠিক প্রত্যুত্তর তৎক্ষণাৎ বানিয়ে উত্তর দিত। এই ভাবেই কবির লড়াই জমে উঠত। প্রতিপক্ষের জুতসই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-শ্রোতাও আনন্দ উপভোগ করত। একজন কবি প্রথমে অপর দলের কবিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নের মাধ্যমে কবিতার আকারে কিছু ছুঁড়ে দিতেন। তারপর বিপরীত দিকের কবি তার প্রত্যুত্তর দিতেন ছন্দ সহযোগে কবিতার আকারে। প্রথম দলের কথাকে বলা হত ‘চাপান’, আর দ্বিতীয় দল যে উত্তর দিত তাকে বলা হত ‘উতোর’।

চ) প্রথমে দেব-দেবীর বন্দনা দিয়ে শুরু হলেও ক্রমাগত তা চলে যেত ব্যক্তিগত আক্রমণের দিকে। সামজিক বিভিন্ন বিষয় কবিগানের বিষয় হয়ে উঠত। সাহিত্যে বা সংস্কৃতিতে কবিগানের অবদান এখানেই যে, কবিগানে সমকালীন বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছিল। সামাজিক সমস্যা কবিদের লড়াইয়ের অন্যতম বিষয় ছিল।

ছ) রাজা বা জমিদার নয় কবিওয়ালারা সাধারণের অবসর বিনোদনের জন্য কবিগান রচনা করেছিল। অর্থাৎ বলা যায় বাংলা সাহিত্যে কবিওয়ালারাই প্রথম সাধারণের জন্য গান রচনা করলেন।

জ) পূর্ণাঙ্গ কবিগানে দশটির মতো পালা থাকত। যেমন- চিতেন, প্রচিতেন, ফুকা, মেলতা, মহড়া, শরওয়ারি, খাদ, দ্বিতীয় মহড়া, দ্বিতীয়ফুকা ও অন্তরা। উনিশ শতকের কবিগানের বিষয়বস্তু ছিল বন্দনা, সখিসংবাদ ও বিরহমূলক গান। ভবানীবিষয়ক লহর ও খেউড় গানও যুক্ত হয়েছিল এই সময়ে।

ঝ) পাঁচালি, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, বসা কবিগান, দাঁড়া কবিগান ইত্যাদি কবিগানের বিভিন্ন প্রকারভেদ।

৩.৪ কয়েকজন কবিওয়ালার পরিচয়

এই সময়কালের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কবিওয়ালা হলেন নিতাই বৈরাগী, নীলমণি পাটনী, বণরাম বৈষ্ণব, রামসুন্দর স্যাকরা, ভোলা ময়রা, জগন্নাথ বেনে, কেষ্টা মুচি, গুরো দুম্বো, ভীমদাস মালাকার, বলরাম দাস কপালী, মতি পসারী, এন্টনী ফিরিঙ্গি। এঁরা কেউই শিক্ষাদীক্ষায় উচ্চ অথবা আভিজাত্যে পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন না।

কবিগানের আদি কবিয়াল হিসেবে গোঁজলা গুঁই (১৭০৪-?)-এর নাম পাওয়া যায়। গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্য রঘুনাথ দাস (১৭২৫-১৭৯০)। রঘুনাথ দাস কবিগানকে শাস্ত্রীয় গানের নিয়মে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। যাকে বলা হয় দাঁড়া কবিগান। রঘুনাথ দাসের দুই শিষ্য হলেন রাসু রায় ও নৃসিংহ রায়। তবে রঘুনাথের আর এক শিষ্য হরু ঠাকুর (১৭৪৯-১৮২৪) কবিগানকে বেশ জনপ্রিয় করে তোলেন। হরুঠাকুর তাঁর গানের ভণিতায় গুরু রঘুনাথের নাম করতেন। হরু ঠাকুর মহড়া, চিতেন, অন্তরা, পরচিতেন ইত্যাদি ভাগে তাঁর গানগুলোকে ভাগ করেছিলেন।

নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১-১৮২১) ছিলেন আর একজন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভবানী বণিক। এরপরে উল্লেখযোগ্য কবিয়াল হিসেবে পাওয়া যায় রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮)-কে। রাম বসু কবিগানে কিছু পরিবর্তন আনেন। এর আগে রীতি ছিল কবিওয়ালারা আগে থেকেই নির্দিষ্ট কোনো বিষয় ঠিক করে রাখতেন যে কোন্ বিষয়ে সেদিন গান পরিবেশিত হবে। যাকে বলা হত 'বাঁধুটি'। রাম বসু এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রশ্নোত্তরের পর্ব চালু করেন। এরপরে পাওয়া যায় ভোলা ময়রা (১৭৭৫-১৮৫১), অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি (১৭৮৬-১৮৩৬) প্রমুখ কবিয়ালদের।

৩.৫ কবিগানের দৃষ্টান্ত

প্রাচীন কবিওয়ালা গোঁজলা গুঁই-এর কয়েক চরণ–

তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ
তুমি কমলিনী, আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝ আমি ভুজঙ্গ
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।।

হরু ঠাকুরের রচিত কবিগান–

''শ্যামের ঐ গুণেতে ঝোকেগো নয়ন।
সে যে বিপদে মধুসূদন।।
নাম ধরে, ত্রিসংসারে, ত্রিলোকো তারণ
মহাঘোরে বিপত্তি কালে।
যে ডাকে শ্রীকৃষ্ণ বোলে।।
সে সঙ্কটে কৃষ্ণ তারো করেন্ দুখো নিবারণ।।....."
[ড. শ্রীপ্রফুল্ল পাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গান।]

ভোলা ময়রার কবিগান–

''আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা,
(ওগো) সর্দি গর্মি নাহি মানি।
ফুরাইল বারমাস, ষড় ঋতুর হয় নাশ,
(ওগো) কেবল এই কথাটা জানি।।
শীত এলে লেপ লই গর্ম্মী এল ঘোল মই,
যাহা কিছু হাতে আসে 'কবির নেশায়' দিই ঢালি।।
শরতে হেমন্তে বৈশাখে বসন্তে,
ভোলার খোলা নাহি খালি।।..."
[ড. শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গান।]

কবিওয়ালাদের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন কবি ঈশ্বরগুপ্ত। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক প্রথম কবিগানের সংকলন প্রকাশ করেন তাঁর পত্রিকায়।

ঠাকুর সিংহ ও অ্যান্টনি ফিরিঙ্গীর মধ্যে কবির লড়াইয়ের একটি নমুনা-

ঠাকুর সিং বললেন-

''বলো হে অ্যান্টনি, আমি একটি কথা জানতে চাই
এসে এসে এদেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি টুপি নাই''।।

এর প্রত্যুত্তরে অ্যান্টনি বলছেন-

''এই বাঙলায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি
হয়ে ঠাকরে সিংহের বাপের জামাই কুর্তি টুপি
ছেড়েছি''।

ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কবিয়ালদের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে পড়েছিল, তাই তাদের আবির্ভাব ঘটে এবং কালের নিয়মে তাদের প্রস্থানও ঘটেছে। শিল্প-সাহিত্য যা চিরকালীন যা শাশ্বত তা

ব্যতীত কোনোকিছুকেই দীর্ঘদিন সহ্য করে না। কবিগানের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। উচ্চভাব, উচ্চদর্শন বা মানব হৃদয়ের শাশ্বত সৌন্দর্যবোধ কবিয়ালদের সংগীতে স্থান পায়নি, ফলে মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কবিয়ালদেরও বিদায় নিতে হয়েছে। স্থূলরুচির বিনোদন হাউই বাজির মতো হঠাৎ ঝলকানি দিয়েই বিদায় নেয়- এটাই কালের নিয়ম।

একক ৪ ❑ সনেট

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য ও ভূমিকা

৪.২ সনেটের সাধারণ লক্ষণ

৪.৩ সনেটের বৈশিষ্ট্য

৪.৪ বাংলায় সনেট চর্চা

৪.১ উদ্দেশ্য ও ভূমিকা

মন্ময় কবিতার অন্তর্গত কবিতার একটি সংরূপ সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। সনেট এমন এক ধরনের ক্ষুদ্র কবিতা যেখানে কবির ভাবনা সংহত ও অখণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়। সনেট শব্দটির উদ্ভব ইতালীয় 'সনেটো' বা মৃদুধ্বনি থেকে। সমদৈর্ঘ্যের চোদ্দটি পংক্তিতে ও একটি বিশেষ ছন্দরীতিতে যখন কবিমনের একটি অখণ্ড ভাবকল্পনা কাব্যরূপ লাভ করে তখন আমরা তাকে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা বলে চিহ্নিত করি। অধ্যাপক বেইন বলেছেন- "The Sonnet [diminutive from Italian 'sono'= sound] is a short lyrical poem complete in one stanza containing fourteen lines of five measured verse." [ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যপ্রসঙ্গ ও সমালোচনা বিচিত্রা,' করুণা প্রকাশনী, ১৪১৪, পৃ. ১০৫।] অর্থাৎ একটিমাত্র অখণ্ড ভাব চোদ্দ অক্ষর সমন্বিত হয়ে চোদ্দটি পংক্তিতে বিশেষ একটি ছন্দরীতিতে প্রকাশিত হলে তাকেই সনেট বলে। কাব্য-কবিতার ধারায় পাশ্চাত্যে সনেটের গুরুত্ব অসীম। ভাবঘন, সংহত অনুভূতিমালায় বিন্যস্ত পেত্রার্ক, শেক্সপীয়ারের সনেটগুলি আজও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই এককে আমরা 'সনেট' কাব্যরূপটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব এবং জেনে নেব এধরনের কাব্যের সাধারণ লক্ষণগুলি কী? প্রসঙ্গক্রমে বাংলা সনেটের দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করব।

৪.২ সনেটের সাধারণ লক্ষণ

সনেটের জন্ম দেন ইতালিতে চতুর্দশ শতাব্দীতে কবি পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪খ্রি:)। তবে সনেট রচনার সূচনা করেন ইংল্যান্ডের সারে এবং ওয়াএট। ইতালীয় সনেটকে পেত্রার্কীয় সনেটও বলা হয়ে থাকে। এই সনেটের দুটি ভাগ- অষ্টক (Octave) ও ষটক (Sestet)। অষ্টক অর্থাৎ আট পংক্তিতে প্রথম স্তবক রচিত হবে। ষটক অর্থাৎ ছয় পংক্তিতে পরবর্তী অংশ রচিত হবে। প্রথম আট পংক্তিতে মূল ভাববস্তুর আভাস দেওয়া হয় এবং পরবর্তী ছয় পংক্তিতে পূর্ববর্তী আভাসের উত্তর দেওয়া হয়। এইভাবে

চোদ্দ পংক্তিতে সনেট রচিত হয়। অনেকে আবার এই দুই পর্বের ভাগকে মান্যতা না দিয়ে একটি অখণ্ড রূপ দেন চোদ্দ পংক্তিতে। অষ্টকের আট পংক্তিকে আবার চার পংক্তি করে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই চার পংক্তির প্রতিটি ভাগের নাম চতুষ্ক বা Quatrain। একইরকমভাবে ষটকের তিন পংক্তি নিয়ে দুটি ভাগ করা যায়। এই তিন পংক্তির পর্বের নাম ত্রিপদিকা বা Tercet। এরকম ভাগ বা শ্রেণিবিন্যাস থাকলেও সব মিলিয়ে কবিতাটি কিন্তু একটি অখণ্ড ভাবকেই প্রকাশ করবে।

পংক্তিগুলোর মিলবিন্যাস হয়ে থাকে এরূপ- ক খ খ ক, ক খ খ ক, গ ঘ ঙ, গ ঘ ঙ। আবার পংক্তিগুলো এভাবেও সজ্জিত হতে পারে- ক খ খ ক, ক খ খ ক, গ ঘ, গ ঘ, গ ঘ অথবা গ ঘ ঙ, গ ঘ ঙ। শেক্সপীয়ার ইতালীয় ধারার এই পংক্তি বিভাজন মেনে নেননি। শেক্সপীয়ার তিনটি চতুষ্ক ও শেষে একটি সমিল দ্বিপদিকা ব্যবহার করেছেন। রীতিটি হল এরূপ- কখ কখ, গঘ গঘ, ঙচ ঙচ, ছছ। মিল্টন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ পেত্রার্কীয় রীতিতে সনেট রচনা করেছিলেন। এডমান্ড স্পেন্সার শেক্সপীয়ারের রীতিকেই একটু অন্যরকম ভাবে সাজিয়েছিলেন তাঁর 'অ্যামারেটি'তে। তাঁর পংক্তি সজ্জার রীতিটি হল- কখ কখ, খগ খগ, গঘ গঘ, ঙঙ। এই ধরনের পংক্তি সজ্জায় কবিতার মেজাজের পরিবর্তন ঘটে শেষের দুই পংক্তিতে।

ষোড়শ শতকের শেষ দিকে ইংরেজি সাহিত্যে সনেট রচনায় জোয়ার দেখা যায়। সিডনি, স্পেন্সার, স্যামুয়েল ড্যানিয়েল, মাইকেল ডেট্রন প্রমুখ সনেট রচনায় ব্রতী হন। ইতালীয় ও এলিজাবেথীয় সনেটের প্রধান লক্ষণ ছিল প্রেম। কিন্তু সপ্তদশ শতকে জন ডান সনেটে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়কে স্থান দেন। মিল্টন রাজনৈতিক ভাবনাকে অনায়াসে সনেটের মধ্যে গ্রহণ করেন। এরপরে উনিশ শতকে সনেট রচয়িতা হিসেবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কিট্স্ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

এবার পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত মাইকেল মধুসূদনের একটি সনেটের উদাহরণ দেওয়া যাক-

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরী,	ক
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?	খ
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে	খ
রতন তোমার মত, কহ সহচরি-	ক
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী	ক
সাজায় সে তোমাসম মণির উজ্জ্বলে?-	খ
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র মণ্ডলে	খ
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী?	ক
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে	গ
মানিনী রজনী রাণী তেঁই অনাদরে	ঘ
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল সনে,	গ

যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে? ঘ
কিন্তু কি অভাব তব, ও লো বরাঙ্গনে? গ
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে। ঘ

শেক্সপীয়রীয় রীতিতে রচিত একটি সনেটের দৃষ্টান্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোকগুচ্ছ' থেকে-

অশোকগুচ্ছ

হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা-চরণ-চুম্বনে ক
মর্মে মর্মে শিহরিয়া হ'লি লালে-লাল? খ
কোন্ দোল-পূর্ণিমায় নব-বৃন্দাবনে ক
সহর্ষে মাখিলি ফাগ্, প্রকৃতি-দুলাল? খ
কোন্ চির-সধবার ব্রত-উদযাপনে গ
পাইলি বাসন্তী শাড়ী সিন্দুর-বরণ? ঘ
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে গ
একরাশি ব্রীড়া হাসি করিলি চয়ন? ঘ
বৃথা চেষ্টা- হায়! এই অবনী মাঝারে। ঙ
কেহ নহে জাতিস্মর- তরু-জীব-প্রাণী! চ
পরাণে লাগিয়া ধাঁধাঁ আলোক-আঁধারে, ঙ
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী! চ
শৈশবের আবছায়ে শিশুর 'দেয়ালা', ছ
তেমতি, অশোক, তোর লাল-লাল খেলা! ছ

৪.৩ সনেটের বৈশিষ্ট্য

ক) সনেট চোদ্দটি পংক্তিতে রচিত হবে এবং প্রতি পংক্তি চোদ্দ অক্ষরে রচিত হবে। চোদ্দ পংক্তির কম বা বেশি পংক্তিতেও সনেট লেখা হয়েছে। প্রতি পংক্তি আঠারো বা তারও বেশি সংখ্যক মাত্রা নিয়ে রচিত হয়েছে।

খ) সনেটে মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। কারণ বিশেষ রীতি মেনে সনেট রচিত হয়। অন্যান্য গীতিকবিতার মতো ভাবের উচ্ছ্বাস সনেটে থাকে না।

গ) সনেটের আয়তন বড়ো হয় না। চোদ্দ পংক্তির মধ্যেই কবিকে নির্দিষ্ট ভাবের প্রকাশ ঘটাতে হবে।

ঘ) ভাবের গভীরতার সঙ্গে ওজন সমৃদ্ধ শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেক সময় পাঠকের কাছে এই জাতীয় শব্দের ব্যবহার দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে।

ঙ) সাধারণত সনেট অষ্টক ও ষটক এই দুটি অংশ নিয়ে রচিত হবে। শেক্সপীয়রীয় রীতিতে তিনটি চতুষ্ক এবং একটি দ্বিপদিকা নিয়েও সনেট লেখা হয়।

চ) সনেটের মাত্রা নির্ণয় অক্ষরবৃত্তের মতো হবে। অক্ষরবৃত্তের মতো এখানে ভাবের গাম্ভীর্য থাকে।

৪.৪ বাংলায় সনেট চর্চা

বাংলায় সনেট রচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে হবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের। তিনি অধিকাংশ সনেটেই পেত্রার্কীয় রীতি মান্য করেননি। তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি সনেট হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এরপর কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোকগুচ্ছ' সনেট হিসেবে উল্লেখযোগ্য রচনা। এরপর অক্ষয়কুমার বড়াল এবং তার পরেই পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাঁর 'নৈবেদ্য' ও 'চৈতালী'র কবিতায় সনেটের বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ পেত্রার্ক বা শেক্সপীয়ার কোনো রীতিই সার্থকভাবে গ্রহণ করেননি। প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ' উল্লেখযোগ্য রচনা। তিনি পেত্রার্কীয় রীতির সঙ্গে ফরাসি রীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। অষ্টকে দুটি চতুষ্ক রেখে পেত্রার্কীয় মিলবিন্যাস বজায় রেখেও ষটকের ক্ষেত্রে ফরাসি রীতিতে ২+৪ ভাগে ভাগ করেছেন। মোহিতলাল মজুমদার উৎকৃষ্ট সনেট রচনা করেছেন। ভাবের গভীরতা, সংযমবোধ, আঙ্গিক সবদিক থেকেই মোহিতলাল সনেট রচনায় সফল। তিনি আঠারো অক্ষরের পংক্তিতেও সনেট লিখেছেন।

একক ৫ ❑ নাটকের বিভিন্ন সংরূপ

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ ট্রাজেডি কী

৫.৩ ট্রাজেডির উদ্ভব

৫.৪ ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য

৫.৫ ট্রাজেডির শ্রেণিবিভাগ

৫.৬ গ্রিক ট্রাজেডি ও শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডির মধ্যে পার্থক্য

৫.৭ একটি ট্রাজেডি নাটকের দৃষ্টান্ত

৫.১ উদ্দেশ্য

এই অংশে আমরা আলোচনা করব সাহিত্যের অপর একটি সংরূপ নাটক নিয়ে। নাটক অর্থাৎ যা অভিনীত হয়। এটি চরিত্রের সংলাপের উপর ভিত্তি করে অভিনয় উপযোগী সাহিত্যের একটি মাধ্যম। অর্থাৎ একে সাহিত্যের ফলিত রূপ বলা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই নাটকের চর্চা চলেছে, তবে তার মাত্রাগত পার্থক্য ছিল। সাধারণত প্রাচীনকালে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হত তার মধ্যেই নিহিত ছিলে ভবিষ্যতের পরিশীলিত নাটক নামক সংরূপটি। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে নাটককে পঞ্চম বেদ বলা হয়ে থাকে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র হল নাট্যকলা সম্পর্কিত প্রাচীনতম গ্রন্থ। প্রাচীনকাল থেকে একাল পর্যন্ত দর্শক চিত্তকে আনন্দ দিয়ে এসেছে এই দৃশ্যকাব্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নাট্যকলা তথা দৃশ্যকাব্যের বিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন গ্রিসের ডায়োনিসাস দেবতার অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত দৃশ্য কাব্য বিবর্তনের পথে অনেক কিছুকে গ্রহণ করেছে এবং নিজেকে ঋদ্ধ করেছে। ফলে নাটকের আমরা বহু প্রকার শ্রেণিবিভাগ পেয়েছি। আঙ্গিকগত এবং বিষয়গত বৈচিত্র্য এসেছে নাটকের মধ্যে। আমরা এই অংশে নাট্যকলার ইতিহাস অর্থাৎ নাটকের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগগুলো সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানতে পারব। প্রসঙ্গত নাটকের বিভিন্ন সংরূপগুলোতে বাংলা নাটক ও নাট্যকারদের অবদান কতখানি তা আমরা এই অংশে আলোচনা করব। সার্বিকভাবে এই অংশের আলোচনায় নাটকের সংরূপগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

৫.২ ট্রাজেডি কী

মানুষের জীবনে আনন্দ এবং বিষাদ হাত ধরাধরি করে থাকে। আলো-অন্ধকার মানবজীবনের অনিবার্য পরিণতি। সাহিত্যে মানবজীবনের দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, ব্যর্থতা, হতাশাকেই ট্রাজেডি নামে চিহ্নিত করে হয়। ''দৈব বা অদৃষ্টের অনিবার্যতায় পীড়িত, গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বে পরাভূত অথচ নায়কোচিত আত্ম-প্রতিষ্ঠার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যে মহিমময় মানবজীবনের করুণরসাত্মক কাহিনীই সাধারণভাবে ট্রাজেডি নামে পরিচিত''। [কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ] ট্রাজেডি মূলত নাটকের একটি সংরূপ হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। কোনো নাটকের অন্তর্গত চরিত্রের দৈবের কারণেই হোক বা নিজের কোনো ত্রুটির কারণেই হোক যখন জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে তখন তাকে ট্রাজেডি বলা যায়। কেবলমাত্র বিপর্যয় নেমে আসলেই হবে না, সেই বিপর্যয়জনিত যন্ত্রণা বা 'suffering' যদি নির্দিষ্ট চরিত্রটি অনুভব করতে পারে তবেই তার জীবনে ট্রাজেডি ঘটেছে বলা যাবে। অর্থাৎ চরিত্রটিকে বিপর্যয় বা ব্যর্থতাজনিত যন্ত্রণার অংশীদার হতে হবে। ধরা যাক কোনো চরিত্রের জীবনে সংকট বা বিপর্যয় এসেছে, কিন্তু চরিত্রটি এর ফলে উন্মাদ হয়ে গেল। ফলত সে তার ওই সংকটজনিত যন্ত্রণা বা suffering উপলব্ধি করতে পারল না। তখন একে ট্রাজেডি বলা যাবে না। অর্থাৎ চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ট্রাজেডির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অ্যারিস্টটলের মতে- ''ট্রাজেডি হল একটি গম্ভীর, সম্পূর্ণ ও বিশেষ আয়তন বিশিষ্ট ক্রিয়ার অনুকরণ, ভাষার সৌন্দর্যে তার প্রতিটি অঙ্গ স্বতন্ত্র, এই ক্রিয়াটির প্রকাশরীতি বর্ণনাত্মক নয়, নাটকীয়; আর এই ক্রিয়া ভীতি ও করুণার উদ্রেক করে এবং তার মধ্য দিয়ে অনুরূপ অনুভূতিগুলির পরিশুদ্ধি ঘটায়''। [আরিস্টটল, অনু. শিশিরকুমার দাশ, কাব্যতত্ত্ব, প্যাপিরাস, ২০০৯, পৃ. ৪৯।]

৫.৩ ট্রাজেডির উদ্ভব

ট্রাজেডি (Tragedy) শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ ত্রাগোদিয়া (tragoidia) থেকে। যার অর্থ হল 'ছাগলের গান' (goat-song)। প্রাচীন গ্রিসে গ্রিক পুরাণের দেবতা ডায়নিসাসের প্রতি সম্মান জানিয়ে আঙুর ক্ষেতে ফসল তোলার আগে এবং পরে উৎসবের আয়োজন করা হোত। এই উৎসবের শোভাযাত্রায় ছাগচর্ম পড়ে মানুষজন বের হোত। এই সময় পর্বতের পাদদেশে রঙ্গ, তামাসার অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীরাও ছাগচর্ম পড়ে অভিনয় করত। ডায়নিয়াসের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকেই ট্রাজেডির উৎপত্তি। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিসের এথেন্সে ট্রাজেডি তার পূর্ণতা লাভ করেছিল। এরপর ট্রাজেডি তার পূর্ণ অবয়ব লাভ করে ইস্কিলাস ও সোফোক্লেসের রচনায়। ইস্কিলাসের ট্রাজেডির উদাহরণ 'বন্দী প্রমিথিউস', 'আগামেমনন' ইত্যাদি। আর সোফোক্লেসের ট্রাজেডি হল 'রাজা অয়দিপাউস', 'আন্তিগোনে' ইত্যাদি নাটক।

৫.৪ ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য

ক) ট্রাজেডির বিষয়বস্তু হবে গুরুগম্ভীর বা serious কোনো বিষয় নিয়ে ট্রাজেডি রচিত হবে। অ্যারিস্টটল হাস্য-পরিহাস বা চপলতাকে ট্রাজেডির অন্তর্ভুক্ত করেননি।

খ) ট্রাজেডির কাহিনি আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। একটি নিটোল কাঠামো কাহিনির মধ্যে থাকবে।

গ) অ্যারিস্টটলের মতে ট্রাজেডির নায়ক হবে উচ্চবংশজাত, সৎ। নায়ক খ্যাতি ও সমৃদ্ধির শিখরে থাকবে। কিন্তু একালের ট্রাজেডিতে নায়ক সবসময় উচ্চবংশজাত বা খ্যাতির শিখরে নাও থাকতে পারে।

ঘ) নাটকের ক্রিয়া বা কর্মবৃত্তির একটিমাত্র মাত্রা থাকবে। নাট্যক্রিয়া সংহত ও যুক্তির মধ্য দিয়ে অবশ্যম্ভাবী উপসংহারের দিকে যাবে।

৫.৫ ট্রাজেডির শ্রেণিবিভাগ

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাজেডির বিবর্তন ঘটেছে। দেশ ভেদেও এই বিবর্তন ঘটেছে। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাজেডিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

ক) ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাজেডি:

ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাজেডি বলতে গ্রিক ট্রাজেডিকেই বোঝায়। এই ট্রাজেডির লক্ষণ হল নিয়তির কারণে নায়ক চরিত্রের বিপর্যয় ঘটবে। নায়ক চরিত্রের অহংকারজনিত কোনো ছিদ্রপথ দিয়ে নিয়তি প্রবেশ করে নায়ক চরিত্রকে খ্যাতির উচ্চশিখর থেকে একেবারে ভূপতিত করে দেয়। ফলত দর্শকের সহানুভূতি জন্মায় নায়কের প্রতি। নিয়তির কাছে নায়কের অনিবার্য পরাজয়, নায়কের যন্ত্রণা, সংকট ইত্যাদি ছিল ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাজেডির বিষয়। এই জাতীয় ট্রাজেডিতে কোরাসের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

খ) এলিজাবেথীয়/রোমান্টিক ট্রাজেডি:

এই জাতীয় ট্রাজেডিতে হত্যা, রক্তপাত, শিহরণসৃষ্টিকারী ঘটনা ইত্যাদি দেখা যায়। কিডের 'The Spanish Tragedy' এই জাতীয় নাটকের উদাহরণ। রোমান্টিক ট্রাজেডিতে ডাইনি, প্রেত ইত্যাদি ভীতিপ্রদ দৃশ্য নাটকে দেখানো হোত। অতিপ্রাকৃত ঘটনা এই নাটকে স্থান পেত। গ্রিক নাটকের কোরাস এই জাতীয় নাটকে দেখা যায় না। শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' এ জাতীয় নাটকের উদাহরণ।

গ) হিরোইক ট্রাজেডি:

এই জাতীয় নাটকে নায়ক চরিত্রের প্রেম ও বীরত্বের মহিমাকে মহাকাব্যের ধরনে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করাই ছিল লক্ষ্য। জন ড্রাইডেন ছিলেন এ ধরনের নাটকের রচয়িতা। জর্জ কার্টরাইটের 'The Heroic Lovers', ড্রাইডেনের 'All of Love' এই ধরনের নাটকের উদাহরণ।

ঘ) সমাজ-সমস্যামূলক ট্রাজেডি:

এই গোত্রের নাটককে বলা যায় আধুনিক কালের ট্রাজেডি নাটক। সামাজিক ন্যায়-নীতির কারণে কোনো নায়ক চরিত্রের বিপর্যয় দেখানো হয় এই জাতীয় ট্রাজেডিতে। জন গলসওয়ার্দির লেখা 'Justice', 'Loyalties' এই জাতীয় নাটকের দৃষ্টান্ত।

৫.৬ গ্রিক ট্রাজেডি ও শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডির মধ্যে পার্থক্য

ক) গ্রিক ট্রাজেডিতে নায়কের বিপর্যয়ের কারণ নিয়তি বা অদৃষ্ট কোনো শক্তি। শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডিতে নায়কের পতনের কারণ তারই চারিত্রিক কোনো ত্রুটি। অর্থাৎ বাইরের কোনো কারণে নায়কের জীবনে ট্রাজেডি নেমে আসে না।

খ) নিয়তির কারণে চরিত্র শত চেষ্টা করেও কিছু করতে পারে না। নায়কের অসহায়তা বোধ করা এবং নিয়তিকে মেনে নেওয়া ছাড়া কিছু করার থাকে না গ্রিক ট্রাজেডিতে। অন্যদিকে শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিতে চারিত্রিক ত্রুটির কারণে নায়কের জীবনে বিপর্যয় ঘটায় তার অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকের মূল বিষয় হয়ে ওঠে।

গ) স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্য গ্রিক নাটকে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। কিন্তু শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডিতে স্থান-কালের ঐক্য প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। ঘটনার ঐক্য মেনে চলা হয়।

ঘ) কোরাস গ্রিক নাটকের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিতে কোরাস থাকত না। তবে কোনো একক চরিত্র অনেকক্ষেত্রে কোরাসের ভূমিকা পালন করেছে।

ঙ) হিংসাত্মক ঘটনা অর্থাৎ হত্যা, রক্তপাত ইত্যাদি মঞ্চের উপর অভিনীত হত না। শেক্সপীয়রীয় নাটকে এসব মঞ্চের উপরেই হোত।

৫.৭ একটি ট্রাজেডি নাটকের দৃষ্টান্ত

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল'(১৮৮৯) একটি ট্রাজেডি নাটক। 'প্রফুল্ল' নাটকে একটি মধ্যবিত্ত পরিবার কীভাবে নিঃস্ব হয়ে গেল তারই কাহিনি বিবৃত হয়েছে। নাটকে যোগেশ তার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় আর্থিকভাবে থিতু হয়েছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যোগেশ রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে গেল।

মধ্যবিত্ত পরিবারটি অর্থনীতির ষড়যন্ত্রে ধ্বংস হয়ে গেল- এই ঘটনাই এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। ব্যাঙ্ক ফেল করায় যোগেশের জীবনে ট্রাজেডি নেমে আসে। যোগেশের ট্রাজেডি নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকের মতে ব্যাঙ্ক ফেল করাই যোগেশের ট্রাজেডির কারণ, তার চরিত্রের কোনো ত্রুটির কারণে ট্রাজেডি ঘটেনি। অর্থাৎ বাইরের ঘটনার ফলে যোগেশের জীবনে ট্রাজেডি নেমে এসেছে। ব্যাঙ্ক ফেল করায় যোগেশের মদ্যাসক্তি বেড়ে যায়। সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এর আগে সে কাজ ছাড়া কিছুই জানত না। জ্ঞানদার মুখে শোনা যায় ''বাবা ভ্যালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু। কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্ নেই!'' এই যোগেশ পরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যোগেশের বিপরীতে অ্যাটর্নি রমেশ ছিল ধূর্ত, অর্থলোভী ও মুনাফাবাজ। যোগেশ সৎ ব্যবসায়ী হয়ে যখন ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছে মুনাফাবাজ রমেশের উত্থান তখন অব্যাহত থেকেছে।

Note

একক ৬ ❑ কমেডি প্রহসন

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ কমেডির সাধারণ লক্ষণ

৬.৩ ট্রাজেডি ও কমেডির পার্থক্য

৬.৪ কমেডির শ্রেণিবিভাগ

৬.৫ প্রহসন

৬.৬ প্রহসন সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা

৬.৭ বাংলা প্রহসনের আলোচনা

৬.৮ প্রহসন ও কমেডির পার্থক্য

৬.১ উদ্দেশ্য

''যে রচনা ঘটনানির্বাচনে ও বিন্যাসকৌশলে দর্শকদের আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যকেই মুখ্য করে তোলে তাকে 'কমেডি' বলে চিহ্নিত করা হয়। চরিত্র ও পরিবেশের বিপর্যস্ত অবস্থা যদি গভীর কোনো আঘাত না দিয়ে আমাদের মৃদুভাবে আলোড়িত করে এবং ঘটনার পরিণতি যদি মিলনান্তক হয় তবে তা 'কমেডি' বলেই গণ্য হবে''। [উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি] অর্থাৎ কমেডির পরিণতি হাস্যরসাত্মক এবং তা আনন্দ প্রদান করবে। আমাদের জীবনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি, নির্বুদ্ধিতা, বিদ্রূপ-কৌতুক ইত্যাদি কমেডির মূল উপাদান। অ্যারিস্টটল কমেডির সংজ্ঞা দিয়েছেন- ''কমেডি, আগেই বলেছি, নিম্নতর নরনারীর জীবনের অনুকরণ। নিম্নতর বলতে অবশ্য হীন বা খারাপ বোঝাচ্ছে না। কিন্তু হাস্যকর হল নিম্ন বা অসুন্দরের শ্রেণীভুক্ত। এ হল একধরনের ত্রুটি বা অসুন্দরতা, তবে তা আমাদের বেদনা দেয় না, বা আহত করে না। একটি স্পষ্ট উদাহরণ হল মজাদার মুখোস, (নিঃসন্দেহে) অসুন্দর এবং বিকৃত, কিন্তু বেদনাদায়ক নয়''। [কাব্যতত্ত্ব, আরিস্টটল, অনু. শিশিরকুমার দাশ]

৬.২ কমেডির সাধারণ লক্ষণ

কমেডি (Comedy) শব্দটির উদ্ভব হয়েছে গ্রিক শব্দ 'Komodia' থেকে। এর মূল উৎস হল গ্রিক শব্দ 'Komos' থেকে। যার অর্থ আনন্দ উদ্‌যাপন করা। প্রাচীন গ্রিসে ডায়োনিসাস দেবতার শীতকালীন

উৎসব থেকে কমেডির উদ্ভব হয়। এই উৎসবের সময় ডায়োনিসাস দেবতার পূজার জন্য dithyrumb song গীত হোত তা থেকেই কমেডির উদ্ভব হয় বলে মনে করা হয়। কমেডিতে 'টাইপ' চরিত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। ক্যারিকেচারধর্মী নকশা এই জাতীয় নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়। আসলে অসঙ্গতিই এই জাতীয় নাটকে হাস্যরসের উপাদানের যোগান দেয়।

কমেডির উদ্দেশ্য হল পাঠক বা দর্শকের মনে হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে আনন্দ দান করা, কিন্তু সেই সঙ্গে পাঠক-চিত্তকে নাড়া দেওয়াও কমেডি রচনায় নাট্যকারের লক্ষ্য থাকে। অর্থাৎ শুধুমাত্র ভাঁড়ামি বা স্থূল হাস্যরস পরিবেশন করা কমেডির লক্ষ্য নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের জেনে রাখতে হবে 'wit' এবং 'humour' বিষয়ে। উইট হল বুদ্ধির চমৎকারিত্বে লোককে হাসানো। আর হিউমার হল বিশুদ্ধ আনন্দ দান করা। কোনো ব্যঙ্গের হূল সেখানে থাকে না। কমেডি যে কেবল সর্বদাই হাস্যরসের বা কৌতুকের যোগান দেবে তা নয়। কমেডি নাটকে করুণ রসও থাকতে পারে। কোনো নাটকে ট্রাজেডি ও কমেডি দুই-ই যদি সমানভাবে থাকে তাকে ট্রাজি-কমেডি বলে। তবে কমেডিতে করুণ রস সবসময়ই হাস্যরসের অধীন থাকে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় বৈকুণ্ঠ যখন গৃহত্যাগ করতে যায় তখন যে করুণ রসের সৃষ্টি হয়, তা হঠাৎ দূর হয়ে গিয়ে কৌতুককর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ এই নাটকে দুটি রসই পাওয়া গেল।

কমেডি নাটকের অন্য একটি লক্ষণ হল এই জাতীয় নাটক প্রেম-ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। বিখ্যাত কমেডিগুলো এই ধারাতেই রচিত। এই জাতীয় কমেডি-তে নারী চরিত্রের বিশেষ প্রাধান্য থাকে। তবে প্রেমের কাহিনি নিয়ে রচিত নাটকমাত্রেই কমেডি নাটক হবে তা নয়। প্রেমের মিলনে নাটকের শেষে সুখকর অনুভূতি কমেডির বাতাবরণ তৈরি করে দেয়।

৬.৩ ট্রাজেডি ও কমেডির পার্থক্য

ক) ট্রাজেডিতে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত। উচ্চবংশজাত, ধিরোদাত্ত, বীর চরিত্র ট্রাজেডির পক্ষে উপযুক্ত চরিত্র। সেই ব্যক্তির চারিত্রিক ত্রুটি বা নিয়তির অমোঘ পরিণামে ট্রাজেডি নেমে আসে। অন্যদিকে কমেডিতে সমষ্টি অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। সমাজবাস্তবতা কমেডিতে প্রাধান্য পায়।

খ) কমেডিতে পাত্র-পাত্রীর জীবনের খণ্ড অংশের ছবি থাকে। টাজেডি নায়কের সামগ্রিক জীবনকে অবলম্বন করে রচিত হয়। অর্থাৎ ট্রাজেডির প্রেক্ষাপট বিস্তৃত হয়ে থাকে।

গ) ট্রাজেডিতে করুণা, শঙ্কা ইত্যাদি পাঠক-দর্শক উপহার পায়, কমেডিতে পায় কৌতুকরস, হাস্য-পরিহাস।

ঘ) ট্রাজেডি যেখানে করুণ রসে বিপর্যয়-বিচ্ছেদ ইত্যাদি দিয়ে শেষ হয়, কমেডি সেখানে মিলনান্তক নাটক।

ঙ) ট্রাজেডির ভাষা গুরুগম্ভীর ও ভাবব্যঞ্জক হয়ে থাকে। কমেডির ভাষা সহজ-সরল ও লঘু-চপল হয়ে থাকে।

চ) কমেডিতে টাইপ চরিত্রের ভিড় থাকে। কমেডির চরিত্ররা অনেকটা বাস্তবের মানুষ, সামাজিক মানুষ হয়ে থাকে। ট্রাজেডিতে থাকে আদর্শবান চরিত্র। সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে কিছুটা দূরত্বে তার অবস্থান।

ছ) কমেডি যেখানে জীবনের লঘু-চপল দিকটি উদ্ঘাটিত করে, ট্রাজেডি সেখানে মানবজীবনের মহৎ সত্যকে প্রকাশ করে থাকে।

৬.৪ কমেডির শ্রেণিবিভাগ

কমেডির শ্রেণিবিভাগগুলো হল-

ক) কাব্যধর্মী বা Romantic Comedy: কোনো কমেডিতে কাব্যিক উপাদান বেশি থাকলে তাকে কাব্যধর্মী কমেডি বলে। যেমন- শেক্সপীয়রের 'Twelfth Night'।

খ) সামাজিক বা Comedy of Manners: যে সব কমেডি নাটকে সমাজকে বা সামাজিক বিভিন্ন উপাদানকে সমালোচনা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয় তাকে সামাজিক কমেডি বলে। যেমন- দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটক।

গ) চক্রান্তমূলক বা Comedy of Intrigue: নাটকের চরিত্রেরা যখন নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পরিণতি দান করে তখন তাকে চক্রান্তমূলক কমেডি বলে। যেমন- ড্রাইডেনের 'The Spanish Friar'।

এছাড়াও কমেডিকে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ভাবপ্রধান বা Sentimental– বিদ্রূপাত্মক বা Satirical– ভাবপ্রধান বা Comedy of Errors ইত্যাদি।

৬.৫ প্রহসন

সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতি, কপটতা, অনাচারকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার যে সংক্ষিপ্ত নাটক রচনা করেন তাকে প্রহসন (Farce) বলে।সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা সমাজ সংশোধনার্থে একাঙ্কিকা নাটককে প্রহসন বলে চিহ্নিত করেছিলেন। অর্থাৎ প্রহসনে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-তামাশার মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। প্রহসনের ইংরেজি 'farce' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'farcita' থেকে। আর 'farcio' থেকেই এসেছে 'farcita' শব্দটি। 'farcio' শব্দের অর্থ নিম্নস্তরের ভাঁড়ামি। অধ্যাপক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের মতে-''বস্তুত আধুনিক কালে ফার্স হল মূলত নিম্নস্তরের সংক্ষিপ্ত কমেডি, যার মূল উদ্দেশ্য অঙ্গভঙ্গী, ভাঁড়ামি ও ঘটনা-পরিস্থিতি সৃজনের সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টি করা; আর তা প্রচলিত নানা শ্রেণীর কমেডিগুলি থেকে স্বতন্ত্র''। [ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, 'নাট্যতত্ত্ব-বিচার'] । এই এককে আমরা প্রসনের সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনার সঙ্গে দেখে নেব বাংলা প্রহসনগুলি চরিত্র কেমন ছিল।

৬.৬ প্রহসন সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা

প্রহসন কমেডি নাটকেরই অন্তর্গত ধরা যায়। তবে প্রহসনে হাস্যরস একটু মোটা দাগের হয়ে থাকে। প্রহসনের মূল উদ্দেশ্য সমাজের নানা ত্রুটিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে সমালোচনায় বিদ্ধ করা। অর্থাৎ প্রহসনে পাত্র-পাত্রীরা আপনার মুখ আপনি দেখ ধরনের ব্যাপার হয়ে থাকে। প্রহসনের মাধ্যমে নাট্যকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সমাজকে শিক্ষা দিতে চায়। প্রহসনের মাধ্যমে সমাজকে তার চরিত্র তাকেই দেখানো হয়। পূর্ণাঙ্গ নাটকে যেভাবে কাহিনির বিস্তার, গভীর জীবনবোধ, কাহিনির যুক্তি পরম্পরা থাকে প্রহসনে তা থাকে না। আসলে খণ্ডজীবনই প্রহসনের রচয়িতার লক্ষ্য হয়ে থাকে। কারণ সমাজের নির্দিষ্ট কোনো একটি পক্ষাঘাত নিয়ে উদ্দেশ্য মূলকভাবেই নাট্যকার প্রহসন রচনা করে থাকেন। সমকালীন ঘটনাকে নিয়ে একারণে প্রহসন রচিত হয়।

অধ্যাপক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 'নাট্যতত্ত্ব-বিচার' গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ কমিডির বিপরীতে ফার্স বা প্রহসনের অবস্থান বলে মন্তব্য করেছেন। শ্রেষ্ঠ কমেডি চরিত্র ও বহির্গত ঘটনার বিশ্লেষণ ব্যতীত গভীরতর এক বোধের জন্ম দেয়। কিন্তু প্রহসনে এই গভীরতার কিছু থাকে না। ভারতীয়রা আলঙ্কারিকরাও প্রহসন সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের 'দৃশ্য-শ্রব্য-কাব্য'র অন্তর্গত 'দশরূপক'-এর অন্যতম হল এই প্রহসন। আচার্য ভরত প্রহসনকে শুদ্ধ এবং সংকীর্ণ বা মিশ্র এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। বিকৃত প্রহসন নামে আরও একটি শ্রেণিবিভাগ আলংকারিকরা করেছেন। এঁদের মতে শুদ্ধ প্রহসন হল উন্নত এবং সংকীর্ণ প্রহসনে অশ্লীলতা থাকে। পাশ্চাত্যের 'ফার্স'-এর সঙ্গে আমাদের দেশের 'প্রহসন' বা সংস্কৃত আলংকারিকগণ কথিত প্রহসনের পার্থক্য আছে বলে নাট্যতাত্ত্বিক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন। পাশ্চাত্যের ফার্স নিছক হাস্যোদ্রেকের কথা যখন বলে, প্রহসন তখন হাস্যরসের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংশোধনের কথা বলে। আবার প্রহসন মূলত এক অঙ্কের হয়ে থাকে, ফার্স দুই বা তিন অঙ্কের হলেও হতে পারে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের ফার্স-এর সঙ্গে সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রহসনের কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

৬.৭ বাংলা প্রহসনের আলোচনা

বাংলায় 'প্রহসন' শব্দটি 'ফার্স'-এর পরিশব্দ হিসেবে গৃহীত হলেও তা ঠিক সংস্কৃত প্রহসনের সমগোত্রীয় নয়, আবার তা ফার্স বলতে যা বোঝায় সঠিক তাও নয়। দুটোর মিশ্রিত রূপ। বাংলা প্রহসন সংস্কৃতের মতো সর্বদা এক অঙ্কের হয় না। বলা যেতে পারে ফার্স ও সংস্কৃত শুদ্ধ প্রহসনের মিশ্রিত রূপ হল বাংলায় রচিত প্রহসন। কারণ উনিশ শতকে বাংলা প্রহসনগুলো লেখাই হয়েছিল সমাজ সংশোধনের জন্য। অধ্যাপক ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বাংলা ফার্সকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন- বিশুদ্ধ ফার্স, মিশ্র ফার্স, সামাজিক ফার্স, ব্যক্তি-ব্যঙ্গাত্মক ফার্স। পাশ্চাত্যের ফার্সের লক্ষণ যেসব বাংলা প্রহসনে বেশি মাত্রায় মানা হয়েছে তা বিশুদ্ধ ফার্স। যেমন- অমৃতলাল বসুর 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৬)। যেসকল ফার্সে উচ্চাঙ্গের কমেডির লক্ষণও দেখা যায় তা হল মিশ্র ফার্স। যেমন- মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে

সভ্যতা'(১৮৬০)। সমাজের সমালোচনার জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের যে ফার্স তাকে সামাজিক ফার্স বলা যায়। আর ব্যক্তি আক্রমণ যেসব ফার্সের লক্ষ্য তাদের ব্যক্তি-ব্যঙ্গাত্মক ফার্স বলা যায়। বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ফার্সই বেশি লেখা হয়েছে।

আমরা আমাদের আলোচনায় বাংলায় ফার্সের পরিশব্দ হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য প্রহসন শব্দটিকেই ব্যবহার করব। ঊনবিংশ শতকে সামাজিক নানা ব্যভিচারের প্রতিকারার্থেই বাঙালি নাট্যকারদের প্রহসন লিখতে হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রথম সার্থক প্রহসন রচয়িতা হলেন মধুসূদন দত্ত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রহসনধর্মী রচনা। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে সমাজের ইংরেজি জানা উচ্চশিক্ষিত যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সমালোচনা করা হয়েছে। এই প্রহসন লেখার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয় হরকামিনীর মন্তব্যে- 'হা আমার পোড়া কপাল! মদ্ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?- একেই কি বলে সভ্যতা?' অর্থাৎ নাট্যকার মধুসূদন এই প্রহসনের মধ্য দিয়ে সমাজের ব্যভিচারী দিক নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে সমাজ সংশোধন করতে চেয়েছেন। 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে ভক্তপ্রসাদের মতো বুড়ো ব্রাহ্মণরা ধর্মের দোহাই দিয়ে একের পর এক অল্পবয়সী মেয়েদের বিবাহ করত। ক্রমে এটা তাদের লোভে পর্যবশিত হয়। সমাজের এই খারাপ দিকটাতে আলো ফেলাই ছিল প্রহসন রচয়িতা মধুসূদনের লক্ষ্য। দীনবন্ধু মিত্রর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক'(১৮৭২), 'সধবার একাদশী'(১৮৬৬) প্রহসনের সফল দৃষ্টান্ত। অমৃতলাল বসু রচিত প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাট'(১৮৮৪), 'বাবু'(১৮৯৪) ইত্যাদি।

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) প্রহসনে উনিশ শতকের ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরা হয়েছে। সেকালে নিমচাঁদ, অটলের মতো যুবকরা অতিরিক্ত মদ্যাসক্তির ফলে সমাজকে কলুষিত করত। বারাঙ্গনা বাড়ি যাওয়া ছিল তাদের কাছে গর্বের কাজ। এই প্রহসনে সেকালের বাস্তব চিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে বাস্তবসম্মত ভাষায় দীনবন্ধু চিত্রিত করেছেন। ''ঘটিরাম ডেপুটি, রামমাণিক্য, অটল, ভোলা, কাঞ্চন- প্রত্যেকের কথা তাহাদের চরিত্র বিকাশনে অভ্রান্তভাবে সাহায্য করিয়াছে। ...সেজন্য অশ্লীলভাষিণী বারবনিতা, মদ্যপায়ী মাতাল, বখাটে আদুরে দুলাল প্রভৃতির মুখ দিয়ে সমাজের ভব্যতা ও শালীনতার মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে, এবং এক অশ্লীল, অভদ্র রসস্রোতে সমস্ত নাটকীয় প্রাঙ্গণ প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছে''। [ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ, ২০১৮,পৃ. ৯৪।] সুতরাং প্রহসনের যে মূল লক্ষ্য সমাজের বাস্তবতাকে তুলে ধরে সমালোচনা করা তা দীনবন্ধু সফলভাবেই করতে পেরেছেন। দীনবন্ধুর এই রচনায় নিমচাঁদের অশ্লীল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাসি-ঠাট্টা-তামাশা ইত্যাদি সবকিছুই রেখেছেন। ফলত এটি প্রহসন হিসেবে সার্থক রচনা এবং এটিকে সামাজিক ফার্স বলা যায়।

৬.৮ প্রহসন ও কমেডির পার্থক্য

প্রহসন (farce) ও কমেডির (Comedy) মধ্যে পার্থক্য নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব-

ক) কমেডি-তে হাস্যরস প্রহসনের তুলনায় উচ্চাঙ্গের হয়ে থাকে। প্রহসনে স্থূল হাস্যরস, দৈহিক অঙ্গভঙ্গি থাকে।

খ) সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেছেন প্রহসন এক অঙ্কের হবে। প্রহসন অনেকটা নকশাধর্মী রচনা। ফলত কমেডির মতো প্রহসনের বিস্তার হয় না।

গ) প্রহসনের বিষয় সাধারণত সমাজের নানা কলঙ্কময় দিকগুলো নিয়েই রচিত হয়ে থাকে। ফলে বিতর্কের একটা পরিবেশ আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে। কমেডিতে এ ধরনের সুযোগ থাকে না।

ঘ) প্রহসনের চরিত্রগুলো প্রায়শই টাইপ চরিত্র হয়ে থাকে। অর্থাৎ চরিত্রগুলোর মধ্যে একমাত্রিক হওয়ার প্রবণতা থাকে। কমেডিতে চরিত্র বহুমাত্রিক হয়ে থাকে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে সেখানেও টাইপ চরিত্র থাকতে পারে। তবে প্রহসনে টাইপ চরিত্র বা কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির চরিত্র বেশি পরিমাণে থাকে।

ঙ) নাট্যদ্বন্দ্ব প্রহসনে সেভাবে তৈরি হওয়ার সুযোগ থাকে না। কমেডিতে নাট্যদ্বন্দ্ব থাকতে পারে।

চ) সংলাপ প্রহসনের তুলনায় কমেডিতে মার্জিত হয়ে থাকে। সংলাপ মার্জিত হলে প্রহসনে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সুযোগ থাকে না।

ছ) কমেডির হাস্যরস মননশীল ব্যক্তির কাছে উপভোগ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ কমেডির হাস্যরস চিন্তামূলক। প্রহসনে হাস্যরস এর বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করে।

ফার্স বা প্রহসন দর্শককে যেমন অহেতুক হাস্যরসের উপাদান দেয়, সেইসঙ্গে সমাজ সংশোধনের একটা তাগিদও এর মধ্যে আছে। কেবলমাত্র প্রবন্ধের যুক্তি-তর্কে বা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় যখন কাজ হয় না তখন সমাজের পচন রোধ করতে প্রহসনকে হাতিয়ার করতে হয়। প্রহসন যেহেতু দৃশ্য-শ্রব্য মাধ্যম ফলত এর আবেদন তৎক্ষণাৎ। দর্শকের অন্তরে প্রবেশ করা যায় নাটকের মধ্য দিয়ে সহজে। ফলত বাংলা প্রহসন সমাজের জন্য একসময় বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ফার্স বা প্রহসন থেকে আমরা কমেডির তরলীকৃত হাস্যরস এবং সেইসঙ্গে সমাজ সংশোধনের বার্তা পেলেও পেতে পারি।

একক ৭ ❑ কবিনাট্য

গঠন

৭.১ কাব্যনাট্য কী

৭.২ কাব্যনাট্যের সাধারণ আলোচনা

৭.৩ বাংলা কাব্যনাট্য

৭.৪ ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য

৭.৫ ট্রাজেডির শ্রেণিবিভাগ

৭.৬ গ্রিক ট্রাজেডি ও শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডির মধ্যে পার্থক্য

৭.৭ একটি ট্রাজেডি নাটকের দৃষ্টান্ত

৭.১ কাব্যনাট্য কী

কোনো নাটককে যদি কবিতার রূপে লেখা হয়, তাহলে তাকে কাব্যনাট্য বলা যায়। অর্থাৎ কাব্য এক্ষেত্রে নাটকের বাহন। ''যেখানে কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না করিয়া হয় উহার সমশক্তিসম্পন্ন সহযোগিতা অথবা আনুগত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছে সেখানে কাব্যনাট্য হয়''। [কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ১২৭।] আবার এ বিষয়ে দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেছেন- ''কাব্যনাট্যে কাব্যের ছন্দ তো সংলাপে থাকবেই; তাছাড়া নাটকের যে সব বৈশিষ্ট্য- ক্রিয়াশীলতা, ঘটনাধারার পরিণামমুখী অগ্রগতি, উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দর্শককে আবিষ্ট করে রাখা- প্রভৃতিও তাতে থাকবে এবং কাব্যছন্দের সঙ্গে এই নাট্যগুণের চমৎকার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। কাব্যের আকারে লিখিত হলেও মূলত এ নাটক। নাট্যগুণকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে উপায়স্বরূপ কাব্যের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে''। [ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব-বিচার, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৪০১, পৃ. ২৩২।]

৭.২ কাব্যনাট্যের সাধারণ আলোচনা

কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি যে প্রাচীনকালেও কাব্যের আকারে নাটক লেখা হয়েছে, সেগুলোকে কিন্তু কাব্যনাট্য বলা যাবে না। শেক্সপীয়ার, মারলো প্রমুখ কাব্যের আকারেই নাটক লিখেছিলেন। কাব্যনাট্য হল আধুনিক কালের একটি সংরূপ। কাব্যের অনুভব-উপলব্ধি, আবেগ ইত্যাদি এবং নাটকের দ্বন্দ্ব-উৎকণ্ঠা ইত্যাদির সংমিশ্রণ হল কাব্যনাট্য। কাব্যনাট্যে-র ভাষাকে ব্যবহারিক এবং শৈল্পিক হয়ে উঠতে হবে। এর ছন্দ বাইরের কোনো বস্তু হবে না, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকবে।

কাব্যনাট্যে (Poetic Drama) মূল উপাদান কিন্তু নাটক। নাট্যধর্মের ওপর কাব্যনাট্যের প্রভুত্ব এখানে চলে না। যা হয় নাট্যকাব্যে (Verse Play/ Dramatic Poetry)। কাব্যনাট্যে সংলাপ সবসময় যে ছন্দময় হয়ে লিখিত হতে হবে এরকম কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। আসলে নাট্যকাব্য পাঠ করার দাবি রাখে। আর কাব্যনাট্য অভিনীত হবার দাবি রাখে। অর্থাৎ নাট্যকাব্য নাটকের আকারে লেখা হলেও মূলত তা কবিতা। আর কাব্যনাট্য কবিতার আকারে লেখা হলেও আসলে তা নাটক। এও আমাদের মনে রাখতে হবে নাটকের ঢঙে লেখা কবিতামাত্রেই কিন্তু নাটক নয়। নাটকের আকারে রচিত নয় অথচ নাটকীয় ভঙ্গি আছে তাহলেও তা কাব্যনাট্য হবে না। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভ্রষ্টলগ্ন', 'স্বর্গ হইতে বিদায়'। এও মনে রাখতে হবে কাব্যধর্মী গদ্যনাটক আর কাব্যনাট্য একই জিনিস নয়। নাট্যকাব্যের সার্থক উদাহরণ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিদায়-অভিশাপ', 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'। আর কাব্যনাট্যের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'।

কাব্যনাট্যে অভিনয় করার উপাদান থাকতে হয়। কাব্যনাট্য হল দর্শনীয় এবং অনুভবের উপযোগী। এখানে মনে রাখতে হবে কাব্যনাট্য কিন্তু সম্পূর্ণ নাটক নয়। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ নাটকের সব উপাদান এখানে থাকবে না। কাব্যনাট্যে দর্শকের অনেকটা বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন ঘটে বলা যায়। টি এস এলিয়টের 'Murder in the Cathedral' (1936), 'The Family Reunion' (1939), 'The Cocktail Party' (1949) কাব্যনাটকের উদাহরণ।

৭.৩ বাংলা কাব্যনাট্য

বাংলা কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে এলিয়টের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এলিয়ট তাঁর কাব্যনাট্য গুলোতে গ্রিক পুরাণের উপাদানকে আধুনিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু এই ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। মণীন্দ্র রায় 'নাটকের নাম ভীষ্ম', মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'একলব্য' একই ধারায় পুরাণের কাহিনিকে অনুসরণ করে কাব্যনাট্য রচনা করেছেন।

বাংলা কাব্যনাট্য রচনায় সফল ব্যক্তিত্ব হলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। তাঁর রচিত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'কালসন্ধ্যা', 'অনাম্নী অঙ্গনা' সফল কাব্যনাট্যের উদাহরণ। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' (১৯৬৬) মূলত গদ্যে রচিত হলেও এর ভাষা কাব্যগুণান্বিত। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী। এছাড়াও চন্দ্রকেতু, বিভাজক, রাজকুমারী শান্তা, অংশুমান, রাজমন্ত্রী, লোলাপাঙ্গী ইত্যাদি এই নাটকের অন্যান্য চরিত্র। এই নাটকে তরঙ্গিণীর জন্মান্তর যেমন ঘটেছে, তেমনি ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গেরও জন্মান্তর ঘটেছে। তরঙ্গিণী ছিল অপরূপ সুন্দরী এক বারবণিতা। পুরুষকে সে কেবলমাত্র কামের বশীভূত করতেই শিখেছে। পুরুষের অন্যরূপটি অর্থাৎ পুরুষের ভালোবাসার রূপটি সে দেখেনি। ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীকে দেখে বলে 'আপনি কি কোন পথভ্রষ্ট দেবতা? না কি আমারই কোনো অচেতন সুকৃতির ফলে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন?' এই প্রশ্নেই তরঙ্গিণী তার আপন সত্তাকে খুঁজে পেতে চায়। অন্যদিকে ঋষ্যশৃঙ্গও খুঁজে পায় নারীর অর্থ। সে জানতে পারে পুরুষের জীবনে নারীর প্রয়োজনীয়তার কথা। অর্থাৎ দুজনেরই সত্তার

উত্তরণ ঘটে এই কাব্যনাট্যে।

এই কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব বসু পুরাণের কাহিনিকে আধুনিক কালের দাবি অনুযায়ী বদলে নিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন- ''একটি পুরাণ কাহিনীকে আমি নিজের মনোমত ক'রে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। ... আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদের সমকালীন''। [বুদ্ধদেব বসু, ভূমিকা, তপস্বী ও ত্রঙ্গিনী।] পুরাণের গণিকা তরঙ্গিণী অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে শাশ্বত এক নারীতে পরিণত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর হাতে। আর ঋষ্যশৃঙ্গের জীবনে যে কামের প্রভাব তার তপস্যাকে নষ্ট করছিল সেই কামই তাকে নতুন জীবনের মন্ত্র দিল।

কাব্যনাটকের দৃষ্টান্ত হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র দ্বিতীয় অঙ্কের একটি দৃশ্য এখানে দেওয়া হল–

তরঙ্গিণী: তপোনিধি, আমি দেবতা নই। আমার জন্ম নরকুলে, আমার ধর্ম পরিচর্যা। আমি আপনারই সেবার জন্য এখানে এসেছি, আমি আপনারই সেবার জন্য এখানে এসেছি, পূজিত হ'তে আসিনি। কোনো দানগ্রহণ আমার ব্রতবিরোধী।

ঋষ্যশৃঙ্গ: আপনার ব্রতের বিষয়ে আমাকে আরো বলুন।

তরঙ্গিণী: আমি অনঙ্গব্রতে অঙ্গীকৃত।

তপস্বিনী: অনঙ্গব্রত? তা কী-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়? তার পণ কী? পদ্ধতি কী? ক্রিয়াকর্ম কেমন? আমি অজ্ঞ; আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

তরঙ্গিণী: আমার পণ আত্মদান।

ঋষ্যশৃঙ্গ: ঋষিরা ত্যাগের মহিমা কীর্তন ক'রে থাকেন।

তরঙ্গিণী: তপোধন, আমি তত্ত্বকথা জানি না, আমি প্রেরণার বশবর্তী। ত্যাগই আমার ভোগ-আমার সার্থকতা। পশু, পক্ষী ও পতঙ্গকে বৃক্ষ যেমন ফলদান করে, তেমনি আমি জনে-জনে করি আত্মদান।

ঋষ্যশৃঙ্গ: তত্ত্বজ্ঞান আমারও যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু মাঝে-মাঝে আমার অনুভূতি হয়, যেন পশু, পক্ষী, বৃক্ষের সঙ্গে আমি একাত্ম। নিখিলের সঙ্গে একাত্ম।

তরঙ্গিণী: দেব, আমি দ্বৈতবাদী। কে আমাকে গ্রহণ করবেন, আমি নিরন্তর তাঁকে খুঁজে বেড়াই। এই আমার পদ্ধতি।

লজ্জাত্যাগ ও ঘৃণাবর্জন আমার ক্রিয়াকর্ম।

ঋষ্যশৃঙ্গ: আপনার ব্রতে কোনো মন্ত্র আছে কি? কোনো অনুষ্ঠান?

তরঙ্গিণী: আমার মন্ত্রের নাম রতি, আমার যজ্ঞের নাম প্রীতি, আমার ধ্যানের বিষয় আনন্দযোগ। আমার সাধনমার্গে

একাকীত্ব নিষিদ্ধ: দুই তপস্বী যৌথভাবে এই ব্রত পালন করেন। তাই আমি আজ আপনার শরণাগত।

[বুদ্ধদেব বসু, তপস্বী ও তরঙ্গিণী, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৬৬, পৃ. ৩৪-৩৫।]

একক ৮ ❑ সামাজিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক

গঠন

৮.১ সামাজিক নাটক

৮.২ সামাজিক নাটকের লক্ষণ

৮.৩ বাংলা সামাজিক নাটক

৮.৪ ঐতিহাসিক নাটক

৮.৫ পৌরাণিক নাটক

৮.১ সামাজিক নাটক

যে নাটকের বিষয়বস্তু সামাজিক কোনো কাহিনি অবলম্বন করে রচিত হয় তাকেই সামাজিক নাটক বলে। আধুনিকতার সঙ্গে সামাজিক নাটকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষের জীবনে আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জটিলতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলত নাটকে সামাজিক সমস্যা স্থান পেতে থাকে। এ বিষয়ে উজ্জ্বল কুমার মজুমদার বলেছেন- ''সমাজজীবনের জটিলতা বৃদ্ধি এবং পারিবারিক জীবনে আদর্শহীনতা ও ব্যক্তি-সংঘর্ষের ফলেই নাটকে সমাজসমস্যা বিশেষ ভাবেই এসে গেছে। মানবিকতাবোধ, শ্রেণী-ভিত্তিক-চিন্তা, শ্রেণী-সংঘর্ষ ও গণবিপ্লবের কথাও স্বাভাবিকভাবে সামাজিক নাটকে আধুনিক কালে মুখ্যস্থান নিয়েছে''। [উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, দে'জ, ১৪২৩, পৃ. ১১৯।]

৮.২ সামাজিক নাটকের লক্ষণ

সামাজিক নাটকে নাট্যকার যে সময়ের কাহিনি অবলম্বন করেন সেই সময়কার সামাজিক সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক জীবনের সংকটের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নাটকেরও পরিধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কোনো একটি সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্রে রেখে নাটক রচিত হলে তাকে সমাজ-সমস্যামূলক নাটক বলে। না হলে তাকে সামাজিক নাটক বলা যায়। সব সামাজিক নাটকেই যে সমস্যা থাকতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিশেষ স্থান-কালের সমাজ-বাস্তবতা এই জাতীয় নাটকের প্রধান উপজীব্য।

সামাজিক নাটকের ধারণ ক্ষমতা নাটকের অন্যান্য সংরূপের তুলনায় বেশি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা, ধর্মীয়, প্রেম-বিবাহ, পারিবারিক নানাবিধ বিষয় বা সমস্যা এই নাটকে অনায়াসে স্থান পায়।

সমাজের একেবারে সাধারণ শ্রেণির মানুষ এই নাটকের পাত্র-পাত্রী হয়ে থাকে। এই নাটকের জন্য উচ্চবংশজাত নায়ক, বীর চরিত্রের প্রয়োজন আবশ্যক নয়। আমাদের আশেপাশের মানুষজনই এই নাটকের চরিত্র হয়ে থাকে এবং তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ গুণে নায়ক হয়ে ওঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাট্যকার এই জাতীয় নাটকের মধ্য দিয়ে সামাজিক শিক্ষা দেবার প্রয়াসী হন। সমাজ-সংস্কারমূলক বার্তা দেবার লক্ষ্যও নাট্যকারের থাকে। যে নাটক সামাজিক সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত হয় তাকে Problem Play বা Thesis Play বা Discussion Drama-ও বলা হয়ে থাকে। কাল্পনিক ঘটনার সংস্থান এ জাতীয় নাটকে থাকে না। বাস্তবতা এ জাতীয় নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চরিত্রের অসাধারণত্বও এ জাতীয় নাটকে সচরাচর দেখা যায় না। অর্থাৎ যুক্তি, তর্ক, প্রমাণ ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণ করে নাটকের কাহিনি পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অনেকসময় কোনো একটি মতবাদকে বা Idea-কে নাট্যকার এ জাতীয় নাটকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষে সামাজিক নাটক রচিত হতে পারে। আবার পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে সামাজিক নাটক রচিত হতে পারে। আবার সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যেমন শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, আদিবাসী ইত্যাদি শ্রেণি নিয়েও সামাজিক নাটক রচিত হয়। সামাজিক নাটককে বিষয়বস্তু বা সমস্যার ভিন্নতার নিরিখে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

ক) সাধারণ সামাজিক নাটক

খ) সমস্যামূলক সামাজিক নাটক

গ) ব্যক্তি-সমস্যামূলক সামাজিক নাটক

ঘ) পারিবারিক সমস্যামূলক সামাজিক নাটক।

দিন দিন সামাজিক নাটকের চাহিদা ক্রমাগত বেড়েছে। আধুনিক কালে মানুষের জীবন জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত। ফলে দিন দিন নতুন নতুন বিষয় সামাজিক নাটকের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

সামাজিক সমস্যামূলক নাটক লেখেন প্রথম হেনরিক ইবসেন- 'A Doll's House' (1879)। এরপর বার্নার্ড শ লিখেছিলেন- 'Widowers' House', 'Mrs. Warren's Profession'। ইবসেনের নাটকে নোরা গৃহবধূ হিসেবে স্বামী হেলমার যা বলে তাই শোনে। অর্থাৎ স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী সে পরিচালিত হয়। একটা সময় নোরা অনুভব করে ছোটোবেলায় তার বাবা তাকে পুতুলের মতো ব্যবহার করেছিল এবং পরে সে পুতুল স্ত্রী-তে পরিণত হয়েছিল। তার নিজের মতামতের কোনো দাম ছিল না। নোরা স্বামী হেলমারকে ত্যাগ করে। অর্থাৎ বিবাহ-প্রেম ইত্যাদি এই নাটকের মূল সমস্যা হিসেবে নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক ইবসেন দেখিয়েছেন। এই নাটকটি সে সময় আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

৮.৩ বাংলা সামাজিক নাটক

প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) । কৌলীন্যপ্রথার ঘৃণ্যরূপ এই নাটকে দেখানো হয়েছে। এরপর সামাজিক নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর 'প্রফুল্ল' (১৮৮১), 'ভ্রান্তি' (১৯০২), 'বলিদান' (১৯০৫) এই জাতীয় নাটকের উদাহরণ। মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে বিধায়ক ভট্টাচার্য লিখেছেন 'ক্ষুধা' নাটক। শিল্পীর দুঃখময় জীবন নিয়ে লেখা মন্মথ রায়ের 'জীবনটাই নাটক'। মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপল দত্ত লিখেছেন 'অঙ্গার', 'ঘুম নেই'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোড়ায় গলদ'কে সাধারণ সামাজিক নাটকের উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়।

'বলিদান' নাটকে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের এক সামাজিক সংকটকে গিরিশচন্দ্র দেখিয়েছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে কন্যাদান মানে বলিদান দেওয়া। নাটকের চরিত্র ঘনশ্যাম বলেছে 'বাংলার কন্যা সম্প্রদান নয় বলিদান'। বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়িতে কন্যার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে বা সপত্নী জ্বালায় জর্জরিত হয়ে গেলে পিতৃগৃহে ফিরে আসে। কখনও কখনও বধূরা আত্মঘাতীও হয়। এই নাটকে হিরণ্ময়ী আত্মঘাতী হয়েছে এবং কিরণ্ময়ী পরিত্যক্তা হয়েছে। বিবাহের পরে কন্যা পিতৃগৃহেও অবাঞ্ছিতা হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সবদিক থেকেই তাদের বলিদান হয়ে থাকে।

হিরণের বিবাহ হয় বয়স্ক বরের সঙ্গে, তারপর স্বামীর মৃত্যু, সপত্নীপুত্রদের অত্যাচারে পুনরায় তার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন, পিতৃগৃহে পিতার গঞ্জনা এবং শেষ পর্যন্ত জলে ডুবে জীবন বলিদান করতে সে বাধ্য হয়েছে। এই হল হিরণের বলিদানের ইতিহাস। কিরণময়ীও বিবাহের পর পিতৃগৃহে ফিরে এসে আদর-ভালোবাসা পায়নি। শেষে দেখা যায় কিরণ্ময়ী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। অর্থাৎ এই নাটকে কন্যাদান এবং সেই কন্যাদান যে কখন আসলে বলিদান হয়ে যায় তা দেখানো নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল। সামাজিক একটি সমস্যাকে নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। পণপ্রথার ভয়াবহতা, নারী নির্যাতন, কন্যার পিতার অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং তার ফলে তার মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি এই নাটকে দেখানো হয়েছে। এটিকে ট্রাজিক নাটকও বলা যায়।

৮.৪ ঐতিহাসিক নাটক

ইতিহাসের ঘটনাকে অবলম্বন করে যে নাটক লেখা হয় তাই ঐতিহাসিক নাটক। নাট্যকার যদি কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রের কর্মপ্রচেষ্টায় বা বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তার জীবনের দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে নাটক লেখেন তবে তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। আবার বিশেষ চরিত্রের কোনো কাজ বা গুণের বিকাশের সন্ধান করতে গিয়ে নাট্যকার যদি কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র ও পরিবেশের সন্ধান পেয়ে যান তাহলে সে নাটকও ঐতিহাসিক নাটক হতে পারে। [উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, দে'জ, ১৪২৩, পৃ. ১১৭।] অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনা বিশ্লেষণ নয়, ইতিহাসের ঘটনাকে কেন্দ্র

করে নাট্যকার পাত্র-পাত্রীকে চিত্রিত করেন তখন তা ঐতিহাসিক নাটক হয়ে ওঠে।

৮.৪.১ ঐতিহাসিক নাটকের সাধারণ লক্ষণ

ইতিহাস যেখানে খাতা বন্ধ করে সেখান থেকেই নাট্যকার খাতা খোলেন। ঐতিহাসিক অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিশ্লেষণ, কার্য-কারণ অনুসন্ধান, প্রয়োজনবোধে ইতিহাসের ঘটনার পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি করে থাকেন। যা ঘটেছে, যা সত্য, যার প্রমাণ আছে তাই নিয়েই ঐতিহাসিকের কাজ। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতা ঐতিহাসিকের লিপিবদ্ধ করা ঘটনা বা ইতিহাসকে অবলম্বন করে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নাটক বা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। ঐতিহাসিক অনেকক্ষেত্রে প্রমাণের অভাবে ইতিহাসের অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা বা উত্তর পান না। কিন্তু নাট্যকার সহজেই সেই উত্তর বা ইতিহাসের মিসিং লিঙ্ক খুঁজে পান। ইতিহাসের অস্পষ্ট জায়গাগুলোতে নাট্যকার তার কল্পনা শক্তির বলে আলো ফেলতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে নাট্যকারকে মনে রাখতে হবে তিনি যেন এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি না ঘটান। অর্থাৎ বলা যায় ঐতিহাসিক যা ঘটে গেছে তার কথা বলেন। আর নাট্যকার যা ঘটবে বা ঘটতে পারে তার কথা বলে।

ইতিহাসের ঘটনাকে অবলম্বন করে মানবজীবনকে প্রস্ফুটিত করাই ঐতিহাসিক নাটকের কাজ। প্রয়োজনে নাট্যকার ইতিহাসের ঘটনার গ্রহণ-বর্জন করেন এবং প্রয়োজনবোধে কোনো উপকাহিনি যোগও করতে পারেন। ইতিহাসের চরিত্রগুলোকে স্পষ্ট রূপ দিতে উপকাহিনি বা শাখাকাহিনি যোগ করা নাট্যকারের একটি কৌশল। ইতিহাসের ঘটনাকে যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং করে নাট্যকার গ্রহণ করলে তা ইতিহাস হয়ে যায়। আবার প্রচলিত ইতিহাস থেকে বারবার সরে আসলে সেটা নাটক হলেও তাতে ইতিহাসের উপাদান আর থাকে না। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস এবং নাট্যকারের দর্শন, নিজস্ব বোধ ইত্যাদি যুক্ত হয়ে একটি নতুন জিনিস সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক নাটকের সাফল্য লুকিয়ে থাকে নাট্যকার কীভাবে ইতিহাসের ঘটনা বা তথ্যগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করছেন তার উপর।অর্থাৎ নাট্যকারের পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৮.৪.২ ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য

ক) ইতিহাসের ঘটনা আশ্রয় করলেও নাট্যকারের কল্পনা মিশ্রিত হয়ে অতীত নাটকে সজীব হয়ে ওঠে।

খ) ইতিহাস হয়ে থাকে বস্তুনিষ্ঠ। নাটকের সে দায়বদ্ধতা থাকে না। নাট্যকার সাহিত্যের প্রয়োজনে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস থেকে কিয়দংশে বিচ্যুত হলেও হতে পারেন।

গ) ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের ঘটনার প্রাধান্য থাকলেও নাট্যকার এক সর্বজনীন সত্যকে তুলে ধরেন এবং দর্শক-শ্রোতাকে নির্বিশেষের দিকে নিয়ে যান।

ঘ) যে সময়ের ঘটনা নাট্যকার অবলম্বন করবেন সেই সময়কে তার যথাযথ কালের বৈশিষ্ট্যসহ তুলে ধরতে হবে। নাহলে কালানৌচিত্য ত্রুটি ঘটবে। অর্থাৎ চরিত্রগুলোর ভাষা, পোশাক ইত্যাদি নিয়ে ইতিহাসের নির্দিষ্ট কালটি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেই যুগের আচার-বিচার, রীতি-নীতি, সংস্কার, জীবনাদর্শকে বাস্তব করে তুলতে হবে।

ঙ) ইতিহাস এবং নাট্যকারের কল্পনা এমনভাবে মিশ্রিত হবে যাতে ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও যুগপরিবেশ অটুট থাকে।

চ) ঐতিহাসিক নাটকে চিরকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হবে।

ছ) ইতিহাসের সত্য ও কল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। নাট্যকারের কল্পনা যেন ইতিহাসের সত্যের বিপরীত না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

জ) ভাষার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক কালকে তুলে ধরতে হবে। ঐতিহাসিক চরিত্রকে রূপায়িত করতে হলে ভাষার মধ্যে আভিজাত্য এবং ধ্রুপদী ভাবনাকে বজায় রাখতে হবে।

৮.৪.৩ বাংলা ঐতিহাসিক নাটক

শেক্সপীয়ার ঐতিহাসিক নাটক রচনায় বিশেষ সফল হয়েছিলেন। তাঁর 'Henry VI'(৩ খণ্ড), 'Richard III', 'King John', ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাটক। বাংলা নাট্যসাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটক বেশ সমৃদ্ধে। মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রথম বাংলা ঐতিহাসিক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রতাপসিংহ'(১৯০৫),'দুর্গাদাস'(১৯০৬),'নূরজাহান'(১৯০৮),'মেবারপতন'(১৯০৮), 'সাজাহান'(১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাটক। এই জাতীয় নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিশেষ উচ্চতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬) ঐতিহাসিক নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর'(১৯২১),'চাঁদবিবি'(১৯০৭) ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাটকের উদাহরণ।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচনায় মুঘল যুগ এবং রাজপুতানার ইতিহাসকেই নাট্যকাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন। পরাধীন ভারতে এইসব ঐতিহাসিক নাটক রচনার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবকে জাগ্রত করার চেষ্টাও করা হয়েছে। ''দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় উদ্দীপনা স্তিমিত হওয়ায় ঐতিহাসিক নাটক রচনার ধারাও প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে''। [ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব-বিচার, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৪০১, পৃ. ২৫০।]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নূরজাহান' নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্র নূরজাহান চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব সার্থকভাবে দেখানো হয়েছে। শেরখাঁর সঙ্গে নূরজাহান সুখে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছিল। কিন্তু ভারতের সম্রাট সেলিম নূরজাহানের মনে ঝড় তোলে। সেলিমের সঙ্গে নূরজাহানের চোখাচোখির ফলে সুখী দাম্পত্যে ঝড় ওঠে। নূরজাহান স্বামীকে নিয়ে বর্ধমানে পালিয়ে এসে সেলিমের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচতে চায়।এরপর শের খাঁ নিহত হয় এবং নূরজাহানকে আগ্রার প্রাসাদে নিয়ে আসা হয়। একসময় সেলিমকে নূরজাহান বিবাহ করতে রাজি হয়। কিন্তু এখন আর সে সেলিমের প্রণয়প্রার্থী নূরজাহান নয়। এখন সে স্বামীহন্তারকের প্রতি প্রতিশোধ নিতে চায়। সবমিলিয়ে 'নূরজাহান' একটি ঐতিহাসিক ট্রাজেডি নাটক হয়ে উঠেছে। মুঘল যুগের পারিবারিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংকটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটক রচনায় সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'সাজাহান'ও মুঘল যুগের প্রেক্ষাপটে রচিত জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক।

৮.৫ পৌরাণিক নাটক

পুরাণের কাহিনিকে অবলম্বন করে যে নাটক লেখা হয় তাকেই পৌরাণিক নাটক বলে। দেবদেবীর কাহিনি, তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, সৃষ্টিরহস্য ইত্যাদিকে আধার করে যে কাহিনি আগে থেকেই সমাজজীবনে প্রচলিত আছে তাকেই নাট্যকার অবলম্বন করে নাট্যদ্বন্দ্ব, সংলাপ ইত্যাদি সংযোজন করে পৌরাণিক নাটক লিখে থাকেন।

৮.৫.১ পৌরাণিক নাটকের সাধারণ লক্ষণ

পুরাণে দেব-দেবীর মহিমা কীর্তন করা হয়ে থাকে। প্রায় ১৮টি পুরাণ আছে। এই পুরাণগুলোতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রবি ও শিবের মহিমা কীর্তন করা হয়ে থাকে। এই দেব-দেবী বা প্রাচীন কাহিনি/উপাখ্যান ইত্যাদিকে আশ্রয় করে রচিত হয় বলে এই জাতীয় নাটকে অলৌকিকতা অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। দৈবী মাহাত্ম্যে নানারকম অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে, মঙ্গলকাব্যে আমরা তা দেখেছি। পুরাণ বা পৌরাণিক যুগে মর্ত্য মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হত স্বর্গের দেব-দেবীদের ইচ্ছায়; অন্তত পৌরাণিক কাহিনি বা ধর্মগ্রন্থগুলো তাই আমাদের দেখিয়েছে। তাই এই জাতীয় নাটকে অভিশাপগ্রস্ত দেব-দেবীরাও মর্ত্যে এসে সাধারণ মানুষ হয়ে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছে।

পৌরাণিক নাটকে বীর রস, করুণ রস ইত্যাদির ঘনঘটা থাকতেই পারে, কিন্তু তার মূল রস ভক্তি রস। এই ভক্তি রসকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই এই জাতীয় নাটক রচিত হয়ে থাকে। পাপ-পুণ্য, নীতি-আদর্শ, নিয়তিবাদ-কর্মফলবাদ ইত্যাদি বিষয় পৌরাণিক নাটকের অনিবার্য উপাদান। আধুনিক যুগের বাস্তববাদ, যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা এ জাতীয় নাটকে থাকে না। নাটকের শেষ হয় কোনো দেব-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি প্রদর্শন করে। ভক্তি ও বিশ্বাসের জয় দেখানো হয় এই জাতীয় নাটকে। ফলত দর্শক অতিরিক্ত যুক্তিবাদী হলে, দেব-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি না থাকলে পৌরাণিক নাটকের আবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য- ''ধর্মপ্রাণ দর্শককে ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ করে চিত্তে ভক্তিরসের সঞ্চার পৌরাণিক নাটকের মূল উদ্দেশ্য- সেইজন্য একে শুধু পৌরাণিক নাটক না বলে ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটক বলাই সঙ্গত''। [ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব-বিচার, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৪০১, পৃ. ২৪০।] এরপরেই সমালোচক যথার্থ প্রশ্ন তুলেছেন ভক্তিই যদি নাটকের শেষ কথা হয়, তাহলে নাট্যদ্বন্দ্ব কীভাবে তৈরি হবে? এর উত্তরে বলা যায় দেবতা এবং মর্ত্য মানুষের মধ্যে একটা বিরোধ কল্পনা করা হয় এবং এই বিরোধকে কেন্দ্র করে তৈরি দ্বন্দ্বকে নাটকে অনেকদূর পর্যন্ত নাট্যকার টেনে নিয়ে যান। শেষপর্যন্ত মর্ত্য মানুষের বা স্বর্গের অভিশপ্ত মানুষটি নিজের ভুল বুঝতে পেরে দেবতার কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেন। সুতরাং পৌরাণিক নাটকেও নাট্যদ্বন্দ্ব থাকে এবং ভক্তিরসকে অঙ্গীরস করেই তা পূর্ণাঙ্গ নাটকের সব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

প্রাচীন গ্রিসেও দেব-দেবীর কাহিনি নিয়ে পৌরাণিক নাটক লেখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলিকে পৌরাণিক নাটক বলা যায় না বলেই সমালোচকদের মত। কারণ গ্রিক নাটকগুলোতে ভক্তিরস প্রাধান্য পায়নি। তাই এগুলোকে পৌরাণিক নাটক বলা যায় না। অর্থাৎ কেবলমাত্র পুরাণের কাহিনি অবলম্বন করলেই তা

পৌরাণিক নাটক হবে না। তার মধ্যে ভক্তিরস থাকা প্রয়োজন। পুরাণের কাহিনিকে অবলম্বন করে আধুনিক কালের ভাব ও ভাবনাকেন্দ্রিক যদি নাটক রচিত হয় তবে তাকেও পৌরাণিক নাটক বলা যায় না। পুরাণের ঘটনাকে অবলম্বন করে ভক্তিরস ত্যাগ করে যে নাটক রচিত হয় তাকে ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'নব পৌরাণিক' নাটক। এক্ষেত্রে তিনি মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়দের উনিশ শতকে পুরাণকে কাব্যের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিতে অর্থাৎ 'নব পুরাণ' হিসেবে ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৮.৫.২ বাংলা পৌরাণিক নাটক

যাত্রাপালা বাংলার নিজস্ব সম্পদ। যাত্রাপালায় সে সময় মূলত পুরাণ বা ধর্মীয় বিষয়ই অভিনীত হোত। বাংলা নাটকের সূচনাকালে এই পুরাণের বিষয়কে অবলম্বন করেই পথ চলা শুরু করে। ধর্মভীরু বাঙালির কাছে পুরাণের জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরান, উপপুরাণের কাহিনি বাঙালির জীবনযাত্রায় মিশে ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ কারণেই বলেছিলেন 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে'। এই গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতেই বাংলা পৌরাণিক নাটকের সফলভাবে যাত্রা শুরু হয়। পৌরাণিক নাটকের মঞ্চসাফল্যই বলে দেয় সত্যই বাঙালির মর্মে মর্মে ধর্ম। এরপর গিরিশচন্দ্র একের পর এক পৌরাণিক নাটক লিখে যান। সে সময় পৌরাণিক নাটক লেখায় জোয়ার আসার অন্যতম কারণ অবশ্য পুরাণ ব্যতীত মৌলিক কাহিনির অভাব। হাতের কাছে তৈরি ছিল পুরাণের গল্প। ফলে কম সময়ে দর্শকচিত্তজয়ী নাটক লেখার সহজতম পন্থা ছিল পৌরাণিক নাটক রচনা করা। মধুসূদন দত্ত নাটক লেখা শুরু করেন মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির কাহিনি অবলম্বনে 'শর্মিষ্ঠা'(১৮৫৯) নাটক দিয়ে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনেকগুলো পৌরাণিক নাটক লিখেছেন। 'বিল্বমঙ্গল', 'পাণ্ডব-গৌরব', 'দক্ষযজ্ঞ', 'নলদময়ন্তী', 'কমলে কামিনী', 'শ্রীবৎস চিন্তা', 'চৈতন্যমঙ্গল' ইত্যাদি তাঁর রচিত পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল'(১৮৮৮) সেকালের একটি জনপ্রিয় নাটক। স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত এই নাটককে শেক্সপীয়রের থেকে উপরে স্থান দিয়েছিলেন। এই নাটকের মূল বিষয় একজন সাধারণ মানুষের বেশ্যাসক্তি থেকে ভগবৎ প্রেমে উত্তরণের কাহিনি। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি নামে এক গণিকার কাছে যাতায়াত করত। সে শুধুমাত্র দৈহিক চাহিদার জন্য যেত না, প্রেমের বশেই যেত। এমনকি পিতৃশ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত চিন্তামণির কাছে বিল্বমঙ্গল আসে। কিন্তু চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে প্রশ্রয় না দিয়ে বলেছে সে যদি এই মনে হরিকে স্মরণ করত তাহলে তার জীবন সার্থক হোত। এই কথা শুনে বিল্বমঙ্গলের মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয় এবং কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে সে ভগবৎ আরাধনায় সার্থকতা লাভ করে। এই নাটকে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ হিসাবে গিরিশচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা দেখিয়েছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা পর্যন্ত দেখিয়েছেন মঞ্চে। আসলে দর্শকচিত্ত গিরিশচন্দ্র খুব ভালো করে বুঝতেন বলেই এই জাতীয় অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ করেছিলেন এই নাটকে।

একক ৯ ❑ একাঙ্ক নাটক ও এবসার্ড নাটক

গঠন

৯.১ একাঙ্ক নাটক ভূমিকা

৯.২ একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্য

৯.৩ একাঙ্ক নাটকের সাধারণ আলোচনা

৯.৪ এবসার্ড নাটক

৯.১ একাঙ্ক নাটক ভূমিকা

"একাঙ্ক নাটক একটি অঙ্ক এবং বস্তুতপক্ষে একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটক। দৃশ্যান্তর এ-নাটকের রসনিবিড়তাকে ক্ষুণ্ণ করে বলে একটি দৃশ্যে, একটি স্থানে, একই মঞ্চসজ্জায় জীবনের একটি ক্ষুদ্র অথচ চমকপ্রদ খণ্ডাংশকে এক সুনিবিড় অখণ্ডতা দিতে হয়। একটি দৃশ্যের মধ্যে দিয়েই নাটকীয় ঘটনার ক্রমোন্নয়ন, সংঘাত ও নাট্য-পরিণতি নির্দেশ করতে হয়"। [কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ১৩২।] নাটকের প্রচলিত পাঁচ অঙ্কের রীতির বিপরীতে এক অঙ্কের (One-Act Play) নাটকের অবস্থান। John Hampden বলেছেন- "A one act play deals with a single dominant dramatic situation and aims at Producing a single effect … ." আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে একাঙ্ক নাটকের চাহিদা ক্রমাগত বেড়েছে। মানুষ যত আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছে, ততই মানুষের হাতে সময় কমে গেছে। ফলত পঞ্চাঙ্ক নাটক দেখার মতো সময় মানুষের হাতে নেই। যেমন করে ছোটোগল্পের চরিত্র আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ঠিক সেভাবেই একাঙ্ক নাটকও যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে।

৯.২ একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্য

ক) একাঙ্ক নাটকে একটি মাত্র অঙ্কেই নাট্যকারকে যা বলার বলতে হয়। বিস্তৃত আকারে বলার সুযোগ থাকে না।

খ) জীবনের কোনো একটি মুহূর্ত বা কোনো একটি ভাবকে কেন্দ্র করে এক অঙ্কের নাটক রচিত হয়।

গ) সাধারণত Climax বা চূড়ান্ত বিন্দু থেকে একাঙ্ক নাটক শুরু করতে হয়। কারণ খুব দ্রুত একমুখী গতিতে পরিণতিতে পৌঁছতে হয় নাট্যকারকে।

ঘ) চরিত্রের সংখ্যা হবে কম। একটি চরিত্রই সাধারণত এ জাতীয় নাটকে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

ঙ) ছোটোগল্পের সঙ্গে একাঙ্ক নাটককে তুলনা করা যায়। ছোটোগল্পের মতোই বৈশিষ্ট্য একাঙ্ক নাটকের থাকে। আধুনিকতার সঙ্গে পাঠক-দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী ছোটোগল্প এবং একাঙ্ক নাটকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

চ) পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতো একাঙ্ক নাটকে ঘটনার ক্রম উন্মোচন ঘটে না। একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্রে রেখেই নাট্যকারকে তীরবেগে যবনিকা পতনের দিকে যেতে হয়।

ছ) সংলাপ রচনায় নাট্যকারকে সাবধানী হতে হবে। সংলাপ রচনায় অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর কথা বলা যাবে না।

জ) এই জাতীয় নাটকে স্থান-কাল-পাত্রের ঐক্য রক্ষিত হবে।

ঝ) একাঙ্ক নাটকে 'singleness of aim and singleness of effect' কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

৯.৩ একাঙ্ক নাটকের সাধারণ আলোচনা

একাঙ্ক নাটক পাঁচ অঙ্কের নাটকের বিকল্প নয়, কিন্তু দ্রুত গতির জীবনে এই জাতীয় নাটক গুরুত্ব লাভ করেছে। আসলে মূল নাটকের আগে দর্শকদের সময় কাটানোর জন্য বা সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিনোদনমূলক যে ছোটো নাটকের ব্যবস্থা করা হত তাকে বলে 'Curtain Raiser'। বাংলা নাট্যজগতে এরকম 'filler'-এর প্রচলন হয়েছিল। যেমন- অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির 'সাহেবের তামাসা', অমৃতলাল বসুর 'চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে' ইত্যাদি। এই 'Curtain Raiser' থেকেই একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ অল্প সময়ে দর্শকের কাছে অর্থবহ কিছু পরিবেশন করাই ছিল এই নাটকের মূল লক্ষ্য। যা পরবর্তীকালে নাটকের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণিতে পরিণত হয় যুগের চাহিদা অনুযায়ী। ১৯০৩ সালে W.W. Jacobs-এর 'The Monkey's Paw' কার্টেন রেজার হিসবে অনুষ্ঠিত হলেও দর্শক মূল নাটকের তুলনায় এই নাটকটির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। ফলে এই ধারার বিনোদনমূলক কার্টেন রেজার একাঙ্ক নাটকে রূপান্তরিত হয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এর অন্যতম কারণ হল স্বল্প সময়ে স্বল্প চরিত্র নিয়ে স্বল্প পরিকাঠামোয় স্বল্প আর্থিক সামর্থ্যে এই জাতীয় নাটকের অভিনয় করা সম্ভব হচ্ছে। ফলত অপেশাদার যে সকল নাট্যসংস্থা তাদের ঝোঁক বা প্রবণতা থাকে একাঙ্ক নাটকের দিকে। স্বল্প সামর্থ্যে অপেশাদার সংস্থাগুলো নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে অনায়াসে একাঙ্ক নাটক অভিনয় করে সাফল্য লাভ করছে। এছাড়াও একাঙ্ক নাটকের জন্য ইদানীংকালে বিভিন্ন স্থানে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে একাঙ্ক নাটক রচনায় জোয়ার এসেছে। প্রতিযোগিতা আয়োজক সংস্থাগুলো একাঙ্ক নাটক স্বল্প পরিকাঠামোয় আয়োজন করতে পারছে, যা পঞ্চাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

বাংলা একাঙ্ক নাটক রচনায় প্রথম সফল ব্যক্তিত্ব হলেন মন্মথ রায়। তাঁর আগে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একাঙ্ক নাটক রচনা করলেও তা সার্থক হয়নি। প্রথম শিল্পসম্মত একাঙ্ক নাটক রচয়িতা হিসেবে মন্মথ রায়কে চিহ্নিত করা যায়। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'মুক্তির ডাক'

নাটককেই প্রথম সার্থক বাংলা একাঙ্ক নাটক বলা যায়। তিনি অনেকগুলো একাঙ্ক নাটকও রচনা করেছিলেন। তাঁর 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'রাজপুরী', 'টোটোপাড়া', 'জন্মদিন' গুরুত্বপূর্ণ নাটক। এছাড়াও বনফুল-এর 'শিককাবাব, বাণপ্রস্থ', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পূর্ণগ্রাস, দাম্পত্যকলহে চৈব', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'কান্না হাসির পালা', 'সরীসৃপ' ইত্যাদি বাংলা একাঙ্ক নাটকের উদাহরণ।

৯.৪ এবসার্ড নাটক (Absurd Drama)

৯.৪.১ এবসার্ড নাটক কাকে বলে?

এবসার্ড বা অ্যাবসার্ড নাটক হল প্রচলিত নাটকের বিপরীতে আধুনিক কালের নাটকের একটি সংরূপ। দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং আধুনিকতার ক্রমপরিবর্তনশীল সংজ্ঞায় মানুষ ক্রমাগত একে অপরে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য বা অর্থহীন বেঁচে থাকা- এইসব ভাবনা বা মানুষের অস্তিত্বের সংকট ইত্যাদি খাপছাড়া, বিচ্ছিন্ন বিষয়কে নাট্যকাররা নাটকে স্থান দিয়ে যে নতুন ধরনের নাটকের সূচনা করেন তাকেই অ্যাবসার্ড নাটক বলা হয়। মানুষের উদ্ভট ভাবনাকে স্থান দিতে গিয়ে এই জাতীয় নাটকের গঠনপদ্ধতিও হয়ে উঠল প্রচলিত সমস্ত ধরনের বিধিবদ্ধ নাট্যরীতির বিপরীত। ''নাটকের গঠনপদ্ধতি উদ্দেশ্যহীন ও অনির্দ্দিষ্ট; আরম্ভ যেখানে পরিণতিও সেখানে, কারণ পরিণতি বিষয়েই নাট্যকারের অনাস্থা। স্থান-কালের কোনো সীমা বা সঙ্গতি নেই। প্লটের গঠনে নেই কোনো পরিকল্পনার আভাস। জীবনের উদ্ভটত্ব, অর্থহীনতা, মানুষের একাকিত্ব ও প্রাত্যহিকতার ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিক ক্রিয়াকর্ম ভাঙাচোরা অসংলগ্ন ভাষায়, অদ্ভুত-দর্শন চরিত্রাবলীর আপাত-উৎকেন্দ্রিক আচরণের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চান নাট্যকার''। [কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ১৩০-১৩১।]

৯.৪.২ অ্যাবসার্ড নাটকের সাধারণ লক্ষণ

কোনো কোনো সমালোচক অ্যাবসার্ড নাটকের বাংলা করেছেন 'অদ্ভুত নাটক'। এই জাতীয় নাটককে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বধর্মী নাটকও বলা যায়। এই নাটকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য Martin Banham সম্পাদিত 'The Cambridge Guide to Theatre' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

ক) এই জাতীয় নাটকে প্রথাগত নাটকে যে কাহিনি, চরিতের পারম্পর্য, যুক্তি পরম্পরা থাকে তাকে অস্বীকার করা হল। স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য নাও থাকতে পারে।

খ) অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা বা অদ্ভুত বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় নাটক রচিত হতে পারে।

গ) ভাষাও বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে রচিত হয় না। ভাষাকে দুর্বোধ্য করে তোলা হয়।

ঘ) নাটকের সমাপ্তিতে এক শূন্যতা বা সর্বব্যাপী এক অর্থহীনতার ধারণা তৈরি হতে পারে।

ঙ) মঞ্চে যে সকল জিনিস থাকে তাদের সঙ্গে নাটকের চরিত্রগুলোর অদ্ভুত সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করা হয়।

উপরের এই বৈশিষ্ট্যগুলো অ্যাবসার্ড নাটকের ক্ষেত্রে সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, হতাশাগ্রস্ত, বেঁচে থাকার অর্থহীনতা, যান্ত্রিক-কিম্ভূতকিমাকার জীবনকে তুলে ধরতেই এই জাতীয় নাটকের সৃষ্টি। বিষয় বা বক্তব্য অনুযায়ী লেখকের অবচেতনেই সাহিত্যের সংরূপ নির্দিষ্ট হয়ে যায় বলে আমরা জানি। সুতরাং মানুষের অর্থহীন, উদ্ভট, অসংলগ্ন ভাবনাকে নাটকে রূপ দিতে গেলে নাটকের গঠনও সেরূপ বিধিবদ্ধ নাট্যরীতির বহির্ভূতই হবে। যারই ফল অ্যাবসার্ড নাটক। Abosurd শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ Absurdus থেকে। যার মানে out of tune। অ্যাবসার্ড শব্দের অর্থ হল অযৌক্তিক, অদ্ভুত ইত্যাদি। অদ্ভুত, অসম্ভব বিষয় বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই নাটক রচিত হয়।

যেমন- স্যামুয়েল বেকটের 'Waiting for Godo'(১৯৫২) নাটকে ভ্লাদিমির এবং এস্ট্রাগন দুজনে একজন অলীক মানুষ(Godot) মানে যার কোনো অস্তিত্ব নেই তার জন্য অপেক্ষা করছে। ওই দুজন মানুষ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কেন তারা পৃথিবীতে এসেছে ইত্যাদি। দুজন মানুষ গোডোর জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু গোডো কে এবং কেনই বা সে আসবে এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল প্রতীক্ষা করে থাকে। আবার ইওনেস্কোর 'Amedee or How to Get Rid of it' নাটকে দেখানো হয়েছে একটি মৃতদেহ নিয়ে দুটি চরিত্র পনেরো বছর ধরে একটি ফ্ল্যাটে থাকছে। আলব্যের কাম্যু-র 'The Myth of Sisyphus' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে।এখানেই তিনি মানুষের বেঁচে থাকার উদ্ভটত্ব বা তার উদ্দেশ্যহীন বেঁচে থাকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এর পরে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে ইওরোপ ও অ্যামেরিকান কিছু নাট্যকার এই জাতীয় ভাবনাকে নাটকের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন।

৯.৪.৩ বাংলা অ্যাবসার্ড নাটক

বাংলায় সার্থক অ্যাবসার্ড নাটক হিসেবে আমরা পাই বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ'(১৯৬৩) ও 'বাকি ইতিহাস'(১৯৬৫)। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃত্যু সংবাদ', 'রাজরক্ত' অ্যাবসার্ড নাটকের উদাহরণ। 'বাকি ইতিহাস' নাটকে শরদিন্দু ও বাসন্তীর সুখী দাম্পত্য জীবনের কথা আছে। খবরের কাগজে একটি আত্মহত্যার খবর প্রকাশিত হয় এবং সেই আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুটি গল্প লেখে। সীতানাথের আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করেন শরদিন্দু, কিন্তু সে নিজে হতাশাগ্রস্ত হলেও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়নি। সে এত কিছুর মধ্যেও আশার আলো দেখতে পায়। এই নাটকে তিনটি অঙ্ক আছে, কিন্তু কোনো দৃশ্যবিভাজন নেই। বাসন্তী কণা-সীতানাথের জীবনের যে পরিণতির ছবি আঁকে তা শরদিন্দুর ভালো লাগেনি। কণাকে তার নিজের পিতার হাত থেকে বাঁচাতেই সীতানাথ বিবাহ করে। এরপরেও কণার পিতা সীতানাথের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ইত্যাদি নিতে থাকে। সীতানাথ একসময় নিঃস্ব হয়ে যায়। কণা টাকা-পয়সাহীন সীতানাথকে ছেড়ে সীতানাথের ধনী বন্ধু নিখিলেশের কাছে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। সীতানাথের জীবনেও অন্ধকার নেমে আসে। কণার পিতা তাকে ঠকিয়েছে, কণা তাকে ভুল বুঝেছে। তাই শেষপর্যন্ত সীতানাথ আত্মহত্যা করে। আবার শরদিন্দুর গল্পে সীতানাথ একজন প্রধান শিক্ষক এবং স্ত্রী কণাকে নিয়ে চম্বলগড়ে বেড়াতে যান। সেখানে মেয়ের বয়সী বছর দশেকের পার্বতীকে নিয়ে জঙ্গলে ঘুরতে গেলে ডাকাতদের হাতে মেয়েটি ধর্ষিতা হয়।

কিন্তু সীতানাথ নিজেকেই দোষী মনে করে এবং অপরাধী ভাবে নিজেকে। নাটকের চরিত্রগুলো উদ্ভট, তাদের ক্রিয়াকলাপ উদ্ভট, তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলত অ্যাবসার্ড নাটকের সব লক্ষণই বাদল সরকারের এই নাটকে পাওয়া যায়। তাই বলা যায় 'বাকি ইতিহাস' একটি অ্যাবসার্ড নাটক। ''সীতানাথের জবানিতে শরদিন্দু-বাসন্তী আর সীতানাথ কণার জীবন একাকার হয়ে যায়, যে-ঘটনা শরদিন্দু আর বাসন্তীকে নিয়ে ঘটেছে, যে-সংলাপ উচ্চারণ করেছে শরদিন্দু আর বাসন্তী, তাই যখন ঘুরে আসে সীতানাথ-কণার সংলাপে, তখন অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়''। [সৌমিত্র বসু, বাকি ইতিহাস: অন্য ভাবনায়, রত্নাবলী, ২০০৬, পৃ. ৫৮।] অ্যাবসার্ড নাটকের সঙ্গে আত্মহত্যার সম্পর্ক আছে। জীবন সম্পর্কে হতাশ হলে বা বেঁচে থাকা যখন অর্থহীন মনে হয় মানুষ তখন আত্মহত্যা করতে যায়। সীতানাথের আত্মহত্যার কথা আছে 'বাকি ইতিহাস' নাটকে। সবদিক থেকে বিচার করে বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটককে অ্যাবসার্ড নাটক বলা যায়।

৯.৪.৪ প্রথাগত নাটকের সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের পার্থক্য

প্রথাগত নাটকের সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের পার্থক্যগুলো এখানে উল্লেখ করা হল-

ক) প্রথাগত নাটকের যে বিকাশ ও পরিণতি থাকে অ্যাবসার্ড নাটকে তা থাকে না। অ্যাবসার্ড নাটকের সূচনা ও বিস্তার থাকলেও সমাপ্তির নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই।

খ) প্রথাগত নাটকের ভাষা সহজবোধ্য এবং সমাজনির্দিষ্ট অর্থই প্রকাশ করে, কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকের ভাষায় সমাজনির্দিষ্ট অর্থ অনেক সময় প্রকাশ পায় না।

গ) প্রথাগত নাটকে ঘটনাপরম্পরা একটা যুক্তিশৃঙ্খল মেনে চলে। অ্যাবসার্ড নাটকে এরকম ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

ঘ) প্রথাগত নাটকে স্থান-কালের মধ্যে সংগতি থাকে। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকে তা থাকে না। যে কোনো নির্দিষ্ট নিয়মকে লঙ্ঘন করাই যেন তার উদ্দেশ্য।

ঙ) প্রথাগত নাটকে যবনিকা উত্তোলনের পর থেকেই তা শেষের দিকে ধাবিত হয়। কোথাও থেমে যায় না। সমাপ্তির দিকে যাওয়াই তার ভবিতব্য। অ্যাবসার্ড নাটকে এরকম কোনো নিয়ম মানা হয় না।

অ্যাবসার্ড নাটক আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি নাট্যরূপ। আধুনিক মানুষের মনের প্রতিচ্ছবি এই ধারার নাটক। নানা জাতীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ মানুষের মধ্যে কাজ করে। বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব একালের সকল মানুষের কাছেই কম-বেশি সত্য। আধুনিক মানুষের সংকটকেই আসলে অ্যাবসার্ড নাটকের রচয়িতারা তুলে ধরতে চান।

একক ১০ ❑ বেতার নাটক

গঠন

১০.১ ভূমিকা

১০.২ বেতার নাটকের বৈশিষ্ট্য

১০.৩ বেতার নাটকের সাধারণ লক্ষণ

১০.৪ বাংলা বেতার নাটকের ইতিহাস

১০.৫ সহায়ক গ্রন্থ

১০.৬ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১০.৭ বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১০.১ ভূমিকা

বেতার নাটক বলতে বেতার বা রেডিও-তে সম্প্রচারিত নাটককে বোঝায়। বেতার নাটকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অবয়ব দৃশ্যমান হয় না। কেবলমাত্র অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এই কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেই তাদের চরিত্রদের পৃথক পৃথকভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়। কেবলমাত্র কণ্ঠস্বর দিয়েই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে বালক-বালিকার চরিত্র শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিতে হয়। কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন। কিন্তু টেলিভিশনের আগে বেতার বা রেডিওই ছিল সাধারণ মানুষের বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম। তাই বেতার নাটকের ঐতিহ্য দেশে-বিদেশে সবথেকে প্রাচীন। বেতার নাটকের সংজ্ঞা- ''কেবলমাত্র শোনাবার উদ্দেশে অভিনীত গল্প যখন সংলাপ, শব্দ, নৈঃশব্দ ও সুর-সংযোজনে প্রযোজিত হয় তখন তার নাম বেতার নাটক''। [সূর্যকুমার সরকার, বেতারনাটক রচনারীতি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ১২।]

১০.২ বেতার নাটকের বৈশিষ্ট্য

ক) বেতার নাটকে অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ কেবলমাত্র বাচিক অভিনয়ের মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন। অর্থাৎ কণ্ঠস্বরই অভিনয়ের একমাত্র উপাদান।

খ) এই নাটকে বিভিন্ন রকম শব্দের প্রয়োজনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। যেমন- ঘুঙুর, ঝাঁজ, শাঁখ, ঘন্টা ইত্যাদি নানারকম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে সাউন্ডের এফেক্টস আনতে হয়।

গ) শারীরিক অনুপস্থিতির সবটুকুই বাকযন্ত্রের বিভিন্ন স্বরক্ষেপ করে শ্রোতার কাছে অভিনেতাকে

পৌঁছতে হয়। এটি নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। অভিনেতার কণ্ঠস্বরই শ্রোতার কাছে শেষ কথা। চলচ্চিত্র বা মঞ্চ অভিনয়ের বহুবিধ সুযোগ থেকে বেতার নাটকের চরিত্ররা বঞ্চিত হন।

ঘ) খুব বড়ো কোনো প্রেক্ষাপটে বেতার নাটক করা সম্ভব নয়। দৃশ্যপট, স্টুডিয়োর বাইরের কোনো শব্দ-দৃশ্য ইত্যাদি কেবলমাত্র শব্দের মাধ্যমে করার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা আছে।

১০.৩ বাংলা বেতার নাটকের ইতিহাস

বেতার নাটক সম্বন্ধে Richard J. Hand এবং, Mary Traynor একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন- "Radio drama does not set out to give the listener a photographic image of the 'real' world; instead; it provides audio clues to trigger the imagination to fill in the detail". অর্থাৎ বেতার নাটক শ্রোতাকে নাটকের কোনো একটি দৃশ্য নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। তার কল্পনাশক্তির চর্চা হয়। যা অনেক সময় মঞ্চে অভিনীত নাটকের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। মঞ্চ-নাটক দর্শক-শ্রোতাকে সম্পূর্ণ দৃশ্যটাই দেখিয়ে দিচ্ছে অভিনয়, পোশাক, দৃশ্য সজ্জা, আবহ সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু বেতার নাটকে কেবলমাত্র বাচিক শিল্পীর কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রানুষঙ্গের মাধ্যমে যেটুকু শব্দ শ্রোতার কানে এসে পৌঁছায় সেটাই শেষ কথা। ফলত শ্রোতাকে সবকিছুই কল্পনা করে নিতে হয় বা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার কল্পনায় দৃশ্যগুলো তৈরি হয়ে যায়। রেডিও নাটক বা বেতার নাটকে শ্রোতার মন স্বাধীনভাবে কোনোকিছু কল্পনা করতে পারে। এখানেই বেতার নাটক শ্রোতার কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বেতার নাটকে কোনো পর্ববিভাগ রাখা হয় না। একটানা অভিনয় চলে। স্থান-কালের ব্যবধান বিভিন্ন শব্দ-সংকেত বা ধ্বনি সহযোগে শ্রোতাকে বোঝানো হয়। কণ্ঠসঙ্গীতের মাধ্যমে চরিত্রকে তুলে ধরা হয়ে বেতার নাটকে এবং যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশ বা আবহ সৃষ্টি করে দেয়। বেতার নাটক রচয়িতাকে অতিরিক্ত সচেতন হতে হয়। কারণ এখানে নাটককে পাঠকের সামনে তুলে ধরার একমাত্র মাধ্যম শ্রুতি। ফলত রচয়িতাকে নিজের এবং শ্রোতার উভয়েরই কল্পনায় দখল রাখতে হয়। বেতার নাটকে চরিত্রের তুলনায় ঘটনার প্রতিই শ্রোতার মন নিবদ্ধ থাকে। 'Transmission through space'-এই আপ্তবাক্যকে অবলম্বন করেই বেতার নাটক গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র পৌঁছে গিয়েছিল। শ্রোতাদের স্বাধীনতা ছিল নাটক শোনা বা না-শোনার। ''শ্রোতাদের শ্রেণীবিভাগ নাটকের ক্ষেত্রে অর্থহীন। মঞ্চনাটকের পরিচালক দর্শকদের নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু বেতার কর্তৃপক্ষের হাতে তেমন কোন ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা শ্রোতার হাতে। শোনা না-শোনার ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন''। [সূর্যকুমার সরকার, বেতারনাটক রচনারীতি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ৩১।]

১০.৪ বাংলা বেতার নাটকের ইতিহাস

ভারতে প্রথম বেতারে সম্প্রচার শুরু হয় ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ক্লাব থেকে এই বেতার সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক সায়েন্স কলেজ থেকে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার করতে শুরু করেন। ১৯২৭ সালের ২৬ আগস্ট কলকাতা বেতারকেন্দ্র চালু হয়। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে 'বেতার নাটুকে দল' নামে একটি দল তৈরি করা হয়। এই দলটিই অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে 'জমাখরচ' নামে বেতার নাটক প্রচার করে ৪৫ মিনিটের মতো ১৯২৮ সালের ২৭ জানুয়ারি। ক্ল্যারিওনেট বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার এই সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে চুক্তি করে 'সীতা' নাটক সরাসরি রিলে করে শ্রোতাদের শোনানোর ব্যবস্থাও করেছিলেন সেই সময়। এরপর বেতারের সঙ্গে একে একে কাজী নজরুল ইসলাম, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখ যুক্ত হন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ১৯২৯ সালে নাটকবিভাগের সর্বময় কর্তা হবার পর বেতারনাটককে জনপ্রিয় করে তোলার নানারকম উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৯২০-র দশকে রেডিও আসার পর থেকে ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত ক্রমাগত রেডিও নাটক সমগ্র বিশ্বজুড়েই জনপ্রিয়তা লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও এর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু ১৯৫০-র সময় থেকে এর জনপ্রিয়তায় ভাটা শুরু হয়। কলকাতা বেতারকেন্দ্র কিন্তু এর অনেক পরে পর্যন্তও তার জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পেরেছিল। কলকাতা বেতারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক্‌পাল যুক্ত হয়েছেন। ফলে বেতার নাটকের জনপ্রিয়তা বাঙালি শ্রোতাদের কাছে কোনোদিনই কোনো অংশে কম হয়নি। কলকাতা বেতারে সম্প্রচারিত প্রথম বাংলা নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের লেখা 'নরনারায়ণ'। এটি প্রচারিত হয় ১৯২৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাত ৮.৪৫ মিনিটে।

বাংলা বেতার নাটকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সঙ্গে ছিলেন বাণীকুমার এবং শ্রীধর ভট্টাচার্য। এঁরাই বাংলা বেতার নাটকের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালের ২৬ আগস্ট বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পরিচালনায় পরশুরামের রচনা অবলম্বন করে রচিত 'চিকিৎসা সংকট' নাটক প্রচারিত হয়। প্রথম দিকে বেতার নাটক কিছুটা যেন থিয়েটারের উপর নির্ভরশীল ছিল। ধীরে ধীরে তা দূর হয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-র পর শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র বাংলা বেতার নাটককে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন। একসময় অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা, শম্ভু মিত্র, বসন্ত চৌধুরী, বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতু রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, জগন্নাথ বসু, ঊর্মিমালা বসু প্রমুখ অভিনেতারা রেডিও নাটকে অভিনয় করেছেন।

এক সময় শুক্রবারের বেতার নাটক খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বাড়িতে রেডিও আছে অথচ শুক্রবার রাত্রের নাটক শুনছে না এটা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। বেতারের নাটক একটা সময় এমনই জনপ্রিয় হয়েছিল যে বেতার নাটক থেকেই চলচ্চিত্রে রূপ পায়। যেমন-পদ্মা নদীর মাঝি, রামের সুমতি ইত্যাদি। আবার 'ডাকঘর', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' বেতার নাটক থেকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ছবি বিশ্বাস অভিনীত 'শাজাহান', শম্ভু মিত্র অভিনীত 'এবং ইন্দ্রজিৎ', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'নেফা সুন্দরী নেফা', শাঁওলী মিত্র অভিনীত 'ডাকঘর' ইত্যাদি বেতার নাটকের গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা। বাংলা বেতার নাটক একসময় বাঙালির কাছে প্রাণের অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু কালের নিয়মে বিনোদনের

বহুবিধ মাধ্যম এসে যাওয়ায় বেতার নাটকের সেই রমরমা আর নেই।

১০.৫ সহায়ক গ্রন্থ

১. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, নভেম্বর ২০০৯।

২. শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত-সন্দর্শন, ১৯৫৭।

৩. ড. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ, ২০১৮।

৪. অ্যারিস্টটল, অনু. শিশিরকুমার দাশ, কাব্যতত্ত্ব, প্যাপিরাস, ২০০৯।

৫. ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যপ্রসঙ্গ ও সমালোচনা-বিচিত্রা, করুণা প্রকাশনী, ১৪১৪।

৬. ড. বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক, অণিমা প্রকাশনী, ১৪১০।

৭. সৌমিত্র বসু, বাকি ইতিহাস অন্য ভাবনায়, রত্নাবলী, ২০০৬।

৮. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, দে'জ, ১৪২৩।

৯. ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-বিবেক, দে'জ, ২০০৯।

১০.ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব-বিচার, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৪০১।

১০.৬ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. মহাকাব্য কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

২. গীতিকবিতা কাকে বলে? কয়েকজন গীতিকবির নাম লিখুন।

৩. সনেট কাকে বলে? এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?

৪. একালে মহাকব্য লেখা হয় না কেন যুক্তি সহকারে লিখুন।

৫. কবিগান কাকে বলে? কোন্ সময় কবিগানের উদ্ভব হয়েছিল?

৬. কাব্যনাট্য কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

৭. ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

৮. পৌরাণিক নাটক কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

৯. অ্যাবসার্ড নাটক কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

১০. বেতার নাটক কাকে বলে?

১১. একাঙ্ক নাটক কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

১২. ট্রাজেডি কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

১৩. ট্রাজেডির শ্রেণিবিভাগগুলো লিখুন।

১৪. কমেডি কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

১৫. ট্রাজেডি ও কমেডির পার্থক্য লিখুন।

১৬. কমেডির শ্রেণিবিভাগ লিখুন।

১৭. শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডি ও গ্রিক ট্রাজেডির পার্থক্য লিখুন।

১৮. সামাজিক নাটক কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

১৯. ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

২০. কয়েকজন বেতার নাট্য-ব্যক্তিত্বের নাম লিখুন।

২১. প্রহসন কাকে বলে? কয়েকটি বাংলা প্রহসনের উদাহরণ দিন।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মহাকবি বলা যায় না কেন? যুক্তি দিন।

১০.৭ বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. মহাকাব্যের সংজ্ঞাসহ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে একটি বাংলা মহাকাব্যের পরিচয় দিন।

২. মহাকাব্যের সংজ্ঞাসহ শ্রেণিবিভাগ করুন। শ্রেণিবিভাগগুলো সম্বন্ধে বিস্তৃত লিখুন।

৩. গীতিকবিতার সংজ্ঞাসহ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৪. সনেট কাকে বলে? উদাহরণসহ সনেট বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫. কবিগান কাকে বলে? কবিগানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

৬. কবিগানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন এবং কয়েকজন কবিওয়ালার পরিচয় দাও।

৭. কাব্যনাট্য কাকে বলে? কাব্যনাট্য বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৮. ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞাসহ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

৯. পৌরাণিক নাটকের সংজ্ঞাসহ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

১০. সামাজিক নাটক কাকে বলে? বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে একটি বাংলা সামাজিক নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

১১. অ্যাবসার্ড নাটক কাকে বলে? এই প্রকার নাটকের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে একটি নাটকের উদাহরণ দিয়ে নাটকের এই সংরূপটি ব্যাখ্যা করুন।

১২. একাঙ্ক নাটক কাকে বলে? একটি বাংলা একাঙ্ক নাটকের উদাহরণ দিন।

১৩. বেতার নাটক কাকে বলে? এই প্রকার নাটকের লক্ষণগুলো আলোচনা করুন।

১৪. ট্রাজেডি নাটক কাকে বলে? ট্রাজেডি নাটকের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে একটি বাংলা ট্রাজেডি নাটক বিষয়ে আলোচনা করুন।

১৫. কমেডি নাটক কাকে বলে? কমেডির সাধারণ লক্ষণগুলো আলোচনা করুন।

১৬. ট্রাজেডি ও কমেডি কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ট্রাজেডি ও কমেডির মধ্যে পার্থক্যগুলো আলোচনা করুন।

১৭. ট্রাজেডির উদ্ভব বিষয়ে আলোচনা করুন। প্রসঙ্গত গ্রিক ট্রাজেডি ও শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

১৮. প্রহসনের সংজ্ঞাসহ সাধারণ লক্ষণগুলো আলোচনা করুন।

১৯. প্রহসনের সংজ্ঞা দিন। কমেডির সংঙ্গে প্রহসনের পার্থক্য লিখুন।

Note

কোর কোর্স ১০
মডিউল ২
(উপন্যাস ও ছোটগল্প)

একক ১১ ❑ নকশা, নভেল ও রোমান্স

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ নকশা: উদ্ভব ও সংজ্ঞা

১১.৪ নকশার বৈশিষ্ট্য

১১.৫ বাংলা নকশার দৃষ্টান্ত

১১.৬ একটি বাংলা নকশার বিষয়-সংক্ষেপ

১১.৭ নভেল: উদ্ভব ও সংজ্ঞা

১১.৮ নভেলের বৈশিষ্ট্য

১১.৯ রোমান্স: উদ্ভব ও সংজ্ঞা

১১.১০ রোমান্সের বৈশিষ্ট্য

১১.১১ বাংলা রোমান্সের দৃষ্টান্ত

১১.১২ নভেল ও রোমান্সের পার্থক্য

১১.১৩ প্রশ্নাবলী

১১.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

পৃথিবীর বেশিরভাগ সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখি পদ্যের মধ্যে দিয়ে সূত্রপাত, গদ্যের আবির্ভাব তার পরে। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা উনিশ শতকে। মূলত প্রবন্ধধর্মী গদ্যই ছিল সেই সময়ের গদ্য সাহিত্যের বা সূচনা পর্বের গদ্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই গদ্য ধীরে ধীরে বাংলা আখ্যানে রূপান্তরিত হল এবং বাংলা গদ্যসাহিত্যের নতুন নামকরণ হল কথাসাহিত্য। প্রারম্ভিক পর্যায়ের কথাসাহিত্যের যে প্রকৃতি ও স্বরূপ লক্ষ করা যায়, সেই দিকটিকে উন্মোচন করা এই এককের উদ্দেশ্য।

১১.২ প্রস্তাবনা

এই এককের মূল আলোচ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রস্তাবনায় যা বলা যেতে পারে বা ছাত্র-ছাত্রীরা এই একক অনুশীলন করে যেটা খুব সহজেই বুঝতে পারবে সেগুলি হলো–

১. বাংলা সাহিত্যে নকশা কীভাবে এল এবং এর গুরুত্ব কতখানি।

২. নকশা তৎকালীন সমাজে কী ভূমিকা নিয়েছিল।

৩. নভেল কী, কেন এবং এর বিস্তারিত আলোচনা এই এককের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

৪. রোমান্স এবং নভেলকে বাংলা প্রাথমিক পর্যায়ে কথাসাহিত্যের বীজ বলা যেতে পারে। এই এককে সেই দিকগুলিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

১১.৩ নকশা: উদ্ভব ও সংজ্ঞা

উনিশ শতকের দুইয়ের দশক থেকে 'সমাচার-দর্পণ' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গাত্মক বিভিন্ন ধরনের নকশা রচনার ভিত্তি স্থাপন হয়। মূলত বলা যায় সকলের অজ্ঞাতেই এক সাহিত্যিক প্রজাতির জন্ম হল এই সময়ে এবং এই ধরনের লেখালেখির মাধ্যমে। এই 'বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ' সাধারণত পাঠক শ্রেণির কাছে অজানা ছিল। সাহিত্য সমালোচকেরা নকশাকে বিশেষ কোনও সাহিত্যের সৃজনশীল ধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি। লিটেরারি টাইপ বা সাহিত্যকোষ গ্রন্থগুলিতে নকশার স্বরূপ বিশ্লেষণের তেমন কোনও প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। মূলত তাঁরা তাঁদের সমালোচনায় শুধু নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন।

উনিশ শতকের বাংলায় বিভিন্নজনের রচনায় নকশায় প্রতিশব্দ হিসেবে 'স্কেচ' (Sketch) শব্দটির বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এই 'স্কেচ' শব্দটি পাশ্চাত্য শব্দ। পশ্চিমদেশের বিভিন্ন গ্রন্থের নামকরণে এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন-ডিকেনস তাঁর একটি গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'Boz's Sketch' বা জন ম্যাকলস-এর অন্যতম লিখিত গ্রন্থ 'Sketches of Persia'-র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্র ধরে বাংলায় বিশেষ রাজনৈতিক সামাজিক পটভূমিকায় নকশা জাতীয় রচনার শুরু হয়।

সামাজিক ও মানবিক কোনও চরিত্র-ঘটনা-দৃশ্য হল স্কেচ। Harry Shaw-র Concise dictionary of literacy Term-এ স্কেচ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "A short, descriptive essay; a short play or brief dramatic performance; any Simply Constructed Composition that presents a single character, single scene or single incident. A sketch may also be a rough design, plan, or first draft of a literary work or a brief hasty outline of an article, essay or book." অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ঘোষের মন্তব্য নকশা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "ব্যঙ্গ তামাসার উল্লেখ করে চিত্ত বিনোদনের জন্য একটা নিছক হাসির চিত্র আমাদের সামনে এনে কর্মক্লান্ত মনকে তৃপ্তি দেওয়া নকশার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজ, শিক্ষাপদ্ধতি, সাহিত্য প্রভৃতির যে-কোন

একটি ত্রুটি লক্ষ্য করে বিদ্রুপের ইঙ্গিত নকশায় থাকবে। আর এক উপাদান হলো 'শিক্ষাদানের চেষ্টা'। নকশার ভাষা লঘু, সহজ ও কৌতুককর হবে। আবার নকশায় নীতিমূলক বক্তৃতা থাকতেও পারে। নকশা আকারে যথাসম্ভব ছোট হবে। নকশা প্রবন্ধের, প্রহসনের, ব্যঙ্গ কবিতার, ছোট গল্পের আকারেও হতে পারে।''

১১.৪ নকশার বৈশিষ্ট্য

১. নকশা মূলত গদ্যে রচিত হয়। তবে কোথাও কোথাও এর বিকল্পও চোখে পড়ে। পদ্যেও নকশাধর্মী রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন পদ্যে লেখা আংশিক নকশাধর্মী রচনা হল 'দূতী বিলাস'।

২. নকশাকে সাধারণত কথাসাহিত্যের অন্দরে রাখা হয়। আবার এর মধ্যে প্রবন্ধের সাধারণ ধর্ম উপস্থিত থাকে।

৩. নকশাজাতীয় রচনাকে খুব ভালো ভাবে পাঠ করলে তার মধ্যে কখনও কখনও গল্পের উপাদান বা নাটকের ধরণ লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'। আবার এই জাতীয় রচনায় চরিত্রের আদলও ফুটে ওঠে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কমলাকান্ত।

৪. মানুষ ও তার জীবন এবং সেই জীবনের সঙ্গে সমাজের যে সম্পৃক্ততা, সেই দিকটিকে আলোচনা করা নকশার প্রধান লক্ষ্য বা বৈশিষ্ট্য।

৫. নকশায় সামাজিক চিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তার মধ্যে রস সঞ্চারের প্রবল চেষ্টা থাকে। শুধু যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে জ্ঞান পরিবেশন করা নয়, সেই পরিবেশন উপযুক্ত পাঠকের উপভোগের বস্তু করে তোলার চেষ্টা থাকে।

৬. নকশা মূলত ব্যঙ্গের আদলেই লেখা। ব্যঙ্গ সংশ্লিষ্ট সব রকমের হাস্য রসাত্মক স্বাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

৭. সমাজ বাস্তবতা ও সমকালীন চিত্রপট নকশার সঙ্গে অবিভক্ত, অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। নকশাকার সাধারণত তাঁদের সময়ের সমাজের স্খলন-পতন, বিবিধ অনাচার তুলে ধরতেন নকশা জাতীয় রচনার মধ্যে।

১১.৫ বাংলা নকশার দৃষ্টান্ত

বাংলায় নকশা জাতীয় কিছু গ্রন্থ হল– কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল', ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস'। এছাড়া আরও অনেক নকশা জাতীয় রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় উনিশ শতকে।

১১.৬ একটি বাংলা নকশার বিষয়-সংক্ষেপ

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি নকশা জাতীয় গ্রন্থ। ১৮৬২ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং দুই খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থে তৎকালীন কলকাতার হঠাৎ ভুলে-ফেঁপে ওঠা এক ভণ্ড-ভারাক্রান্ত নব্য সমাজের ছবি ফুটে ওঠে। সেই সমাজে উপস্থিত মানুষের চরিত্র-চিত্রণ নকশাকার করেছেন। যাদেরকে নিয়ে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন তারা মূলত লেখকের স্বশ্রেণির মানুষজন। কলকাতার চড়কপার্বণ অংশে লেখক কলকাতার কোম্পানি আমলের নব্য ধনীদের উদ্ভবের কথা বলেছেন। বিভিন্ন কাজকর্মে ঘুষখোর বা দালালদের উল্লেখ রয়েছে। কলকাতার বারোয়ারি পূজা অংশে বারোয়ারি পূজা উদ্ভবের কথা থেকে বিভিন্ন ধরনের বারোয়ারি পূজার কথা জানতে পারি। মাহেশের স্নানযাত্রা বা রথ অংশে উৎসবের প্রতি মানুষের উন্মাদনার বিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়। দুর্গোৎসব অংশে কলকাতা শহরের দেড়শ বছরের বিস্তৃত বিবরণ লক্ষ করি। এছাড়া ছেলেধরা, ক্রিশ্চানি, মিউনিটি, মড়াফেরা, রামলীলা হুজুক, ইত্যাদি অংশের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজের এক সামাজিক ইতিহাস রচনা করেছেন।

১১.৭ নভেল: উদ্ভব ও সংজ্ঞা

নভেল শব্দটির উৎপত্তি ইতালিয়ান নভেল্লা (Novella) শব্দ থেকে। নভেল্লা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল– 'a little new thing' অর্থাৎ ছোট নতুন বস্তু বা বলা যেতে পারে আধুনিক শিল্পরূপ। ইতালিতে গদ্যে লেখা ছোট কাহিনিকে বোঝাতে 'নভেল্লা' শব্দটির ব্যবহার দেখা যেত। আঠারো শতকের শেষ দিকে উপন্যাসকার গ্যেটে গদ্য কাহিনিকে বোঝাতে জার্মান সাহিত্যে নভেল (Novelle) নামটি ব্যবহার করেন। যার পরিবর্তিত রূপ নভেল (Novel)। বাংলা সাহিত্যে এই নভেলকেই উপন্যাস হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে আমরা উপন্যাস বলতে যা বুঝি তা মূলত বিদেশজাত। সুতরাং বলা যেতে পারে বাংলা উপন্যাসের সূচনাপর্ব বিদেশি ভাবধারায় ভাবিত, সুগঠিত। যার মূলে পাশ্চাত্য নভেল (Novel)। সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানতে পারি স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'পামেলা' (Pamela) গ্রন্থটি প্রথম ইংরেজি উপন্যাস বা নভেলের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ।

মানুষের জীবন নানান অভিজ্ঞতার সমাহার। সৃজনশীল মানুষ সেই অভিজ্ঞতার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে বিভিন্ন শিল্পকলার মাধ্যমে। নভেল আধুনিক সাহিত্যের নব্য রীতি বা রূপ। অর্থাৎ নভেল বা উপন্যাস বলতে বোঝায়, লেখক বাস্তব জীবন অভিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে একটি জীবন সম্পর্কে তার সামগ্রিক চিত্র আখ্যানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন । আবার বলা যায়, যে আখ্যানধর্মী সাহিত্য মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ বা সামগ্রিক জীবন কাহিনি, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ হয়ে লেখকের জীবনাদর্শ ও জীবনের বোধ প্রকাশ করে তাকে নভেল বলে। E.M. Forster তাঁর বিখ্যাত 'Aspects of the Novel' গ্রন্থে নভেল বা উপন্যাসকে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের গদ্য কাহিনি বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

তিনি বলেছেন, "A fiction in prose of a certain extent." এই প্রসঙ্গে রয়্যালফ ফক্স বলেছেন, "The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression."

১১.৮ নভেলের বৈশিষ্ট্য

১. সমাজ ও জীবনের মানবিক অনুভূতি ও মানবজীবনের কড়চার কাহিনি নভেল। অর্থাৎ নভেল হল আধুনিক জীবনের গদ্যকাব্য, যেখানে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন দেখা যায়।

২. নভেলে বাস্তবতাবোধ, চরিত্র সৃষ্টি, জীবনবোধ প্রভৃতি প্রকট হয়ে ওঠে। যেন চেনা মানুষের জীবনদ্বন্দ্ব আমাদের সামনে উদ্ভাসিত।

৩. নভেল বা উপন্যাস বর্ণনাত্মক রীতিতে পরিবেশিত হয়। লেখক বর্ণনার মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে পাঠকের সামনে সুচারুভাবে হাজির করেন।

৪. নভেলের মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা পাঠকের সামনে তুলে ধরেন অর্থাৎ জীবন সম্পর্কে তাঁর একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়।

৫. নভেলের সংলাপের মধ্য দিয়ে 'নাটকীয় রস' উপভোগ করা যায়।

৬. নভেল কাহিনির মধ্য দিয়ে চিরায়ত জীবনসত্যের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে মাত্র।

৭. নভেল শুধুমাত্র সমকালের কথা বলে না, সে অতীতেও গমন করে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। তবে শুধু অতীত ইতিহাসের তথ্য বা চরিত্র বর্ণনাই নভেলের কাজ নয়।

৮. নভেল তথ্যের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পৌঁছে যায় নিরাপদ দূরত্বে, নির্মাণ করে তার কল্পনার বাস্তব জগৎ।

১১.৯ রোমান্স: উদ্ভব ও সংজ্ঞা

পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় শিল্প-সংস্কৃতিতে রোমান্সের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। খুব ভালো ভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় অধিকাংশ ইউরোপীয় সাহিত্যে উপন্যাস বা নভেল শব্দের পরিবর্তে যে শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায় সেটি হল 'রোমান' (roman)। এই রোমান শব্দটি মধ্যযুগের রোমান্স (Romance) শব্দ থেকে আগত। পাশ্চাত্য ফিকশনে উপন্যাসের পূর্বসূচনা হয়েছিল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের স্প্যানিশ ও ফরাসি রোমান্সগুলিতে। ফরাসি ও আরও অনেক ইউরোপীয় ভাষায় 'novel'-এর বদলে ব্যবহার করত 'roman' শব্দটি।

রোমান্স বলতে সাধারণত পূর্ব ও মধ্যযুগের একধরনের বীরত্বব্যঞ্জক মূলত অবাস্তব অতিরঞ্জিত কাল্পনিক কাহিনিকে বোঝানো হত। অর্থাৎ মধ্যযুগের রোমান্স ছিল বাস্তব সম্পর্ক রহিত, বীরত্বব্যঞ্জক, আকাশমুখী কল্পকাহিনি। কিন্তু বর্তমানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোমান্সের এই ধারণাটি অনেকটা পরিবর্তিত

হয়েছে এবং তার পরিবর্তিত রূপ এসে দাঁড়িয়েছে; বাস্তব আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যখন লেখক কল্পনার মাধ্যমে ওই বাস্তব কাহিনিকে আতিশয্য পূর্ণ করে তোলেন তখন সেই কাহিনিকে বলা হবে রোমান্স। এ প্রসঙ্গে আঠারো শতকের শেষ দিকে Clara Reeve তাঁর 'Progress of Romance' গ্রন্থে লিখেছেন– "The novel is a picture of real life and manners, and of the time in which it is written. The romance, in lofty and elevated language, describes what never happened on is likely to happen". সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন, "আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাস্যের কোন স্থান নেই।"

রোমান্সকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। তবে মূলত ঐতিহাসিক রোমান্স ও কাব্যিক রোমান্স বিশেষভাবে আলোচিত।

১১.১০ রোমান্সের বৈশিষ্ট্য

১. রোমান্স মূলত বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এবং কল্পনার আশ্রয়ে গড়ে ওঠে, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। তাই এখানে প্রবাবল ইম্পসিবিলিটি বা সম্ভাব্য অঘটন স্থান পায়।

২. মধ্যযুগের রোমান্স অলৌকিক বীরত্বব্যঞ্জক অবাস্তব কাহিনির বিষয় নিয়েই প্রকাশিত হত। কিন্তু বর্তমানে বাস্তব কাহিনির সঙ্গে কল্পনার আতিশয্য প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।

৩. রোমান্সের মধ্যে অতীতের প্রতি আসক্তি এবং পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা, অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস স্থাপন ও কবিত্বময় কল্পনার উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যায়।

৪. রোমান্স পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে একধরনের রহস্যময়তার জন্ম হয় এবং সেই থেকে আনন্দানুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৫. রোমান্সের অন্যতম উপাদান প্রকৃতি। রোমান্সের মধ্যে সাহিত্যে প্রকৃতির রহস্যময়ী গূঢ়ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়।

৬. বাস্তব জীবন প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে রোমান্স এক বিস্ময় রসে পূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রাত্যহিক বাস্তবতার ঊর্ধ্বে প্রস্ফুটিত মুহূর্তগুলি এক মায়াময় রহস্য তৈরি করে।

৭. রোমান্স পাঠের পর লক্ষ করলে দেখা যায় এখানে নরনারীর জীবনযাত্রা অপ্রত্যাশিত আনন্দে ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

১১.১১ বাংলা রোমান্সের দৃষ্টান্ত

বাংলা ভাষায় রোমান্সধর্মী রচনার উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য– বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা', রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', বুদ্ধদেব বসুর 'প্রভাত ও সন্ধ্যা', মনীন্দ্রনাথ বসুর 'রমলা' প্রভৃতি।

১১.১২ নভেল ও রোমান্সের পার্থক্য

১. উদ্ভবের দিক দিয়ে দেখলে নভেল আধুনিক যুগের ফসল, এ যুগের সৃষ্টি। কিন্তু রোমান্স মধ্যযুগের।

২. সমাজ ও বাস্তব জীবনের এক নির্মম সত্যের উদঘাটন হল নভেল, অন্যদিকে রোমান্স অতীতের প্রতি আকৃষ্ট।

৩. নভেলের কাব্যিকতার উপস্থিতি খুব একটা থাকে না, তবে রোমান্সে কাব্যিকতা সমগ্র জুড়ে থাকে।

৪. নভেলে নীতি শিক্ষা, আদর্শ বা বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা থাকে না, কিন্তু রোমান্সে থাকে।

৫. নভেলের ভাষা চলিত কিংবা সাধু গদ্যে রচিত হয়, কিন্তু রোমান্সে সেই গদ্যময়তায় কাব্যিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়।

৬. কাহিনিতে জটিলতা এবং সেই জটিলতার মধ্যে দিয়ে নভেলের চরিত্রের বিকাশ ঘটে। তবে অন্যদিকে সেই অর্থে রোমান্সে চরিত্রের বিকাশ ঘটে না।

১১.১৩ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. বাংলায় নকশার উদ্ভব কোন শতকে?

২. নকশার ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?

৩. নভেল শব্দটি কোন ভাষার শব্দ থেকে এসেছে?

৪. রোমান্সকে মূলত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

৫. কয়েকটি রোমান্সের নাম করুন।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. নকশার আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে কীভাবে ঘটল? নকশা কী? তার উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করুন।

২. একটি নকশার বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে পর্যালোচনা করে নকশার বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের ভাষায় লিখুন।

৩. নভেলের ইতিহাস, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৪. নভেল ও রোমান্সের উদ্ভব আলোচনা করে উভয়ের পার্থক্য উল্লেখ করুন।

৫. রোমান্সের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

১১.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. সাহিত্য প্রকরণ– হীরেন চট্টোপাধ্যায়

২. সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ– কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

৩. সাহিত্যের রূপভেদ: রূপরীতি নির্ণয়– সুধাংশুশেখর মণ্ডল

৪. হুতোম প্যাঁচার নকশা– সম্পাদনা-খগেন্দ্রনাথ মাইতি

৫. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত– অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. উনিশ শতক– অলোক রায়

৭. বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা– আবুল কাশেম চৌধুরী

৮. উনিশ শতকের বাংলা– সম্পাদনা- অলোক রায় ও গৌতম নিয়োগী, পারুল প্রকাশনী

৯. সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ– সম্পাদনা- স্বপন বসু

১০. অলোক রায় (সম্পাদিত)– সাহিত্যকোষ

১১. E. M Forster- Aspects of the Novel

১২. J.A Cuddon- A Dictionary of Literary Terms

১৩. M.H Abrams- Glossary of Literary Terms

একক ১২ ❑ ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ প্রস্তাবনা

১২.৩ ঐতিহাসিক উপন্যাস: সংজ্ঞা

১২.৪ ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

১২.৫ দৃষ্টান্ত

১২.৬ একটি বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস পর্যালোচনা

১২.৭ সামাজিক উপন্যাস: সংজ্ঞা

১২.৮ সামাজিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

১২.৯ দৃষ্টান্ত

১২.১০ একটি বাংলা সামাজিক উপন্যাস পর্যালোচনা

১২.১১ প্রশ্নাবলী

১২.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

নকশা-রোমান্সের যুগ পেরিয়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ উপন্যাস, যা পাঠক সমাজে গভীরভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। উপন্যাস যেহেতু মানুষ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের কথা বলে সেহেতু সমালোচকরা উপন্যাসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে উপন্যাসের প্রকৃতি-স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করেছেন। আমাদের আলোচ্য এই এককের উদ্দেশ্য মূলত ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস অনুধাবন করা।

১২.২ প্রস্তাবনা

আলোচ্য এই এককের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি প্রস্তাবনায় সূত্রাকারে সাজানো যেতে পারে এইভাবে;

১. ইতিহাস এবং ইতিহাসকে অবলম্বন করে যে সৃষ্টি অর্থাৎ তার অন্তর্নিহিত বস্তুকে ছাত্র-ছাত্রীরা খুব সহজেই অনুশীলন করতে পারবে।

২. ঐতিহাসিক উপন্যাস কী, কেন এবং এর সাহিত্যিক মূল্যের অর্থ উপস্থাপন করা।

৩. সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সেই দর্পণের অন্যতম মাধ্যম সামাজিক উপন্যাস। সেই সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

৪. সামাজিক উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে সমাজের এক বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হবে ছাত্র-ছাত্রীরা।

১২.৩ ঐতিহাসিক উপন্যাসঃ সংজ্ঞা

উপন্যাসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। তার মধ্যে একটি শ্রেণি হল ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাসকে নির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞায় আখ্যায়িত করা যায় না। তবে খুব সহজভাবে বললে বলা যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাসে মূল সমস্যার সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক বিষয়কে সামনে রেখে বা ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তির জীবন বা বিশেষ যুগের ঘাত-প্রতিঘাতকে রূপায়ণ করে তোলে ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসের কাহিনি ও চরিত্রকে আশ্রয় করে লেখক যখন ইতিহাসের অর্ন্তলোকে উঁকি দিয়ে একটি বিশেষ যুগ ও তার কিছু ঘটনা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আশা নিরাশার কথা ফুটিয়ে তোলেন তখন সেই শ্রেণির উপন্যাসকে বলা হবে ঐতিহাসিক উপন্যাস। লুকাচ তাঁর 'The Historical Novel'-এ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আবির্ভাবের কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন এবং উনিশ শতকের প্রারম্ভিক সময়পর্ব অর্থাৎ নেপোলিয়নের পতনের পরবর্তী বছরগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মলগ্ন বলে উল্লেখ করেছেন।

কোনও কোনও সমালোচক আবার ঐতিহাসিক উপন্যাসকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস ও মিশ্র ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস। যে উপন্যাসে ইতিহাস পুরোপুরি থাকে এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ঐতিহাসিক রস' সৃজনে সক্ষম হয় তাকে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' প্রভৃতি। আর অন্যদিকে মিশ্র ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস হল ইতিহাসকে সঙ্গে নিয়ে কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থার কথা বলা। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' প্রভৃতি।

১২.৪ ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

১. ঐতিহাসিক উপন্যাস; এই নামকরণের মাধ্যমেই বোঝা যায় উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হবে ইতিহাসকেন্দ্রিক, ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত।

২. এই ধরনের উপন্যাসের চরিত্রগুলি ইতিহাস নির্ভর হয়। তবে কখনও কখনও উপন্যাসের বা প্লটের প্রয়োজনে কাল্পনিক চরিত্রেরও উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

৩. সমসাময়িক জীবনের বিষয়বস্তু ও বাস্তব চরিত্রসমূহের পরিবর্তে ঐতিহাসিক উপন্যাসে উপন্যাসকার বেছে নেন অতীত ইতিহাসের কোনও বিশেষ একটি সময়পর্ব।

৪. ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখা যায় উপন্যাসকার অবশ্যই একটি ইতিহাসের দ্বন্দ্বকে বর্ণনা করে থাকেন অর্থাৎ ইতিহাসের দ্বন্দ্ব হবে উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব।

৫. ঐতিহাসিক উপন্যাস শুধুমাত্র ইতিহাসের বর্ণনা থাকবে বা ইতিহাসের সময়কেই বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হবে এমন নয়, এই ধরনের উপন্যাসে লেখকের জীবনদর্শন ও সমসাময়িকতার বিচ্ছুরণ ঘটে থাকতে পারে।

৬. ঐতিহাসিক উপন্যাসকারকে সবসময় উপন্যাসে বর্ণিতব্য যুগ তথা ঘটনা-কাহিনির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়। সেই সময়ের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সংস্কার, পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদি সকল বিষয়ে উপন্যাস লেখককে সচেতন থাকতে হয়।

৭. উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা বা চরিত্রগুলি ইতিহাসের পাতায় প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয়। সুতরাং এই সমস্ত চরিত্র রূপায়ণে লেখককে ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়।

৮. উপন্যাসকার শিল্পগত প্রয়োজন বা মূল্যের তাগিদে কখনও কখনও কালবিরোধগত দোষের আশঙ্কা সত্ত্বেও কিছু কিছু পরিবর্তনও করে থাকেন।

১২.৫ দৃষ্টান্ত

ইংরেজি সাহিত্যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনি রচিত হলেও প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থক রচয়িতা স্যার ওয়াল্টার স্কট। তাঁর সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হল– 'Waverly', 'Ivanhoe', 'The Heart Of Midlothian', চার্লস ডিকেন্সের– 'A Tale of Two cities' প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হল 'রাজসিংহ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবী কঙ্কন', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়', প্রমথনাথ বিশীর 'লালকেল্লা', গজেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বহ্নিকন্যা', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' প্রভৃতি।

১২.৬ একটি বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস পর্যালোচনা

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হল 'রাজসিংহ'। বিশ্লেষণের জন্য এই উপন্যাসটিকেই আলোচনা করব। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন; ''আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।'' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপন্যাস সমালোচনায় বলেছেন; ''বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কে একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছে।'' রাজস্থানের রাজপুতদের গৌরব গাঁথা ইতিহাসকে কেন্দ্র করে মূলত হিন্দু জাতির বাহুবল দেখাবার জন্য বা গৌরবান্বিত করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'রাজসিংহ' উপন্যাসটি রচনা করেন।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাহিনি অংশের দিকে লক্ষ করলে দেখব চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র করে মূলত উপন্যাসটি পরিক্রমা। রাজপুত বীর রাজসিংহের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল চঞ্চলকুমারীকে। নিজেকে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজীবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

রাজসিংহ তার সাধ্যমত রণনৈপুণ্য প্রকাশ করে চঞ্চলকুমারীর মনোবাসনা পূর্ণ করে। এই মূলকাহিনির সঙ্গে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দুটি উপকাহিনি সংযুক্ত রয়েছে; প্রথমত, দরিয়া-জেবউন্নিসা-মবারক প্রণয়বৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয়ত, নির্মলকুমারী-মানিকলাল-ঔরঙ্গজীব কাহিনি। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনার পাশাপাশি রাজপুত-মোগলের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ ইতিহাসের একটি পর্যায়কে লেখক বিশ্বস্তভাবেই অনুসরণ করেছেন, তবু বলতে হবে তিনি নির্বাচন করেছেন কিছু মানবিক কাহিনি যার অন্তর্বাহিত ঐক্যসূত্র প্রেম। চঞ্চলকুমারীর প্রেম বীরপূজা হিসাবে অভিহিত হতে পারে। রাজকুমারী কেবল নিজের রাজ্য উদ্ধার করবার জন্যই রাজসিংহকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কিনা, প্রবীণ রাজসিংহকে পতিত্বে বরণ করার ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র সংকোচ আছে কিনা, সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়েই এই রাজপুত বীর তাকে পত্নী হিসাবে বরণ করেছিল।

এই উপন্যাসে ঔরঙ্গজীব ও নির্মলকুমারীর যে বিক্ষিপ্ত উপকাহিনি রয়েছে সেখানেও দেখা যায় ইতিহাসের ঔরঙ্গজীব অনেক বেশি মানবিক মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সেই জন্যই আমাদের বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না যে, লেখক কেন সবার আগে উপন্যাসের দাবি মিটিয়েছেন। অর্থাৎ ইতিহাস থেকে তিনি এমন আখ্যানই নির্বাচন করেছেন অথবা সেই কাহিনিকে এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যাতে তার মানবিক আবেদনই প্রাধান্য পায়। তাই রাজসিংহ বড়ো যোদ্ধা ছিল এই প্রশ্নের থেকে আমাদের অনেক বেশি আকর্ষণ করে রাজসিংহ মানুষ হিসাবে কত বড়ো ছিলেন এবং সম্রাট ঔরঙ্গজীব ইতিহাসের পাতা থেকে সজীব মানুষ হিসাবে কতোটা ধরা দিয়েছে।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করে সাহিত্যের রসে জারিত করেছেন লেখক। অর্থাৎ রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেব, জেবউন্নিসা, উদিপুরী প্রভৃতি এই জাতীয় চরিত্রের নিদর্শন। চঞ্চলকুমারী চরিত্রটি ইতিহাস বহির্ভূত কিনা সেই প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার বলেছেন; ''রূপনগরের রাজকুমারী বলিতে কিষেণগড় রাজকন্যাই বুঝায়।'' ইতিহাসে উঠে আসা প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় এই রাজকন্যার নাম ছিল চারুমতী। সে রূপসিংহের জেষ্ঠ্যা কন্যা। তাছাড়া ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে রাজসিংহ রন্ধ্রপথে বৃক্ষের অবরোধ তৈরি করে ঔরঙ্গজেব এবং উদিপুরী বেগমকে বন্দী করার বিবরণ অর্মের 'Historical Fragments of the Mogul empire' গ্রন্থে আছে। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব, উদিপুরীকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বিপদমুক্ত ঔরঙ্গজেবের সন্ধিকে অস্বীকার করার প্রসঙ্গ ইতিহাস সম্মত। যুদ্ধের ফলাফলের সঙ্গেও ইতিহাসের বিরোধ নেই। ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা, হিন্দুবিদ্বেষ ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্য।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটছে রাজসিংহের যুদ্ধ জয়ের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে। ইতিহাসের তথ্যের প্রতি লেখকের আনুগত্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় এবং মবারক-জেবউন্নিসার ট্র্যাজিক উপাখ্যানের

মধ্য দিয়ে উপন্যাসে যে কাঙ্ক্ষিত মানবরস পরিবেশিত হয়েছে, তা এককথায় অনবদ্য। সামগ্রিকভাবে একটি ঐতিহাসিক বাতাবরণে উপন্যাসের বহির্ভূত আকর্ষণ সৃষ্টি করার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ইতিহাস ও কল্পনার মেলবন্ধনের যে রসায়ন 'রাজসিংহ' উপন্যাসে রস নিষ্পত্তিতে সহায়ক হয়েছে তাকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঐতিহাসিক রস' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফলত সমগ্র উপন্যাসে জুড়ে বা পরিশেষে এই 'ঐতিহাসিক রস' সফলভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। এজন্য সমালোচকরা যেমন 'রাজসিংহ' উপন্যাসকে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন ঠিক একইভাবে উপন্যাসের লেখকও এই উপন্যাসকে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে দাবি করেছেন চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায়।

১২.৭ সামাজিক উপন্যাসঃ সংজ্ঞা

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। কোনও সাহিত্যই সমাজ ও সামাজিক জীবন বর্জিত নয়। সমাজ উপন্যাসের অঙ্গনে এসে হাজির হয়। অর্থাৎ জন্মলগ্ন থেকেই সমাজের সঙ্গে উপন্যাসের নাড়ির যোগ। অর্থাৎ এদিক থেকে বিচার করলে সব উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাস বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে সূক্ষ্মভাবে সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় সাধারণভাবে বলা যেতে পারে; ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মৈত্রী ও বৈরিতার বহু বিচিত্র টানাপোড়েন, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যেসব উপন্যাসে উপস্থিত এবং সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিবরণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তথা সামাজিক সমস্যা রূপায়িত চরিত্রসমূহের মানসবৃত্তের ভাঙচুর যেসব উপন্যাসে আমারা পাই তাকেই সামাজিক উপন্যাস বলে। সামাজিক উপন্যাসের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে অ্যাব্রাহম বলেছেন, ''The sociological novel emphasizes the influence of social and economic conditions on character an events''.

সামাজিক উপন্যাস আলোচনাচক্রে আর একটি বিষয় খুব সহজভাবেই উঠে আসে, সমাজ বাস্তবতাবাদী উপন্যাস। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ম্যাক্সিম গোর্কি। এই কথাটির মূল বক্তব্য হল; সমাজে যা ঘটছে তাই একমাত্র সত্য নয় এবং যথাযথভাবে তাকে সাহিত্যে তুলে ধরাটাই সাহিত্যিকের একমাত্র কাজ নয়, সমাজের প্রতি লেখক দায়বদ্ধ থেকে সমাজের উন্নতিসাধন বা বিপ্লবের পথ দেখাতে হবে এই ধরনের উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে।

১২.৮ সামাজিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

১. সামাজিক উপন্যাসের কাহিনি সমাজ সম্পৃক্ত ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত। অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার স্বরূপ উদঘাটনই এই শ্রেণির উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

২. সামাজিক উপন্যাসে সামাজিক সমস্যা মুখ্য। ফলত এই শ্রেণির বিভিন্ন উপন্যাসে বিভিন্ন

ধরনের সামাজিক সমস্যা উঠে আসে। কোথাও পারিবারিক, কোনটিতে অর্থনৈতিক, কোথাও আবার বিবাহঘটিত সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে।

৩. এই শ্রেণির উপন্যাসে উপন্যাসকার সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতে পারে আবার নাও করতে পারে। তবে সম্পর্কে লেখকের এক স্পষ্ট ধারণা খুব সহজেই প্রকাশ পায়।

৪. লেখকের সমকালীন সমাজজীবনের চিত্র, সামাজিক সমস্যা, বিশেষ ও বাস্তব প্রেক্ষিতে বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংকট ইত্যাদি সামাজিক উপন্যাসে রূপায়িত হয়।

৫. সামাজিক উপন্যাসে লেখক এক বিশেষ এলাকার সমাজকে তুলে ধরতে সমর্থ হন। এইখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের সঙ্গে সামাজিক উপন্যাসের পার্থক্য।

৬. সামাজিক উপন্যাসে উপন্যাসকার তাঁর বক্তব্য উপন্যাসের কোনও না কোনও চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

৭. এই শ্রেণির উপন্যাসের চরিত্রগুলি মূলত টাইপ চরিত্র। এক একটি চরিত্র যেন এক একটি সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে।

৮. সমাজ সম্পর্কে উপন্যাসকারের সুগভীর অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক চরিত্রগুলির মানসলোকে পৌঁছানোর চেষ্টা এই শ্রেণির উপন্যাসে দেখা যায়।

৯. এই শ্রেণির উপন্যাসের শেষে প্রচ্ছন্নভাবে একটা দিক নির্দেশ থাকে। যা উপন্যাসে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা।

১২.৯ দৃষ্টান্ত

কয়েকটি বিদেশি সামাজিক উপন্যাস হল; চার্লস কিংসলের 'Sweat shops', 'yeast', স্টেনবিকলের– 'Grapes of wrath', ডিকেন্সের 'Hard Times' প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাসের দাবি রাখে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস'। এছাড়াও বাংলা ভাষার কয়েকটি বিখ্যাত সামাজিক উপন্যাস হল; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি', 'যোগাযোগ'; রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার'; শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ', 'গৃহদাহ'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলি' অসংখ্য অসংখ্য বাংলা সামাজিক উপন্যাস রয়েছে।

১২.১০ একটি বাংলা সামাজিক উপন্যাস পর্যালোচনা

সামাজিক উপন্যাসের প্রকৃতি এবং স্বরূপ সার্বিকভাবে বোঝার জন্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস 'পল্লীসমাজ'কে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করব। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটি ১৯১৬ সালে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশ শতকের সূচনা পর্বের বা সেই সময়ের পল্লিজীবনের নিখুঁত বাস্তবচিত্র আঁকতে চেয়েছেন। শহর গ্রামকে দেখে দূরত্বে থেকে। ফলত গ্রাম সম্পর্কে তাদের অর্থাৎ শহরের লোকেদের ধারণা কতখানি ভ্রান্ত তা লেখক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। গ্রামজীবনের সারল্যের পাশাপাশি এক ভয়ংকর রূপ রয়েছে তা দূর থেকে বোঝা অসম্ভব। গ্রামকে আমরা যতটা সহজ-সরল বলে মনে করি তা নিছকই ভ্রান্ত-ধারণা। গ্রাম শুনলেই আমাদের কল্পনায় সুন্দর ছবি এঁকে যায়, তবে গ্রাম শুধু ভালো নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে কপটতা, কদাচার, মিথ্যাচার ও স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা যা লেখক দেখিয়েছেন 'পল্লীসমাজ'-এর পাতায় পাতায়। তেমনই উপন্যাসের এক গভীর ভয়ংকর চিত্র হল ব্রাহ্মণ শাষিত সমাজ ব্যবস্থার এক অধঃপতিত নোংরা দিক। যে দিকটিকে লেখক উপন্যাসে উন্মোচন করেছেন নগ্নতা স্বরূপ। সাধারণত এই উপন্যাসে লেখক সমাজের বিশেষ তিনটি দিকের প্রতি নজর দিয়েছেন, যা একটি সমাজের সামাজিক স্বরূপ উন্মোচন করে। যথা, বিশ শতকের গ্রামজীবনের চিত্র, সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের চিত্র ও সমাজ অনুমোদিত একটি সরল নিষ্পাপ প্রেমের চিত্র। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রমা ও রমেশের এই পবিত্র প্রেম পল্লির সমাজ ব্যবস্থার চাপে পড়ে কীভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল, কীভাবে নতুন জীবনের স্রোত স্তম্ভিত হয়ে গেল তা লেখক নগ্নতা স্বরূপ দেখালেন, শুধু দেখালেনই না, সমাজের ভগ্নদশাকে সমাজের সামনে তুলে ধরলেন। রমা ও রমেশের প্রেমকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি বলয় গড়ে উঠলেও লেখকের মূল লক্ষ ছিল পল্লিজীবনের সমগ্ররূপ ফুটিয়ে তোলা। আর সে যাত্রায় লেখক সফল ভাবে তা চিত্রিত করেছেন। সমালোচক পরিমল গোস্বামীর মতে; ''এই চরিত্রগুলি শুধু কুঁয়াপুরের নয়, সকল পল্লীসমাজের পটভূমিতেই সত্য। বেণী ঘোষাল, মাসি, ভৈরব আচার্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস, আকবর প্রভৃতি মানুষকে সকল গ্রামেই দেখা যাবে।''

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হয়েছে কুঁয়াপুর নামক একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। সেই গ্রামের একদিকে যেমন রয়েছে বেণী ঘোষালের মতো সামন্ততান্ত্রিক জমিদার অন্যদিকে আবার রমেশের মতো প্রজাবৎসল ন্যায়পরায়ণ জমিদার। আর এই দুই শ্রেণির মধ্যে থেকে পিষ্ট হতে হয়েছে রমাকে। এই দুই শ্রেণির মধ্যে একদিকে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির শোষণ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় অর্থাৎ বেণী ঘোষালদের মতো মানুষেরা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে মুসলিমদের নিজস্ব ধ্যান ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকা। আসলে শরৎচন্দ্র সে শোষণের ইতিবৃত্ত জানতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রেণিদের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব ভালো ভাবে বুঝতেন, চিনতেন তাই তিনি মুসলমানদের প্রতি হিন্দু ব্রাহ্মণ জমিদারদের অত্যাচারের বলিষ্ঠ ছবি আঁকতে পিছপা হননি। রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণির মানুষ অর্থাৎ ধর্মদাস, গোবিন্দ গাঙ্গুলীদের আচরণ তাদের মনুষ্যত্বহীনতা প্রমাণ করে, তেমনই সামান্য মাছ নিয়ে শ্রাদ্ধে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় বা রমেশকে বিনা দোষে জেলে পাঠানো, আবার সামান্য চালতা গাছ নিয়ে যে বিবাদ দুই পরিবারের মধ্যে, সেই বিবাদ থেকেই ধ্বংস-নিঃস্ব হয়ে যাওয়া সবই পল্লিজীবনের এক নিষ্ঠুর বাস্তবচিত্র। তবে লেখক এই নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি এক বিবেকসর্বস্ব ও হৃদয়বান মানুষের চিত্রও এঁকেছেন, বিশ্বেশ্বরীর মতো মানুষ তার প্রমাণ। তিনি এই ভগ্নপ্রায় সমাজকে খুব ভালো ভাবে জানতেন, চিনতেন। তাই পল্লির এই নোংরা জীবনের ইতিবৃত্তকে রমেশের কাছে তুলে ধরেছেন এইভাবে; ''শুধু আলো

জ্বেলে দেরে, শুধু আলো জ্বেলে দে। গ্রামে গ্রামে লোকে অন্ধকারে কানা হয়ে গেল। একবার শুধু চোখ মেলে দেখবার শুধু উপায়টা করে দে বাবা।'' আলো জ্বালানোর যে চেষ্টা তা রমেশের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। সমাজের নানা ধরনের আঘাতে আঘাতে সেও যেন অনুধাবন করতে শিখে যায় যে, পল্লির আসল চিত্র কী এবং পল্লিজীবনের প্রকৃত সমস্যা কোথায়। রমেশ চেষ্টা করেছিল সমাধানের পথ আবিষ্কার করার, করেও ছিল। তবে সমাজের নিষ্ঠুরতার কারণে আবার কখনও সে ব্যর্থ হয়ে পালাতেও চেয়েছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বরী বিশ্বাস করতেন এবং তিনি জানেন এবং জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, রমেশের মতো সন্তানরা যদি এই সমাজে না থাকে তাহলে পল্লির বাস্তব-রূঢ়-নিষ্ঠুর সমাজচিত্র পাল্টাবে না। তাই উপন্যাসের শেষে দেখা যায় উপন্যাসকার শেষ পর্যন্ত রমেশকে গ্রামেই রেখে দিয়েছেন। রমেশ গ্রাম ছেড়ে কোথাও যায়নি। গ্রামের প্রয়োজনেই রমেশ গ্রামে থেকে যায়। অর্থাৎ পরিশেষে বলা যায় সামাজিক উপন্যাসের যে দাবি তা 'পল্লীসমাজ'-এ ভীষণভাবে চিত্রিত হয়েছে।

১২.১১ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থক রচয়িতা কে?

২. দুটি বিদেশি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম বলো।

৩. দুটি বাংলা ভাষায় লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম বলো?

৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস কী?

৫. বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম সামাজিক উপন্যাসের নাম কী?

৬. সামাজিক উপন্যাসের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. ঐতিহাসিক উপন্যাসের বস্তুগত ধারণা দিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে লেখো।

২. ঐতিহাসিক উপন্যাস কাকে বলে? একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়সংক্ষেপ আলোচনা করো।

৩. সামাজিক উপন্যাসের তাত্ত্বিক আলোচনা করে এই শ্রেণির উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

৪. সামাজিক উপন্যাস কী? একটি সামাজিক উপন্যাস আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

১২.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. সাহিত্য প্রকরণ– হীরেন চট্টোপাধ্যায়

২. সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ– কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

৩. সাহিত্যের রূপভেদ: রূপরীতি নির্ণয়– সুধাংশুশেখর মণ্ডল

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত– অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. উনিশ শতক– অলোক রায়

৬. বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস– বিজিতকুমার দত্ত

৭. বাংলা সামাজিক উপন্যাসের দুই স্থপতি– জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

৮. প্রবন্ধ সঞ্চয়ন- সম্পাদনা– সমরেশ মজুমদার, সত্যবতী গিরি- রত্নাবলী প্রকাশনী

৯. Paul Merchant- The Epic

১০. R. A. Scott-James- The making of Literature

১১. J.A. Cuddon- A Dictionary of Literary Terms

Note

একক ১৩ ❑ আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ আঞ্চলিক উপন্যাস: সংজ্ঞা

১৩.৪ আঞ্চলিকের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

১৩.৫ দৃষ্টান্ত

১৩.৬ একটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস পর্যালোচনা

১৩.৭ রাজনৈতিক উপন্যাস: সংজ্ঞা

১৩.৮ রাজনৈতিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

১৩.৯ দৃষ্টান্ত

১৩.১০ একটি বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস পর্যালোচনা

১৩.১১ প্রশ্নাবলী

১৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ উদ্দেশ্য

যখন কোনও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ অঞ্চলের পরিচয় করিয়ে এক সর্বজনীন অঞ্চলে পৌঁছানো যায় তখন সেই বিশেষ সর্বজনীন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে উপন্যাস তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা হয়। আলোচ্য এই এককের উদ্দেশ্যই হল ছাত্র-ছাত্রীদের আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে অবগত করা। এছাড়াও এই এককের আরেকটি উদ্দেশ্য হল উপন্যাস কীভাবে রাজনৈতিক হয়ে ওঠে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

১৩.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্র-ছাত্রীদের যে বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে তা প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা যেতে পারে-

১. আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বরূপ অনুশীলন করার পর ছাত্র-ছাত্রীদের এই শ্রেণির উপন্যাসের বিশেষত্ব মজ্জাগত হবে।

২. প্রতিনিয়ত রাজনীতি কীভাবে মানুষের চারপাশের সমাজকে বদলে দেয় ও সমাজের শক্তিকেন্দ্রগুলির চরিত্রে পরিবর্তন সাধন করে তা গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাস যেহেতু এক অর্থে সমাজের প্রতিফলন সেহেতু এই রাজনীতির পাকচক্রে আবর্তিত হয় উপন্যাসের কাহিনি। এই এককে সমাজ ও রাজনীতি কীভাবে উপন্যাসের গঠন ও বিষয়বস্তুকে নির্মাণ করে বিশেষ চরিত্র দেয় তা বুঝে নেওয়া যাবে।

১৩.৩ আঞ্চলিক উপন্যাসঃ সংজ্ঞা

টমাস হার্ডির 'ওয়েসেক্স নভেলস' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে উপন্যাসে নতুন এক শ্রেণির উপন্যাস অর্থাৎ আঞ্চলিক উপন্যাস বা Regional Novel স্বীকৃতি পেয়েছে। উপন্যাসের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি শাখা হল আঞ্চলিক উপন্যাস। সীমিত কথায় বললে বোঝায় যে শাখায় বিশেষ একটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় ও উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রগুলি সেই অঞ্চল থেকে উঠে আসে এবং সেই সঙ্গে আঞ্চলিক সকল বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র সেই উপন্যাসের চালক হয়, এই ধরণের উপন্যাসকে সাধারনত আঞ্চলিক উপন্যাস হলা যেতে পারে। আব্রাহাম এই শ্রেণির উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন– "The regional novel emphasizes the setting, speech and customs of a particular locality, not merely as local color, but as important conditions sffecting the temperment of characters, and their ways of thinking, feeling and acting." বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্র ও লক্ষণগুলি চিহ্নিত করে বলেছেন– "এই জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হইল অপরিচয়ের রহস্যমন্ডিত, সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোন অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস, সংস্কারের ব্যাপক চিত্রাঙ্কন, অথবা কোন বিশেষ ধরণের বৃত্তিজীবী-গোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনবোধের পরিস্ফুটন।" অর্থাৎ যদি কোনও উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পায় তাহলে সেই উপন্যাসে থাকতে হবে বিশেষ কোনও অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, সেই অঞ্চলের রীতিনীতি প্রকাশ পেয়েছে কিনা এবং সেই সঙ্গে বিশেষভাবে দেখতে হবে সেই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি অঞ্চল সম্পৃক্ত হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা।

১৩.৪ আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

১. আঞ্চলিক উপন্যাস বিশেষ একটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পটভূমির স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ভূখণ্ডকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করে। অর্থাৎ বিশেষ অঞ্চলের মানব জীবনাশ্রয়ী বিশিষ্ট স্বাদের উপন্যাস।

২. সেই ভূখণ্ডে অবস্থিত সেই অঞ্চলের একটি সম্প্রদায় বা জনজীবন সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে আঞ্চলিক উপন্যাসে।

৩. এই শ্রেণির উপন্যাসে বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনচর্চা, ধর্মবিশ্বাস, বিভিন্ন সংস্কার ও ঐতিহ্য প্রকাশিত হয়।

৪. আঞ্চলিক উপন্যাসে বিশিষ্ট ভূমি সংস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৃত্তিকা– উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

৫. এর ফলে সেই অঞ্চলের মানুষের দৈহিক গঠন, ভাষার উচ্চারণ, কথা বলার ভঙ্গি, জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি আঞ্চলিক উপন্যাসের বাহন হয়ে যায়।

৬. লেখক আঞ্চলিক জীবনের প্রতিচ্ছবি তাঁর উপন্যাসে খুব সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত করার জন্য নিজেকে নির্লিপ্ত রাখেন।

৭. এই শ্রেণির উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উপন্যাসকার একটি গভীর জীবনবোধ ও জীবন জিজ্ঞাসা পাঠকের মনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

৮. আঞ্চলিক উপন্যাসে বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিকতার সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন অঞ্চলের পাঠকের মন ভীষণভাবে রসাশ্রিত হয় এবং বিশ্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করে।

১৩.৫ দৃষ্টান্ত

ইংরেজি সাহিত্যের কয়েকটি আঞ্চলিক উপন্যাস হল– এমিলি ব্রন্টির 'Wuthering heights' এবং টমাস হার্ডির 'The Return of the Native' প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাসকার হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর একাধিক উপন্যাসে সার্থক আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা– 'হাসুলীবাঁকের উপকথা', 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা' প্রভৃতি। এছাড়াও শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠির দেশ', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম', সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াইচরিত মানস', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' প্রভৃতি আঞ্চলিক উপন্যাস।

১৩.৬ একটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস পর্যালোচনা

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় এই উপন্যাসটি প্রকাশিত। অবশ্য ওই বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুন অক্টোবর মাসে পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি, হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। ১৩৫৪ সনে বেঙ্গল পাবলিশার্স গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি বের করে। এটি উৎসর্গ করা হয়েছিল কবিশেখর কালিদাস রায়কে।

বীরভূমের একটি বিশেষ অঞ্চলকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হাঁসুলী বাকের উপকথা' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন এবং সেই অঞ্চলটির ভৌগলিক বিবরণ দিয়েছেন–"কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক– অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড়

ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গহনার মতো। ... নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াইশো জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাঁদি, লাট জাঙলের অন্তর্গত। বাঁশবাদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাঁদি ছোটোগ্রাম: দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারদের বসতি। জাঙল গ্রামে ভদ্রলোকের সমাজ– কুমার-সদ্‌গোপ, চাষী-সদ্‌গোপ এবং গন্ধবণিকের বাস, এ ছাড়া নাপিতকুলও আছে এক ঘর, এবং তন্তুবায় দু-ঘর। জাঙলের সীমানা বড়; হাঁসিল জমিই প্রায় তিন হাজার বিঘা, পতিতও অনেক নীলকুঠির সাহেবদের সাহেবডাঙার পতিতই তিন শো বিঘা।''

সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের সর্বপ্রধান শর্ত হল– একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের বিশ্বস্ত চিত্র। অর্থাৎ আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রাথমিক শর্ত ভৌগোলিক সীমা সংহতি। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক এই শর্তটি বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। যে বীরভূম জেলার কোপাই নদীর তীরবর্তী 'বাঁশবাদি' গ্রামের জীবনচিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে তার ভৌগোলিক রূপ দিতে গিয়ে 'হাঁসুলী বাঁক' নামটির উৎপত্তি। মূলত কৃষিজীবী কাহারদের জীবনের সঙ্গে জড়িত মাটি, ধান চাষের মাঠ, নীলকুঠি, রেলস্টেশন, 'চন্দনপুর' গাঁয়ের রেল লাইনটি কোপাই নদীর বিজ্রের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এইসব বর্ণনা হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটির একটি ভৌগোলিক পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। ম্যাপে যেমন আমরা রেখাচিত্র পাই, উপন্যাসের বর্ণনাও তেমনি একটি রেখাচিত্র গড়ে নিয়ে অঞ্চলটিকে নির্দিষ্টভাবে চিনে নিতে সাহায্য করে। হাঁসুলীর বাঁকে কোপাই নদীর তীরে কাহারদের যে জনজীবন গড়ে উঠেছে লেখক তাদের কতকগুলি সংস্কার ও বিশ্বাসের কথা বলেছেন, যা ছিল আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা দেখি সবকিছুর ওপর একটি দৈবশক্তির প্রভাব কল্পনা করে নেওয়া এদের অভ্যাস।

আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম দিক আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ। এই উপন্যাসের ভাষায় লেখক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলে অনায়াসে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি তাদের মুখের অকৃত্রিম ভাষার গুণেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই লেখাপড়া না জানা মানুষগুলির শব্দোচ্চারণে কিছু বিশিষ্টতা আছে। এরা 'ন' বলে 'ল', 'ল' কে বলে 'ন', 'র'কে বলে 'অ'। যেমন- 'লতুন', 'নেকন', 'অং', 'আম'। ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন- ''শব্দের প্রথমে 'র' থাকলে সেখানে ওরা 'র'-কে 'অ' করে দেয়।''

চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন– ''বস্তু বা মানুষের আকৃতি বা প্রকৃতিকে লক্ষ করে নিজেদের ভাষাজ্ঞান অনুযায়ী বেশ সুসমঞ্জাস নামকরণ করে।'' উপন্যাসে পাকু মন্ডলের আসল নাম পাকু নয়। এটি লোকের দেওয়া নাম। সে অতি বিচক্ষণ লোক। তার হিসাবের পাক অত্যন্ত জটিল-খুলতে গেলে জট পাকায়। রতনের মনিবের স্থূল চেহারার জন্য নাম হয়েছে হেদো মন্ডল। নসুবালার নামটিও হয়েছে তা মেয়েলি স্বভাবের জন্য। গন্ডারের মতো চেহারা বলে গন্ডার কাহার। পানুর বাড়ির উঠানে এক প্রকাণ্ড নিমগাছ, সেই কারণে তার নাম নিমতেলে পানু।

সর্বোপরি বলা যায় একটি উপন্যাস তখনই আঞ্চলিক উপন্যাস হয় যখন সেই উপন্যাসের বিষয় আঞ্চলিক, ভাষা, চরিত্র, ভৌগোলিক বর্ণনা ইত্যাদি সুনিপুণভাবে লেখক উপস্থাপন করতে পারেন।

আলোচ্য 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর সেই গভীরতায় পৌঁছাতে পেরেছেন এবং আঞ্চলিক উপন্যাসকে সর্বজনীন করে তুলেছেন।

১৩.৭ রাজনৈতিক উপন্যাস কাকে বলে

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সেই দর্পনে প্রতিনিয়ত মুখ দেখে রাজনীতি। আসলে প্রতিটি শিল্প বা সাহিত্যকর্মই এক অর্থে রাজনীতির ভাষ্য রচনা করে। কারণ যে-কোনো যুগ বা সময়ের মানুষ, তাদের সামাজিক জীবন নিয়ে লিখতে গেলে, বিশেষত উপন্যাসে, বৃহত্তর অর্থে রাজনীতিকে বর্জন করা অসম্ভব। তবে সব উপন্যাসকেই রাজনৈতিক উপন্যাসে আখ্যা দেওয়া যায় না। এই শ্রেণির উপন্যাস বলতে বুঝব, যখন উপন্যাসকার কোনও বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা ও কাহিনিকে অবলম্বন করে উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করেন এবং সেখানে একটি দেশ ও জাতির, স্থান ও কালের সামাজিক অর্থনৈতিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা, তার দ্বন্দ্ব সমস্যা সংকট ইত্যাদি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই সার্বিক মূল্যায়নকেই রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যে যুগে মানুষের সংকট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যত বেশি তীব্র হবে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা যত বাড়বে, সেই যুগেই সব থেকে বেশি রাজনৈতিক উপন্যাস নির্মাণ হবে এবং রাজনৈতিক উপন্যাস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে J. L. Blotner বলেছেন– "As an art form and an analytical instrument, the political novel, now as ever before, offers the reader a means for understanding important aspects of the complex society in which he lives, as well as a record of how it evolved."

রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার সময় লেখককে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে–

১. উপন্যাসকার সতর্ক হবেন যেন তাঁর উপন্যাসটি উগ্রপ্রচারে পর্যবসিত না হয়। সুতরাং লেখককে কোনও রাজনৈতিক তত্ত্ব বা মতাদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে দূরে থাকা জরুরি।

২. একজন সচেতন লেখক যেমন সামাজিক সমস্যা ও সমাজ বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারেন না, ঠিক তেমনভাবেই লেখককে উপন্যাসের শিল্পরূপের ক্ষেত্রেও সজাগ থাকতে হবে।

৩. বস্তুগত সত্যকে উপন্যাসে সাক্ষী রেখে উপন্যাসকারকে সামগ্রিক সত্যের সন্ধান করতে হবে।

১৩.৮ রাজনৈতিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

১. সমসাময়িক যে কোনও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এই শ্রেণির উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

২. রাজনৈতিক উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে রাজনীতির গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে উঠে আসে।

৩. এই শ্রেণির উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চালিকা শক্তি হবে রাজনীতি। উপন্যাসের আনাচে-কানাচেতে রাজনৈতিক বাতাবরণ থাকে।

৪. রাজনৈতিক আদর্শ এই শ্রেণির উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। লেখক তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচ্ছন্নভাবে কোনও না কোনও চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন।

৫. রাজনৈতিক উপন্যাসে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন হয় এবং আবেগ প্রবণতার গাঢ়ত্ব লক্ষ করা যায়।

৬. এই শ্রেণির উপন্যাসে লেখক ভাবের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভাষার দুর্বার জোয়ারে মোহাবিষ্ট করে ফেলেন পাঠককে।

৭. রাজনৈতিক উপন্যাস মূলত পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ। এই মতানৈক্য সংঘর্ষই নতুন রাষ্ট্রিক তথা সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায়।

১৩.৯ রাজনৈতিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত

কয়েকটি বিদেশি রাজনৈতিক উপন্যাস হল; Jonathan Coe- এর 'What a Carve Up', George Eliot- এর 'Middlemarch', Anthony Trollope- এর 'The Way We Live Now' প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি রাজনৈতিক উপন্যাস হল– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী', সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী', গোপাল হালদারের 'একদা', সমরেশ বসু 'বি. টি. রোডের ধারে', মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' প্রভৃতি।

১৩.১০ একটি বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস পর্যালোচনা

সতীনাথ ভাদুড়ী রচিত 'জাগরী' উপন্যাসটি বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ১৯৪৫ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের কাহিনিপট অসহযোগ আন্দোলন থেকে ১৯৪০-এর দশকের ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নির্মিত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ বাঙালি জনগণের সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরে এই উপন্যাস। ব্যক্তিগত জীবনে সতীনাথ ভাদুড়ী ১৯৪২-৪৪ সালে রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে ভাগলপুর জেলে আটক ছিলেন। সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতি এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি এই উপন্যাসের কাহিনিতে বহু আত্মজৈবনিক উপাদান যোগ করেছেন এবং সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক মোড়কে আবদ্ধ।

রাজনীতি ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের কাহিনিই এই উপন্যাস, যার সঙ্গে তুলনায় আসে ফকনারের 'দি সাউন্ড অ্যান্ড দি ফিউরি'। 'জাগরী' উপন্যাসের সময়কাল ১৯২০-২১-এর অসহযোগ আন্দোলন থেকে ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। উপন্যাসের মূল কাহিনি এরকম- একই পরিবারের তিনজন মানুষ তিনটি রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। বাবা স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা ছেড়ে গান্ধিবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বিলু কংগ্রেস সোসালিস্ট দলের নেতা। নীলু কমিউনিস্ট। আর

এই তিন স্তরের জোড় হিসাবে থাকে মা। রাজনীতি এই পরিবারকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত শিক্ষিত রাজনৈতিক বন্দি বিলু কিছু করে না যেতে পারার, কুকুর-বিড়ালের মতো মৃত্যুবরণ করার ক্ষোভে পীড়িত হয়, দেশের জন্য সংগ্রাম করে অর্জিত শহিদত্বের প্রতি তার কোনও আসক্তি নেই। বিলু-নীলুর শৈশব-বাল্যের সম্পর্ক বারবার এসেছে উপন্যাসে, অথচ যে বিলু কোনোদিন ভাই নীলুকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ায় তৎপর হয়নি বা সাক্ষী দিয়ে ভাইয়ের ঘাতক হয়ে ওঠেনি, নীলু অনায়াসে সেইসব কাজ করে যায়। নীলুর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই বিলুর মৃত্যুদণ্ড হয়। তখনই চূড়ান্ত প্রশ্নটি করেন মা। তিনি আর্তনাদ করে জানতে চান, তারা লড়াই করেছিল যাতে সবাই খেতে পায়, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মুছে যায়, অথচ পরিণামে দেখা যাচ্ছে বাবা-ছেলেতে ভালোবাসা থাকে না, ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে ওঠে, গৃহবিচ্ছেদে সংসার ছারখার হয়ে যায়, লড়াই তাদের সবাইকে পথের ভিখিরি করে দেয়। এভাবেই একটি পরিবারের রূপকে যেন সমগ্র ভারতবর্ষ তার ভাঙাচোরা অবয়ব নিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে, তার অখণ্ড জাতীয়তাবাদের গোঁজামিলগুলো আগাগোড়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে, স্বাধীনতার লড়াইয়ের নেতৃত্বে থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজের আত্মপরিচয়ের মুখোমুখি হয় এবং দেশ সম্পর্কে সম্মোহন কাটিয়ে সার্বিক হতাশা, অচলাবস্থা ও বিচ্ছিন্নতার বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করে।

উপন্যাসে চারজন ভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করি। উপন্যাসটি আত্মকথনে অর্থাৎ উত্তমপুরুষে লেখা। চরিত্রগুলি আত্মকথনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পারিবারিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে। রাজনীতির আবর্তে চক্রায়িত এক পরিবার– মাতা, পিতা এবং দুই পুত্র। এক পুত্রের সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আর এক পুত্র বিপ্লবী বিলুর মৃত্যুদন্ড হয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়। উপন্যাসটি শুরু হয়, বিলুর ফাঁসি কার্যকর হওয়ার আগে জেল হেফাজতে তার শেষ রাত থেকে। প্রথম অধ্যায়টি বিলুর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে, যেখানে সে নিজের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। তার সাথে সংঘটিত অমানবিক নির্যাতনের কথাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তার বাবা, মা এবং ভাইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে একই গল্প বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সকলেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় তাদের নিজস্ব চিন্তা, উদ্বেগ এবং অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করে।

'জাগরী' উপন্যাসে চারটি চরিত্রের গূঢ় মনস্তত্ত্ব নিশ্চয়ই ফুটেছে, কিন্তু এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উৎস তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত। দুই ছেলে নিয়ে বাবা-মা'র সুন্দর সংসারে ফাটল ধরার অন্য কোনও রাস্তাই ছিল না। এই ঘনিষ্ঠ সম্প্রীতির মধ্যে সংশয়, বিদ্বেষ ও অসহনীয়তার ব্যবধান সৃষ্টি করেছে রাজনীতি। সুতরাং রাজনীতিই এই উপন্যাসের নিয়ন্তা, তার কেন্দ্রীয় শক্তি, যাকে বাদ দিলে উপন্যাসটি লেখা সতীনাথ ভাদুড়ীর পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। এই কারণেই আমরা মনে করি, শ্রেণি বিচার করতে গিয়ে রাজনীতিকেই আমাদের এ-ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। অর্থাৎ 'জাগরী' উপন্যাসের চালিকা শক্তি রাজনীতি, এর ফলেই চারটি চরিত্র কারাগারে এসেছে, এর জন্যই চরিত্রগুলির জাগর বিষাদ উপন্যাসের কল্পশরীর গঠন করতে পেরেছে। সুতরাং 'জাগরী'কে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে আখ্যা দিতে কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

১৩.১১ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ রূপকার কে?

২. বিদেশি ভাষার দুটি আঞ্চলিক উপন্যাসের নাম বলো।

৩. বাংলা ভাষায় রচিত দুটি আঞ্চলিক উপন্যাসের নাম লেখো।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের নাম বলো।

৫. বাংলা ভাষায় লেখা দুটি রাজনৈতিক উপন্যাসের নাম লেখো।

৬. রাজনৈতিক উপন্যাসের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারণা দিয়ে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে লেখো।

২. আঞ্চলিক উপন্যাস কাকে বলে? একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের আঞ্চলিকতার পরিচয় দাও।

৩. রাজনৈতিক উপন্যাস আলোচনা করে এই শ্রেণির উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৪. রাজনৈতিক উপন্যাস কী? একটি রাজনৈতিক উপন্যাস আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

১৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. সাহিত্য প্রকরণ – হীরেন চট্টোপাধ্যায়

২. সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ – কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

৩. সাহিত্যের রূপভেদ: রূপরীতি নির্ণয় – সুধাংশুশেখর মণ্ডল

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত – অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. বিশ শতক – অলোক রায়

৬. সাহিত্য ও রাজনীতি: সম্পর্কের যোগসূত্র; আলী রেজা

৭. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর – সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮. বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি – নাজমা জেসমিন চৌধুরী

৯. কালের প্রতিমা – অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

১০. উপন্যাস নিয়ে – দেবেশ রায়

১১. উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে – দেবেশ রায়

১২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩. বাংলা গল্প বিচিত্রা – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৪. সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ – বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

Note

একক ১৪ ❑ চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস ও পত্রোপন্যাস

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ প্রস্তাবনা

১৪.৩ চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস: সংজ্ঞা

১৪.৪ চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

১৪.৫ দৃষ্টান্ত

১৪.৬ একটি বাংলা চেতনাপ্রবাহরীতি উপন্যাস পর্যালোচনা

১৪.৭ পত্রোপন্যাস উপন্যাস: সংজ্ঞা

১৪.৮ পত্রোপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

১৪.৯ দৃষ্টান্ত

১৪.১০ একটি বাংলা পত্রোপন্যাস পর্যালোচনা

১৪.১১ প্রশ্নাবলী

১৪.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ উদ্দেশ্য

প্রতিটি উপন্যাসই লেখকের চেতনা থেকে গড়ে ওঠে, কিন্তু সব উপন্যাসকে আমরা চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস বলি না। কারণ সব উপন্যাসে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে চরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্তায় চেতনার বিভিন্ন স্তর প্রবাহিত হয় না। একমাত্র চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে বিশেষভাবে এই প্রবাহ বইতে থাকে। এই এককের উদ্দেশ্যই হল সেই চেতনার স্বরূপ উদঘাটন। এছাড়া পত্রোপন্যাসের সার্বিক পরিচয় দেওয়াও এই এককের উদ্দেশ্য।

১৪.২ প্রস্তাবনা

সময় যত প্রবাহিত হতে থাকে জীবন অভিজ্ঞতা তত বাড়তে থাকে। এই অভিজ্ঞতায় মানুষের চেতনা জগতকে গড়ে তোলে। আবার কখনও সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় পত্রে। এই এককে আলোচিত

উপন্যাস রীতির প্রস্তাবনায় বলা যায়;

১. চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের যে সার্বিক বৈশিষ্ট্য সেখানে মানব মনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল রসায়নের রহস্য লক্ষ করা যায়।

২. পত্রোপন্যাসের সংজ্ঞা-স্বরূপ উল্লেখ করে তা উদাহরণস্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই এককে।

১৪.৩ চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস কী

'চেতনাপ্রবাহরীতি'; বাংলা এই শব্দটি ইংরেজি শব্দবন্ধ 'Stream of Consciousness' থেকে এসেছে। যার সহজ ভাষায় অর্থ করলে দাঁড়ায় জাগ্রত বা সজাগ মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তার প্রবাহ বা সচেতনতা। 'The stream of consciousness' কথাটি প্রথম শোনা যায় ১৮৪৪ সালে। দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Principles of psychology'– তে বলেন মানুষের চেতনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না, বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে কিছুই দেখা যায় না। সুতরাং তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে গেলে তাকে অবিচ্ছন্নভাবেই জানতে হবে। তিনি মানব মনের চেতনাকে নদীর প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন– "It is nothing joined, it flows. A 'river' or a 'stream' is the metaphor by which it is most naturally described. In talking of it, let us call it the stream of thought, of consciousness, of subjective life." অর্থাৎ চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের সংজ্ঞায় বলা যেতে পারে, যে উপন্যাসে চেতন, অবচেতন বা পূর্বচেতন সবটুকু মিলিয়েই ব্যক্তিচেতনার যে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তার ধারা, মানব মনের প্রচ্ছন্ন অনুভূতির যে সক্রিয় ধারাবাহিকতা, অনবদমিত আবেগ, ইচ্ছা কিংবা উপলব্ধির এক স্রোত লক্ষ করা যায় তাকেই সাধারণভাবে চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস বলা হয়। চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের পূর্বাভাস পাওয়া যায় আঠারো শতকের পাশ্চাত্য উপন্যাসকার লরেন্স স্টার্নের 'The life and Opinions of Tristram Shandy' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে লেখক উপন্যাসের প্রচলিত কাঠামো ভেঙে আঙ্গিক ও ভাষায় নতুনত্ব এনে মানব মনের গুঢ় জটিলতাকে ধরতে চেয়েছেন।

১৪.৪ চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

'The stream of thought' গ্রন্থে উইলিয়াম জেমস চেতনাপ্রবাহরীতি ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন–

১. Every thought tends to be part of a personal consciousness.

২. We never have the same thought or idea or feeling twice– that no state once gone can ever recur and be identical.

৩. There are no breaks and cracks in the stream of consciousness– it is sensible continuous.

৪. The fact that thought deals with object other than itself.

৫. The stream of consciousness, it is always choosing among them, welcoming, rejecting, accentuating, selecting.

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুধাবন ও পর্যালোচনা করে চেতনাপ্রবাহরীতি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যে বলা যায়–

১. বহির্জগত অপেক্ষা অন্তর্জগতের টানাপোড়েন ও জটিলতা বা চরিত্রের অন্তর্মুখীনতায় এই শ্রেণির উপন্যাসে প্রকাশ পায়।

২. চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে কী ঘটছে অপেক্ষা কেন ঘটছে সেই দিকে বিশেষ নজর থাকে লেখকের।

৩. এই শ্রেণির উপন্যাসে বিশেষ কোনও প্লট থাকে না, কিন্তু চরিত্রগুলি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাসে মুখ্য হয়ে ওঠে।

৪. চেতনা পরিবেশের বস্তুবিশেষের ওপর নিজেকে নিবিষ্ট করে অপরাপর সকল বস্তুকে বর্জন করে। মনের আগ্রহই নির্ধারণ করে দেয় চেতনার এই নিবিষ্টতা ।

৫. মানব মনের বহুবিচিত্র ও অসংখ্য চিন্তা ও অনুভব, চরিত্রের যে অন্তর্লোক লোকচক্ষুর অন্তরালে তাকে গোচরীভূত করতে লেখক গ্রহণ করেন-স্বগোতক্তি বা 'Interior monologue' এর কৌশল।

১৪.৫ দৃষ্টান্ত

পাশ্চাত্য সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতির প্রথম সচেতন শিল্পী হেনরি জেমস। তাঁর গ্রন্থটি হল– 'The Young Generation'. এরপর মার্সেল প্রুস্তের ফরাসি ভাষায় রচিত 'A la Recherche Du Temps Perdu', ডরোথি রিচার্ডসনের 'Pointed Roofs' (Pilgrimage উপন্যাসের প্রথম খণ্ড) প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় চেতনাপ্রবাহরীতির উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল– বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ে 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহনা', গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সৃষ্টি', বিমল করের 'অপরাহ্ন', সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' প্রভৃতি।

১৪.৬ একটি চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস পর্যালোচনা

বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতি শব্দটি শুনলেই যে উপন্যাসটির কথা মাথায় আসে সেটি হল 'অন্তঃশীলা'। উপন্যাসটির লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে শুধু এক বুদ্ধিজীবী নায়কের জীবনের স্তরগুলি ধাপে ধাপে বর্ণনা করাই উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য নয়, জীবনকে স্বীকার করে মানুষ কীভাবে পূর্ণতার পথে, পরিণতির দিকে নিজেকে বিকশিত করতে পারে তার একটি রূপলেখা ফুটিয়ে তোলাও উপন্যাসকারের ঈপ্সিত লক্ষ্য। 'অন্তঃশীলা'–

উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই উপন্যাসকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মানুষের অন্তর্গত স্বভাব বৈশিষ্ট্যে চেতনারই অন্য নাম বোধহয় 'অন্তঃশীলা'। আসলে 'অন্তঃশীলা' সচেতন ও জাগরিত মানুষের অন্তচেতনার ইতিহাস। তাই উপন্যাস পড়তে পড়তে চরিত্রের অন্তর্জগতের সঙ্গে পাঠকও যেন মিশে যায় গভীর অন্তরঙ্গতায়। আর ঠিক একারণেই অন্তঃশীলা যেন উপন্যাসের চৌহদ্দির মধ্যে হারিয়ে যায় না, পাঠকের বোধ ও বুদ্ধির কেন্দ্রটিকে ক্রমাগত সজাগ ও সতর্ক রাখতে বাধ্য করে।

'অন্তঃশীলা'য় চরিত্রের সমাবেশ যেমন চোখে পড়ার মতন নয়, তেমনই ঘনঘটায় উপন্যাস ভারাক্রান্ত নয়। তাই উপন্যাসের প্রধান নায়ক খগেন্দ্রনাথ রায় ওরফে খগেনবাবুর জীবনে ঘটে যাওয়া একটিমাত্র ঘটনাকে (সাবিত্রীর আত্মনিধন) কেন্দ্র করে উপন্যাসের গতি কীভাবে প্রচলিত ফর্ম অস্বীকার করে নতুন ফর্ম বা আঙ্গিকের কুশলতায় অগ্রসর হয়েছে, তা দেখানোর মহৎ প্রয়াসের মধ্যে উপন্যাসকারের আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট।

উপন্যাসের নায়ক তাঁর স্ত্রী 'সাবিত্রীর আত্মহননে'র মতো মর্মদাহী স্মৃতিকে চিন্তার শিকড়ে বেঁধে রেখেছে। ফলে চিন্তার স্রোতে ভাসতে ভাসতে এলোমেলো ভাঙাচোরা স্মৃতি তার চেতনা উন্মুক্ত জগতে ধাক্কা খায়, স্মৃতির কঙ্কাল থেকে ভালো-মন্দে মেশানো সাবিত্রী ও তার অনুষঙ্গ-বাহিত আরও কিছু চরিত্রের ছবি ঠিকরে বেরোয়; ''সাবিত্রী দেবী, খগেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী ক্ষণিক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করেছেন।''

উপন্যাস বর্ণনার গুণে, মাপা কথার সুচারু প্রয়োগে পরিবেশের যথাযথ রূপ কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে ধূর্জটিপ্রসাদ যেন নিপুণ শিল্পীর মতো তারই একটি স্কেচ তৈরি করলেন 'অন্তঃশীলা'য়। বুদ্ধিবাদের আদর্শে বিশ্বাসী নায়কের বিশ্বাসের আবরণ সেদিন থেকে অপহৃত হতে শুরু করল, যেদিন 'সাবিত্রীর মৃত্যু' তাঁর রুদ্ধ মনের দরজায় ঘা দিয়ে জানিয়ে দিল– ''... আজ একটি স্মারকলিপি ধুয়ে মুছে গেল। রইল বাকি নিজের অসম্পূর্ণতা আর আফসোস, বনাম ঘৃণার জের, সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা।''

খগেনবাবুর চিন্তাস্রোত আসলে কিন্তু তার বিবেকের জবানবন্দী। বহমান জীবনের গতানুগতিকতায় যা কিছু স্বাভাবিক, সহজ ও যথাযথ বলে মনে হয়, আকস্মিক কোনও ঝটকায় তার স্বাভাবিকত্ব সম্পর্কে মানুষের সংশয় জাগে, চিত্তবিক্ষোভ হয়। খগেনবাবুও এর ব্যতিক্রম নয়। কারণ যত বড় বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদই তিনি হোক না কেন, আসলে তিনিও একজন ছদ্ম ভাবপ্রবণ মানুষ।

সাবিত্রীকে সৃষ্টি করতে চেয়ে এবং নিজের সত্তার প্রতিরূপ হিসাবে ভাবতে শুরু করায়, সাবিত্রীর হৃদয় ধর্মকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি নায়ক খগেনবাবু। অন্যদিকে সাবিত্রীও মানসিক পরিসর এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে খগেনবাবুর মনোধর্মের উপযোগী করে তুলতে পারেনি নিজেকে। ফলে দুই মেরুর দুই বাসিন্দার মানসিক বৃত্তির অতলান্ত ব্যবধান তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে ভাঙন ধরার পক্ষে পর্যাপ্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। যদিও এই ভাঙনের জন্য নায়ক এবং সাবিত্রীই একমাত্র দায়ী নয়, সাবিত্রীর বান্ধবী রমলার অবদানও কোনও অংশেই কম নয়। আসলে সাবিত্রী মানসিক দিক থেকে যেমন ছিলেন কাঁচা ও অপরিণত, তেমনই শিক্ষার অপর্যাপ্ততা তার মধ্যে সংকীর্ণ ঈর্ষার জন্ম দিয়েছিল।

রমলার আকর্ষণী শক্তি খগেনবাবুর অন্তরীণ চেতনার জগতে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করেছিল বলেই সাবিত্রী বিযুক্ত ঘটনামুখর বাস্তব তাকে দুনির্বার সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যেখান থেকে দাঁড়িয়ে সে আবিষ্কার করতে চাইছে জীবনের মূল সত্যকে। মানুষ হিসাবে তার অসম্পূর্ণতাকে তাৎপর্যময় করে তুলে তাকে সম্পূর্ণতার পথে পরীক্ষিত হবার জন্যই 'সাবিত্রীর আত্মনিধনে'র ঘটনাটিকে পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে দেওয়ায় ছিল উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য। তাই জীবনান্বেষণের প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে নায়কের অন্তর্জগতের বিপ্লবকে বহির্জগতে রূপায়িত করার যে টেকনিকটি উপন্যাসকার অবলম্বন করেছেন তা এককথায় অভিনব। এই কৌশলের মধ্যে মার্সেল প্রুস্ত বা জেমস জয়েসের প্রভাব থাকলেও উপস্থাপন ভঙ্গি উপন্যাসকারের একান্ত নিজস্ব।

সাবিত্রীর মৃত্যুর পর রমলা সম্পর্কে খগেনবাবুর প্রাক্তন ধারণা ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে এবং রমলার আন্তরিক সৌহার্দ্য ও স্নেহশীল ব্যবহারের সংস্পর্শে বুদ্ধির শাণিত জগৎ ভেদ করে খগেনবাবুর চিত্তজগতে যে মৃদু আলোড়ন সঞ্চারিত হচ্ছে, তার ফলে সাবিত্রী এবং রমলার দুস্তর ফারাক তার চিন্তায় বড়ো হয়ে ধরা পড়ছে। রমলাকে জানাল– ''আমার জগৎ কোথায় জানেন? এই মস্তিষ্কের মধ্যে। আমার বাইরে কি আছে জানি না, তার একটা মোটা নাম দিয়েছি– সাধারণ মানুষ, জনগণ। ভিড়ের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ পেতেই হবে।''

আলোচ্য উপন্যাসে নায়কের চেতনার আত্মোপলব্ধি 'অন্তঃশীলা'র সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি। ভাষার বলিষ্ঠতায় এবং প্রতিভার দীপ্তিতে পাঠক যখন মোহাবিষ্টের মতন ভালোলাগার অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে ওঠে, চেতনার গভীরে ঘাত-প্রতিঘাত করে।

১৪.৭ পত্রোপন্যাস কাকে বলে

পত্রোপন্যাস বা Epistolary Novels-কে উপন্যাসের বিশেষ একটি রীতিতে আখ্যায়িত না করে বরং উপন্যাস উপস্থাপন করার মাধ্যম বললেই বেশি যথোপযুক্ত হবে। কারণ পত্রোপন্যাসকে সাধারণত পত্রের জন্যই এমন নাম দেওয়া হয়েছে। এর কোনও তাত্ত্বিক আলোচনা বা ভিত্তি নেই। তবে এই সমস্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে গিয়ে পত্রোপন্যাসের সংজ্ঞায় বলা যায়– উপন্যাসকার যখন পত্রাকারে তাঁর উপন্যাসের বিষয় ও সেই বিষয়কে নানা ঘটনার মাধ্যমে পরিবেশিত করেন এবং উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র যখন পত্রলিখনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয় ও আখ্যানভাগের বিস্তার ঘটে চরিত্রের লিখিত পত্রের মাধ্যমে, তখন সেই উপন্যাসকে বলা হয় পত্রোপন্যাস। এই শ্রেণির উপন্যাসে দেখা যায় উপস্থাপিত চরিত্রেরা পত্রের মাধ্যমে তাদের জীবনবীক্ষা বা মুহূর্তের ভালোলাগা-মন্দলাগা, আবেগ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার জাল বোনে। যার ফলে পাঠক সেই সমস্ত চরিত্রের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার কথা আপন জীবনের সঙ্গে অনুভব করতে পারে। অর্থাৎ উপন্যাসের চরিত্রের যাবতীয় চিন্তা ও অনুভবের সঙ্গে পাঠকের সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। এই শ্রেণির উপন্যাস ইংরেজি ভাষায় প্রথম দেখি স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'পামেলা' (Pamela)। অর্থাৎ বলা যায় স্যামুয়েল রিচার্ডসনই পত্রোপন্যাস-এর স্রষ্টা। তাঁর একাধিক পত্রোপন্যাস

রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের উপন্যাস প্রথম পাই নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়। তাঁর রচিত পত্রোপন্যাসটি হল; 'বসন্তকুমারের পত্র'।

১৪.৮ পত্রোপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

১. পত্রোপন্যাস সাধারণত প্রথম পুরুষেই লেখা হয়। তবে তা ব্যক্তিগত সীমাকে অতিক্রম করে অসীমের আস্বাদন এনে দেয়।

২. উপন্যাসে উপস্থিত প্রতিটি চরিত্র নিজস্ব ভঙ্গিমায় ও ভাষায় বা আত্মকথনে গভীরভাবে মগ্ন থাকে বলে এই শ্রেণির উপন্যাসের রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

৩. পত্রোপন্যাসে সাধারণত চরিত্রই প্রধান হয়ে ওঠে। তাদের ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পাঠক তার নিজের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করতে পারে।

৪. এই শ্রেণির উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের পত্রে বিষয়ভাবনা ও ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য থাকে। যা উপন্যাসকে শিল্পমণ্ডিত করে চমৎকারিত্ব প্রদান করে।

৫. পত্রোপন্যাসের একটি লক্ষণীয় বিষয় হল– উপন্যাসের একজনের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য একজন এই বিষয়ে কী ভাবছে বা তার প্রতিক্রিয়া কী– সেই দিকটি পাঠককে কৌতুহলী করে।

৬. পত্রোপন্যাসের লেখক রচনারীতি, সূক্ষ্ম রসবোধ ও অন্তরঙ্গ উপস্থিতি অতি তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয়কেও অসামান্য করে তোলে।

৭. পত্রোপন্যাসে নতুন রস সৃজিত হয়– সৃজনশীল লেখকের কলমে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভাবহীন সহজের রস।

৮. সার্থক পত্রোপন্যাসে উত্তম পুরুষ প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। কারণ উত্তম পুরুষ তখন সার্বিকভাবে পাঠকের মন জয় করে নেয়।

৯. পত্রোপন্যাসের দ্বারা বিশ্লেষণী মন্তব্য ও স্বচ্ছন্দ ভাবপ্রকাশের সুযোগ বেশি।

১০. পত্রোপন্যাসে রচনাশৈলীর চরম উৎকর্ষ দেখানোর সুযোগ বেশি। এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে আত্মকথনে মগ্ন। ফলে রচনার প্রসাদগুণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়।

১১. পত্রোপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল পাপড়ি ঘেরা পদ্মকোরকের মতো জীবনের অতি মৌলিক অনুভূতি ও প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থিত চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন।

১২. দুটি পত্রে মধ্যবর্তী অনিবার্য সাময়িক বিরতির দিক থেকেও এ রীতি লেখককে অধিক পরিমাণে আনন্দ ও সাময়িক তৃপ্তি দান করে।

১৩. পত্রোপন্যাসে ইলিউশন অফ রিয়ালিটি আমরা প্রত্যক্ষ করি।

১৪.৯ দৃষ্টান্ত

পাশ্চাত্য সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রোপন্যাস হল– স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'Pamela', 'Clarissa Harlowe', 'Grandson' টোরিয়ার স্পলেটের 'Humphry clinker', রুশোর 'La Nevelle Heloise', ল্যাকলোসের 'Les Liaisons Dangereuses' হ্যারিয়েট লি-র 'এরর্স অব ইনোসেন্স' সুইনবার্নের 'লাভস ক্রস-কারেন্টস' প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় পত্রোপন্যাস হল– নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসন্তকুমারের পত্র', কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধনহারা', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্রৌঞ্চমিথুন', নিমাই ভট্টাচার্যের 'প্রিয়বরেষু', বনফুলের 'কষ্টিপাথর', সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার', তরুণকুমার ভাদুড়ীর 'সন্ধ্যাদীপের শিখা' প্রভৃতি।

১৪.১০ একটি বাংলা পত্রোপন্যাস পর্যালোচনা

আলোচ্য পত্রোপন্যাসটি হল কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধনহারা'। এই উপন্যাসটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস বলে বিবেচিত করা হয় এবং আকর্ষণীয় বিষয় হল এই উপন্যাসটিই কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস। মোট সতেরোটি পত্রে উপন্যাসটি রচিত। এই উপন্যাসটি তিনি লেখা শুরু করেন করাচিতে থাকাকালীন। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'বাঁধন হারা'-র প্রথম কিস্তি এবং ১৯২১ সাল থেকে (১৩২৭ বঙ্গাব্দ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে জুন মাসে (শ্রাবণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যা বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার নতুন এক ধারার জন্ম দেয়।

'বাঁধনহারা' উপন্যাসের কাহিনি স্থল মুর্শিদাবাদের সালার। এই উপন্যাসে মাহবুবাকে লেখা রাবেয়ার দ্বাদশ চিঠি থেকে জানতে পারি রাবেয়ার ননদ শোফিয়ার সঙ্গে মাহবুবা বাল্যকাল থেকে একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। মাহবুবারা যখন রাবেয়াদের পাড়াতে আসে তখন সে একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকা। রাবেয়া মাহবুবাকে নিজের মতন করে মানুষ করে তুলছিল। মাহবুবা ও শোফিয়ার মধ্যে একটু অমিল রয়েছে। মাহবুবার মতো শোফিয়া শান্ত প্রকৃতির নয়। শোফিয়া নূরুলকে খুব বেশি সহ্য করতে পারত না।

রাবেয়া মাহবুবাকে নিয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিল। আনন্দ হলেও রাবেয়ার মনে মাঝে মধ্যে ভয় হত যে মাহবুবা হয়ত বিয়ে হয়ে অন্য কোন দূর দেশে চলে যাবে। কিন্তু রাবেয়াদের বাড়িতে নূরুল হুদা আসার পর রাবেয়া যখন শুনল নূরুলের সঙ্গে মাহবুবার বিয়ে হচ্ছে তখন রাবেয়ার সে কি আনন্দ। কমপক্ষে মাহবুবাকে আর দূরে যেতে হবে না। দুজনকে দেখলে রাবেয়ার আনন্দ হত আবার নূরুলের খামখেয়ালীপনার জন্য রাবেয়ার মনে ভয়ও হত। তার মনে হত নূরুল যে রকম খামখেয়ালী মানুষ তাতে বনের পাখি মাহবুবা আবার বনেই না ফিরে যায়।

নূরুল ও মাহবুবার বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু হঠাৎ করে নূরুল বিয়ের দিন পালিয়ে চলে গেল করাচির

সেনা নিবাসে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে। বাঁধনহারা নূরুল ঘর বাঁধতে পারল না। নির্দিষ্ট একজন নারীকে ভাল বাসতে পারল না। চলে গেল করাচিতে কিন্তু সেখানেই কি নূরুল সুখী ছিলে? এমন অবস্থায় মাহবুবার কি হবে? ইতিমধ্যে সাতদিনের জ্বরে মাহবুবার বাবা মারা গেল। অনেকের ধারণা নূরুলের এই চলে যাওয়ার ফলে অপমান দুঃখ সইতে না পারার জন্যই মাহবুবার বাবা মারা গেল।

নূরুল চলে যাওয়ার পর শোফিয়া কয়েক দিন প্রায় না খেয়েই কাটিয়েছে, ভয়াবহ এক কান্না সে কেঁদেছে। এই কান্না, এই নীরবতা কি জন্য? নিশ্চয়ই নূরুলের জন্য। তৃতীয় চিঠি থেকে জানতে পারি রফিয়ল নূরুলকে বলেছেন; ''তুই চলে যাওয়ার পর ওর যদি কান্না দেখতিস। সাতদিন সাতরাতি না খেয়ে না দেয়ে সে শুধু কেঁদেছিল। এখনও তোর কথা উঠলেই তার চোখ ছলছল করে উঠে।''

এরপর দুজন নারী মাহবুবা আর শোফিয়ার বিয়ে হয়ে যায়। মাহবুবার মামার বাড়ি থেকে মাহবুবার বিয়ে ঠিক করা হয়। বীরভূমের মস্ত জমিদার শোঙানের সঙ্গে মাহবুবার বিয়ে ঠিক হয়। জমিদার বাবুর পূর্বে একটি বিয়ে হয়েছিল। তার একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। বয়স চল্লিশের ঊর্দ্ধে। দুর্ভাগ্যবশত কিছুদিন পর চল্লিশোর্ধা জমিদার মাহবুবার স্বামীর মৃত্যু ঘটে। স্বামীর মৃত্যুর পর মাহবুবা বিভ্রান্ত হয়ে পরে। আবার অন্যদিকে শোফিয়ারও বিয়ে হয় কলেজ পড়ুয়া মনুয়রের সঙ্গে। কিন্তু সে বিয়েও খুব বেশি স্থায়ী হয়নি। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে শোফিয়ার জীবনের বাতি ক্রমশ নিভে আসে। তিনজনের কেউ অর্থাৎ নূরুল, মাহবুবা, শোফিয়া কেউ সংসার বাঁধতে পারল না। মাহবুবা মৃত স্বামীর সমস্ত জমিদারির মালিকানা পেয়েছে, কিন্তু সংসারে তার কোনও মন নেই। সে শীঘ্রই মক্কা, মদিনার মতো পবিত্র স্থানে পর্যটন করতে বেরোবেন এমনকি বাগদাদ শরীফেও যাবে বলে চিঠি দিয়েছে। এদিকে শোফিয়া মৃত্যুপথযাত্রী শুধু দিন গুনছে পরপারের জন্য।

নূরুল হুদা বলেছেন শুধু মাত্র মাহবুবা নয় শোফিয়াও তাকে ভালোবেসেছিল। 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের শেষ চিঠি থেকে তা স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। উপন্যাসটি অনেকটা ত্রিকোণ প্রেমের আকার ধারণ করেছিল। এই ভাবে বাঁধনহারা উপন্যাসের কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে। নূরুল হুদা এই উপন্যাসের সর্বশেষ পত্রে লিখেছে- ''আমার বাঁধনহারা জীবন নাট্যের একটা অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেল। এরপর কি আছে, তা আমার জীবনের পাগলা নটরাজই জানে''।

১৪.১১ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চেতনাপ্রবাহরীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

২. 'Stream of consciousness'– শব্দটি প্রথম কে প্রয়োগ করেন?

৩. বাংলা ভাষায় রচিত দুটি চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের নাম বলুন?

৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাসের নাম কী?

৫. বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম পত্রোপন্যাসের নাম কী?

৬. পত্রোপন্যাসের ইংরেজি নাম কী?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের সামগ্রিক পরিচয় দিয়ে এই শ্রেণির উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে লিখুন।

২. চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস কাকে বলে? একটি চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

৩. পত্রোপন্যাস আলোচনা করে এই শ্রেণির উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

৪. পত্রোপন্যাসের সংজ্ঞা। একটি পত্রোপন্যাস আলোচনা করে তার বিশেষত্ব তুলে ধরুন।

১৪.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. সাহিত্য প্রকরণ– হীরেন চট্টোপাধ্যায়

২. সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ– কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

৩. সাহিত্যের রূপভেদ: রূপরীতি নির্ণয়– সুধাংশুশেখর মণ্ডল

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত– অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. বিশ শতক– অলোক রায়

৬. বাংলা পত্রোপন্যাস– অতুল কুমার দাশ

৭. E.M. Forster- Aspects of Novel

৮. J. A Cuddon- Adictionary of Literary Terms

৯. M. H. Abrams- Glossary of Literary Terms

১০. R.A Scott-James- The Making of Literature

১১. W.H. Hudson- An Introduction to the study of Literature

একক ১৫ ❑ ছোটগল্পের প্রকৃতি

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ ছোটগল্পের উদ্ভব

১৫.৪ ছোটগল্পের সংজ্ঞা-স্বরূপ

১৫.৫ ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য

১৫.৬ ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাগ

১৫.৭ ছোটগল্প ও উপন্যাস

১৫.৮ ছোটগল্প ও গীতিকবিতা

১৫.৯ ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটক

১৫.১০ প্রশ্নাবলী

১৫.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.১ উদ্দেশ্য

ছোটগল্পের উদ্ভবের ইতিহাস ও তার বিবর্তনের যে ধারা এবং ছোটগল্প সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে সমালোচদের চিন্তাধারা অর্থাৎ তাঁরা ছোটগল্পকে কীভাবে দেখেছেন বা পরবর্তীতে ছোটগল্পকে যে নানান শ্রেণির মধ্যে ভাগ করা হয়েছে– সেই দিকগুলিকে তুলে ধরা আলোচ্য এককের উদ্দেশ্য।

১৫.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি অনুশীলন করলে ছাত্র-ছাত্রীরা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হবে সেই দিকগুলি সম্পর্কে দুই-এক কথা প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা যাক–

১. আমরা জানি উনিশ শতকে ছোটগল্পের উদ্ভব এবং সেই উদ্ভবের সংজ্ঞা-স্বরূপ এই এককে উপস্থিত।

২. সমালোচকরা ছোটগল্পকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন– সেই বিভাজিত শ্রেণিগুলি সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

৩. ছোটগল্প কেন উপন্যাসের থেকে আলাদা সেই দিকটিকে বিশেষভাবে এই এককে তুলে ধরা হয়েছে।

১৫.৩ ছোটগল্পের উদ্ভব

সাহিত্যের নবীনতম ও জনপ্রিয় সাহিত্য-প্রকরণ হল ছোটগল্প। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই হল গল্প শোনা বা গল্প বলা। অদিমকাল থেকেই মানুষ গল্প বলে এবং শুনে চমৎকৃত, আনন্দিত এবং বিস্মিত হয়। আজকের যে আধুনিক ছোটগল্প তার বীজ নিহিত ছিল আমাদের দেশের পুরাণের গল্প, রূপকথার গল্প, পরবর্তীকালের জাতক সাহিত্য, পঞ্চতন্ত্র, ঈশপের গল্প, হিতোপদেশের ইত্যাদি গল্পে। আবার সংস্কৃত সাহিত্যর বৃহৎ কথা, কথাসরিৎসাগর, দশকুমার চরিতেও আধুনিক ছোটগল্পের সঙ্গে নাড়ির যোগ রয়েছে। আমাদের দেশের মতোই বিদেশের উপকথা, লোককথা, কিংবদন্তী, পুরাকথা, বাইবেলের প্যারাবলস, জিওফ্রে চসার ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের লেখায় ছোটগল্পের বীজের সন্ধান পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ছোটগল্পের আকার ধারণ করে। খ্রিস্টপূর্ব প্রাচীন মিশরে এবং আরোও পরে গ্রিসে ও রোমে নানা ধরনের গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই সমস্ত গল্পগুলি মূলত বিনোদনধর্মী এবং সেগুলিও আধুনিক গল্পের পূর্বসূরি হিসেবে পরিগণিত। চতুর্দশ শতকের ইতালীয় সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয় বোকাচ্চিওর 'ডেকামেরণ' গল্পগ্রন্থের মধ্য দিয়ে। এই গ্রন্থের অনুকরণে ইতালি, ফ্রান্সে 'novelle' নামে এক ক্ষুদ্র গদ্য আখ্যানের জন্ম হয়। বলা যেতে পারে এই আখ্যানই আধুনিক ছোটগল্পের পথ নির্দেশক। এর দীর্ঘদিন পর রাশিয়ায় ১৮৩০ বা তার কিছু পরে পুশকিনের 'Tales of Belkin' এবং গোগল ও তুর্গেনেভের গল্পগুলি ছোটগল্পের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীর। গোগলের বিখ্যাত গল্প 'The overcoat' সম্পর্কে তুর্গমেভ মন্তব্য করেছিলেন–''আমরা সকলেই বেরিয়ে ছিলাম গোগলের ওভার কোটের নিচ থেকে।'' ইংরেজি ভাষায় প্রথম ছোটগল্পের আবির্ভাব আমেরিকায়। ওয়াশিংটন আরভিং তাঁর স্কেটেস (sketches) বা 'Tales' বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৮৩০-৪০ এর মধ্যে মার্কিন গল্পকারেরা ছোটগল্পকে বিশ্বসাহিত্যের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন–ছোটগল্পের প্রকৃতি কী হওয়া উচিত। এঁদের মধ্যে বা এই সময়ের অন্যতম ছোটগল্পকার হলেন এডগার অ্যালান পো। সাধারণত তাঁকেই আধুনিক ছোটগল্পের জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গল্পগুলি হল- 'The Gold Bag', 'The Black Cat' প্রভৃতি। এরপর টলস্টয়, গোর্কি, মপাসাঁ, চেকভ প্রমুখের গল্প ছোটগল্পের ক্রমবিবর্তনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বাংলা সাহিত্যেও ছোটগল্পের আবির্ভাব হয় উনিশ শতকে। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' গল্পকে বাংলা ভাষার প্রথম ছোটগল্প বলা হয়। তবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'দেনাপাওনা' গল্পকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প বলা হয়।

১৫.৪ ছোটগল্পের সংজ্ঞা-স্বরূপ

ছোটগল্পের কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি বা নির্ণয় করা যায়নি। ছোটগল্প সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট সমালোচকদের নির্দেশিত সংজ্ঞাকে লিপিবদ্ধ করছি এবং শেষে একটি ছোটগল্পের সাধারণ সংজ্ঞায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করব–

ছোটগল্পের সংজ্ঞায় বিদেশি সমালোচকগণ–

১. এডগার অ্যালান পো বলেছেন; "A brief prose narrative requiring from half an hour to one hours in it perusal." অর্থাৎ তাঁর ব্যাখ্যা ছোটগল্পের আকার ও আয়তনের কথা উঠে আসে।

২. H.G. Wells বলেছেন– "A short story is, or should be, a simple thing; it aims at producing one single vivid effect; it has to seize the attention at the outset, and never relaxing gather it together more and more and more until the climax is reached. The limits of the human capacity to attend closely therefore set a limit to it, it must explode and finish before in eruption occurs or fatigue set in." অর্থাৎ তিনি ছোটগল্পের ঘটনা ও প্রকৃতির উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

৩. ব্রানডার ম্যাথুজ বলেছেন– "A short story deals with a single character, a single event, a single emotion or the series of emotions called forth by a single situation." অর্থাৎ তিনি ছোটগল্পের ঘটনা ও প্রতীতির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪. এম. এস. সিং বলেছেন– "There is tendency to regard the short story as a novel in miniature, as the stunted growth of a majestic tree."

৫. ফ্রেড লেবিস স প্যাটে বলেছেন– "Impressionist prose tale... Short, effective, a single blow, a moment of atmosphere, a single glimpse of a climatic incident."

ছোটগল্পের সংজ্ঞায় বাঙালি সমালোচকগণ–

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটগল্পের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। যা ছোটগল্পের আলোচনায় বারবার উঠে আসে–

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।''

২. প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্পের সংজ্ঞায় বলেছেন– ''গল্প চলে বহুবর্ণ স্রোতের মতো অবিশ্রান্ত হয়ে, তার মাঝের খানিকটাই ধরিমাত্র, এই ঘাট থেকে আর এক ঘাট। ব্যাস এই পর্যন্ত। কিংবা বলতে পার অপরূপ কোন বয়ন যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে নানা রঙের কাজ করা অফুরন্ত বনাত, আমরা মাঝখান থেকে হঠাৎ কাঁচি বসাই, কেটে আনি এক টুকরো রঙবেরঙের কাপড়। ছোটগল্প সেই এক টুকরো রঙবেরঙের কাপড়।''

৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের সংজ্ঞায় বলেছেন– ''ছোটগল্পের লেখক যত্রতত্র কবিতার সুরভী আর দর্শনের জ্যোতির্বলয় বিস্তারিত করেন। কিন্তু যাকে ভালো ছোটগল্প বলছি যা আধুনিক কালের গল্প, তা যে কোন একটি বিষয়কে আশ্রয় করে আলো আঁধারের দ্বৈতলীলার কেন্দ্রটিতে এসে দাঁড়ায়, বাস্তবের ক্যানভাসেই প্রথম পড়ে তার তুলিটির আঁচড়, তারপর ক্রমশ তার টার্নগুলো ক্যানভাস ছাড়িয়ে ফ্রেমের বাইরে ছুটে যেতে থাকে।''

৪. ভূদেব চৌধুরী ছোটগল্পের একটি অসামান্য সংজ্ঞা দেন– ''মুহূর্তের বিন্দুমূলে জীবন-সিন্ধুর পূর্ণ চেতনা যে গল্পের পরিণামে ব্যঞ্জিত হয় না, সে গল্প আকারে ছোটো হলেও ছোটগল্প নয়, আখ্যান, উপকথা বা যা খুশি হতে তার বাধা নেই। অতএব সীমায়িত জীবনের ক্ষণবৃত্তে অনন্ত জীবনের ব্যঞ্জনা রচনাতেই ছোটগল্পের শিল্পশৈলীর বিশিষ্টতা।''

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলিকে আত্মস্থ করে ছোটগল্প প্রসঙ্গে সবশেষে বলা যায়, সংক্ষিপ্ত পরিসরে যেখানে অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ নিটোল এবং একমুখী লক্ষে ঘটনা ও চরিত্রের পরিণতি সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং চমকপ্রদ হয় তাকেই ছোটগল্প বলব।

১৫.৫ ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য

১. ছোটগল্প একই দেহে ছোট হবে– তাতে গল্পও থাকবে। অর্থাৎ স্বল্প আয়তন অথচ বাহুল্যবর্জিত হবে।

২. সমস্ত অবান্তর অংশ বর্জন করে, অত্যাবশ্যকের সংরক্ষণ ও পরিস্ফুটনের মধ্য দিয়ে ছোটগল্প ফুটে ওঠে।

৩. ছোটগল্পের গতি তীব্র এবং একমুখী লক্ষে স্থির এবং ঘটনা ও চরিত্র পাঠককে প্রতিনিয়ত বিস্মিত করে।

৪. ছোটগল্প বিদ্যুতের চমকের মতো জীবনের মাঝখান থেকে শুরু হয় এবং শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বলে যায়।

৫. একটি ক্ষুদ্র আখ্যানখণ্ডে সমগ্র জীবনের তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য।

৬. বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন– ছোটগল্প এই দর্শনে বিশ্বাসী। এককথায় যেন পাঠক অনেক কথার ইঙ্গিত পায়।

৭. ব্যঞ্জনাধর্মিতা ছোটগল্পের একটি বিশিষ্ট দিক। যা ছোটগল্পকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায় এবং পাঠকের বোধের উন্মোচন ঘটায়।

৮. ছোটগল্পের শিল্পরূপের মধ্যে নিখুঁত ঐক্য থাকবে, যা গল্পের গঠনশৈলীকে এক সুতোয় বেঁধে এক অনিবার্য দিক নির্দেশ করবে।

৯. ছোটগল্পের ভাষারূপ ও আঙ্গিক নির্মিতি ঘনীভূত ঐক্যে বিরাজ করে।

১০. ঘটনা, চরিত্র বা বিষয়ের বহুমাত্রিক সম্ভাবনার সাংকেতিকতা আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম লক্ষণ।

১১. দু-তিনটি ঘটনার মধ্যে ইউনিটি অফ ইম্প্রেশন বা অখণ্ড প্রতীতি সৃষ্টি করে শিল্পরসের নিষ্পত্তি ঘটানোর মধ্যে নিহিত থাকে ছোটগল্পের সার্থকতা।

১২. ছোটগল্পে ঘটনার অগ্রগতি এবং পরিণামে একটিমাত্র মহামুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স থাকবে এবং পাঠকের চিত্তকে আলোড়িত করবে।

১৫.৬ ছোটগল্পের শ্রেণি বিভাগ

সমালোচকেরা ছোটগল্পকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। তবে এ-কাজ সহজ নয়। কেননা ছোটগল্পের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময়। তবুও তাত্ত্বিকেরা ছোটগল্পের বিষয় ও সেই সঙ্গে ছোটগল্পের আবহ আঙ্গিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাজন করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পকে মোট বারোটি উপবিভাগে ভাগ করেছেন। অন্যদিকে শ্রীশচন্দ্র দাশ তাঁর 'সাহিত্য প্রকরণ' গ্রন্থে ছোটগল্পের পনেরোটি বিভাগের কথা বলেছেন। সংক্ষেপে প্রতিটি বিভাগের আলোচনা করা যাক–

১. **প্রেম বিষয়ক:** এই শ্রেণির গল্পে প্রেমই মুখ্য। বিভিন্ন স্তরের প্রেমকে কেন্দ্র করে গল্পের অগ্রসর। যেমন– তুর্গনেভের 'The District Doctor', গোর্কির 'Boles', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভস্মশেষ', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সর্পিল', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদেনী' ইত্যাদি।

২. **অতিপ্রাকৃত:** প্রকৃতি তথা বস্তুজগৎকে অতিক্রম করে আমাদের কল্পনাকে শিহরিত করে যে অতিপ্রাকৃত রহস্যের জগৎ তারই পটভূমিতে রচিত হয় এ-ধরনের গল্পের কাহিনি। যেমন– গোগলের 'ক্রিসমাস ইভ', এডগার অ্যালান পোর 'ব্লাক ক্যাট', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মর্কট', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাসি', সত্যজিৎ রায়ের 'নীল আতঙ্ক' ইত্যাদি।

৩. **হাস্যরসাত্মক:** এই শ্রেণির গল্পে সামাজিক অসংগতি, চরিত্রগত অতিরঞ্জন অথবা ঘটনাগত

সজ্জা থেকে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। যেমন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তির উপায়', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বলবান জামাতা', পরশুরামের 'ভূশণ্ডির মাঠ', শিবরাম চক্রবর্তীর 'শঁড়ওয়ালা বাবা' ইত্যাদি।

৪. **উদ্ভট:** এখানে দেখা যায় অদ্ভুত ও অসম্ভব কল্পনার কাহিনি বিস্তার। যেমন– এইচ. জি. ওয়েলস-এর 'দি ইনভিজিবল ম্যান', কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভগবতীর পলায়ন' সত্যজিৎ রায়ের 'অঙ্ক স্যার' ইত্যাদি।

৫. **সাংকেতিক গল্প:** গল্পে যা বলা হয়েছে তার পরিবর্তে যখন ব্যঞ্জনা মুখ্য হয়ে ওঠে। যেমন– সামারসেট মমের 'দি রেন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুপ্তধন', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাতের গাড়ি', বিমল করের 'বাঘ' ইত্যাদি।

৬. **প্রকৃতি ও মানুষ:** এই শ্রেণির গল্পে প্রকৃতি এবং মানুষ একাত্ম। যেন একই মায়ের দুই সন্তান। যেমন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অতিথি', মনোজ বসুর 'বনমর্মর', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৌরীফুল' ইত্যাদি।

৭. **ঐতিহাসিক:** ইতিহাসকে অবলম্বন করে যখন গল্পের প্লট নির্মাণ হয়। যেমন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দালিয়া', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃৎপ্রদীপ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রত্নতত্ত্ব' ইত্যাদি।

৮. **বিজ্ঞান নির্ভর:** এই ধরনের গল্পের মধ্যে বিজ্ঞানের কোনও প্রতিষ্ঠিত সত্যকে কল্পনার দ্বারা রূপদান করা হয়। যেমন– এইচ. জি. ওয়েলসের দি 'স্টোলেন ব্যাসিলাস', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শয়তানের বিষ', সুবোধ ঘোষের 'শক্ থেরাপি' ইত্যাদি।

৯. **মনস্তাত্ত্বিক:** এই ধরনের গল্পে মূলত চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। যেমন– রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার', শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়', আবুল বাশারের 'হবা' ইত্যাদি।

১০. **মনুষ্যেতর:** এই ধরনের গল্পে মানুষ অপেক্ষা মূল বিষয় জীবজন্তু বা তার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় মুখ্য হয়ে ওঠে। যেমন– বালজাকের 'প্যাশান ইন দি ডিজার্ট', প্রভাতকুমারের 'আদরিনী', সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক', তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' ইত্যাদি।

১১. **বাস্তবনিষ্ঠ গল্প:** কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবতাই এই ধরনের গল্পের আধার। এককথায় সরাসরি বক্তব্যকে প্রকাশ করা শৈল্পিকভাবে। যেমন– শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লা কুঠির গল্প', জগদীশ গুপ্তের 'রামের টাকা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ইত্যাদি।

১২. **গোয়ান্দা গল্প:** এই ধরনের গল্পে একজন শৌখিন বা পেশাদার গোয়েন্দা কোনো অপরাধ বা খুনের তদন্ত বা রহস্য উন্মোচন করেন। যেমন– শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের গল্প, সত্যজিতের ফেলুদা ইত্যাদি।

১৩. **গার্হস্থ্য বা পারিবারিক:** গল্পের মূলে পারিবারিক সমস্যা বা সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা যায় এই শ্রেণির ছোটগল্পে। যেমন– রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী', শরৎচন্দ্রের 'মামলার ফল', বনফুলের 'তিলোত্তমা' ইত্যাদি।

১৪. **সামাজিক:** এই ধরণের গল্পে সামাজিক কোনও বিষয় গল্পে উঠে আসে। যেমন– রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা', নরেন্দ্র মিত্রের 'রস', সমরেশ বসুর 'আদাব' ইত্যাদি।

১৫. **বিদেশি পটভূমিকাযুক্ত গল্প:** বাংলা গল্প অথচ বিদেশি পটভূমিতে চিত্রিত যেসব গল্প। যেমন– অবিনাশচন্দ্র বসুর 'বম্বের মোহ', রাখাল সেনের 'সহযাত্রী', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলের মূল্য' ইত্যাদি।

১৫.৭ ছোটগল্প ও উপন্যাস

ছোটগল্প এবং উপন্যাস দুই-ই কথাসাহিত্যের অঙ্গ। তবে উভয়ের মধ্যে শিল্প প্রকরণে আঙ্গিকগত ও ভাবগত কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়–

১. উপন্যাসে চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া গেলেও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে চরিত্রের বিকাশ মূলত খণ্ডিত।

২. ছোটগল্পে চরিত্রের সংখ্যা খুব কম থাকে কিন্তু অপরদিকে উপন্যাসের চরিত্রের ঘনঘটা লক্ষ করা যায়।

৩. ছোটগল্প সামান্য পরিসরে জীবনের খণ্ড চিত্রের রূপায়ণ, উপন্যাস বিস্তৃত পরিসরে জীবনের বহু অভিজ্ঞতার সমাবেশ।

৪. ছোটগল্পের প্লট একটি, তবুও বাহুল্যবর্জিত হয় আয়তনের কারণে। উপন্যাসের মূল প্লটের পাশাপাশি অপ্রধান প্লটও সমান্তরালভাবে চলতে থাকে।

৫. ছোটগল্পের বাক্যগঠনে অনেক বেশি নাটকীয়তা লক্ষ করা যায়। কিন্তু উপন্যাসের বাক্য সাধারণত ব্যাখ্যামূলক হয়।

১৫.৮ ছোটগল্প ও গীতিকবিতা

ছোটগল্প ও গীতিকবিতার মধ্যে রচনাগত তারতম্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ মেজাজ লক্ষ করা যায়, যা একে অপরের পরিপূরক। ছোটগল্প ও গীতিকবিতার এই সম্পর্কের কয়েকটি মাত্রা স্পষ্ট করা যেতে পারে–

১. মেজাজের দিক দিয়ে ছোটগল্প এবং গীতিকবিতা একই মায়ের দুই সন্তান। ব্যঞ্জনধর্মিতায় এদের প্রাণ।

২. ছোটগল্প ও গীতিকবিতা রূপক-প্রতীক বা সংকেতময়তার কারণে একাসনে বসার দাবি রাখে।

৩. প্লটের দিক দিয়ে ছোটগল্পের একমুখীনতা গীতিকবিতাতেও বর্তমান থাকে।

৪. ছোটগল্পের মধ্যে যেমন গীতিকবিতার আভাস পাওয়া যায় তেমনই গীতিকবিতার মধ্যেও গল্পের অনায়াস প্রবেশ লক্ষ্য করি।

১৫.৯ ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটক

ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটক দুটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম হলেও উভয় শিল্পমাধ্যমের মধ্যে ভাবে-বিষয়ে, গঠনে-নির্মিতিতে সাদৃশ্য রয়েছে। সেই সাদৃশ্যগুলি সূত্রাকারে দেওয়া হল–

১. খণ্ড জীবনের আলোয় বৃহৎ জীবনকে প্রকাশ করতে চায় ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটক।

২. ছোটগল্পের একমুখীনতা ও ব্যঞ্জনাময়তা একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে তা নাট্যদ্বন্দ্ব ও গতিশীলতায় ঘনীভূত হয়।

৩. সংক্ষিপ্ত আকারে ভাবগত সাযুজ্যের বহিঃপ্রকাশ উভয় শিল্পমাধ্যমের মধ্যেই প্রকাশ পায়।

৪. গল্পসত্য ও নাট্যসত্যকে চিরন্তন করার জন্য ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটকে ক্লাইম্যাক্সের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৫.১০ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. ইংরেজি ছোটগল্পের আবির্ভাব হয় কোথায়?

২. আধুনিক ছোটগল্পের প্রথম সার্থক রচয়িতা কে?

৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প কোনটি?

৪. ছোটগল্পের একটি সংজ্ঞা দাও।

৫. একটি অতিপ্রাকৃত ছোটগল্পের নাম লিখুন।

৬. বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ছোটগল্পের নাম কী?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. ছোটগল্পের উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিয়ে তার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৩. উদাহরণসহ ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাগ করুন।

৪. ছোটগল্প ও উপন্যাসের পার্থক্যগুলি সূত্রাকারে লিখুন।

৫. ছোটগল্পের সঙ্গে একাঙ্ক নাটক ও গীতিকবিতার সম্পর্ক মূল্যায়ন করুন।

১৫.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা ছোটগল্পের তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি– সোহরাব হোসেন

২. সাহিত্য প্রকরণ– হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৩. সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ– কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

৪. সাহিত্যের রূপভেদ: রূপরীতি নির্ণয়– সুধাংশুশেখর মণ্ডল

৫. সাহিত্যে ছোটগল্প– নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৬. বাংলা ছোটগল্প– শিশিরকুমার দাশ

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত– অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৮. J. A Cuddon- A Dictionary of Literary Terms

৯. The Concise Oxford Dictionary of Literature

১০. The concise Oxford Dictionary of Literary Terms

Note

একক ১৬ ❑ ছোটগল্প ও রূপকথা

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য

১৬.২ প্রস্তাবনা

১৬.৩ ছোটগল্পের আঙ্গিক

১৬.৪ ছোটগল্পের আয়তন

১৬.৫ একটি ছোটগল্প পর্যালোচনা

১৬.৬ রূপকথার সংজ্ঞা-স্বরূপ

১৬.৭ রূপকথার বৈশিষ্ট্য

১৬.৮ ছোটগল্প ও রূপকথা

১৬.৯ একটি রূপকথা পর্যালোচনা

১৬.১০ প্রশ্নাবলী

১৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১৬.১ উদ্দেশ্য

রূপকথার মধ্যে ছোটগল্পের বীজ পাওয়া যায়– একথা অনেক সমালোচকদের মন্তব্যে উঠে আসে। তবে রূপকথা যে ছোটগল্প নয় সেই দিকটি উপস্থাপন করা এই এককের উদ্দেশ্য। এছাড়া ছোটগল্প ও রূপকথার বিভিন্ন আঙ্গিকের আলোচনা এই এককের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৬.২ প্রস্তাবনা

এককটির প্রস্তাবনায় যে বিষয়গুলি উঠে আসে–

১. ছোটগল্পের আঙ্গিকগত বিচার এই এককের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

২. ছোটগল্পের আয়তন সম্পর্কে সমালোচক মহলে নানা বিতর্ক রয়েছে। আলোচ্য এককে সেই দিকটির প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে।

৩. রূপকথার বৈশিষ্ট্য কীভাবে ছোটগল্পকে আলাদা করেছে সেই দিকটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রূপকথার সংজ্ঞা-স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে।

১৬.৩ ছোটগল্পের আঙ্গিক

যে বিষয়গুলি আঙ্গিকের আলোচনায় উঠে আসে সূত্রাকারে সেগুলিই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। মূলত গল্পের সূচনা, গল্পের সমাপ্তি, কাহিনি-বিন্যাস, রচনাভঙ্গি এই চারটি পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে ছোটগল্পের আঙ্গিক বিচার করব।

গল্পের সূচনা: ছোটগল্প সূচনার বিভিন্ন রীতি রয়েছে। যথা–

ক) **লিখনধর্মী সূচনা**– লিখনধর্মী গল্পের সূচনা সদর্থে লিখিত সাহিত্যের সূচনা, তা লেখকের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়। যেমন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা'।

খ) **কথনধর্মী সূচনা**– কথনধর্মী সূচনার রীতি মূলত মৌখিক সাহিত্যের রীতি। যেমন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'।

গ) **পুরাঘটিত বর্তমান দিয়ে সূচনা**– একটি ঘটনা শেষ ও অন্য ঘটনার শুরু এই সূচনার লক্ষণ। যথা 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্যা পূরণ'।

ঘ) **নিত্যবৃত্ত অতীত দিয়ে সূচনা**– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একটি আষাঢ়ে গল্প' শীর্ষক গল্পটির সূচনা নিত্যবৃত্ত অতীত দিয়ে গল্প সূচনার রীতি অনুযায়ী।

গল্পের সমাপ্তি: গল্প সমাপ্তির বিচিত্র রীতি রয়েছে–

ক) **সরলরৈখিক সমাপ্তি:** এ ধরনের সমাপ্তিতে কোনও একটি মুহূর্তের অনুভূতি, কোনও চরিত্রের দীর্ঘশ্বাস, ব্যর্থতা কিংবা করুণ অথবা মধুর পরিণতি থাকে। যেমন– 'নষ্টনীড়' গল্পের সমাপ্তি।

খ) **তির্যক সমাপ্তি:** এ ধরনের সমাপ্তি একটু খোঁচা দেওয়া সমাপ্তি, একটু আয়রনিক সমাপ্তি। ভগীরথ মিশ্রের 'লেবারণ বাদ্যিগর' গল্পের সমাপ্তি এ ধরনের।

গ) **বৃত্তাকার সমাপ্তি:** যে কোনও প্রকার অতৃপ্তিহীন সমাপ্তি থাকে, এখানে থাকে তৃপ্তির মাধুর্য। অশেষের মুখাপেক্ষী নয় এ-রীতি। যেমন–শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটি।

ঘ) **নাটকীয় চমক তথা লেখকের উক্তিনির্ভর সমাপ্তি:** এ ধরনের সমাপ্তিতে লেখকের মন্তব্য কিংবা চরিত্রের মন্তব্য নাটকীয়ভাবে গল্পসত্যকে উন্মোচিত করে।
যেমন– সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম'।

কাহিনি-বিন্যাস: ছোটগল্প গঠনে কাহিনি বিন্যাসের ত্রিবিধ পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। যথা:

ক) **পরিচ্ছেদ বিভাগহীন কাহিনিবিন্যাস:** 'দেনাপাওনা', 'পোষ্টমাষ্টার' ইত্যাদি।

খ) **পরিচ্ছেদ বিভক্ত কাহিনিবিন্যাস:** 'জীবিত ও মৃত', 'শাস্তি', 'নষ্টনীড়', ইত্যাদি।

গ) **ফ্লাশব্যাক রীতির কাহিনিবিন্যাস:** 'মনিহারা', 'একরাত্রি', 'কঙ্কাল' ইত্যাদি।

রচনাভঙ্গি : ছোটগল্পের আঙ্গিকে বৈচিত্র্যময় রচনাভঙ্গির সম্পৃক্তি লক্ষ করা যায়। সেখানে দেখি কোথাও রয়েছে লেখকের বর্ণনাযুক্ত বিশ্লেষণমূলক রচনাভঙ্গি (পোষ্টমাস্টার) কোথাও

রয়েছে উত্তম পুরুষ 'আমি' দিয়ে বর্ণিত রচনাভঙ্গি (সম্পাদক: রবীন্দ্রনাথ) কোথাও আবার লক্ষ করা যায় পত্রাকার রচনাভঙ্গি (স্ত্রীর পত্র), কোনও কোনও ক্ষেত্রে মিশ্র রীতির রচনাভঙ্গিও লক্ষ করা যায়। যেমন– 'কঙ্কাল' গল্পটি। এই গল্পের প্রথমে লেখক আমি বলে গল্প শুরু করেছেন– পাঠক তখন শ্রোতা। পরে গল্পের নায়িকা গল্প বলতে শুরু করেছে– লেখক 'আমি' তখন শ্রোতা।

১৬.৪ ছোটগল্পের আয়তন

ছোটগল্পের আয়তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই নিয়ে পণ্ডিত-গবেষক বা সমালোচক মহলে নানা মতবিরোধ রয়েছে। সেই বিষয়ই এখানে আলোকপাত করব–

১. কারও কারও মতে ছোটগল্পের কাহিনি ১০-১৫ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করতে হবে।

২. সমালোচক হেনরি জেমস বলেন ৬০০০ থেকে ৮০০০ শব্দের মধ্যে ছোটগল্পের আয়তন গড়ে তুলতে হবে।

৩. এডগার এলান পো'র সংজ্ঞানুসারে ছোটগল্প এমনই একটি 'Prose tale' যা একটি অধিবেশনে পড়ে শেষ করা যায়।

৪. কেউ কেউ বলেন, আধঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে পড়ে শেষ করা যাবে এমন গল্পই ছোটগল্প।

উপরোক্ত ছোটগল্পের আয়তন সম্পর্কে যে মতামত তা সর্বোপরি গ্রহণ করা যায় না। তার কারণ কোনও শিল্পমাধ্যমকে নিছক মাপে বা ছকে ফেলে আঁকা যায় না। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যাক– আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' গল্প দুটি দেখি সেখানে নষ্টনীড়ের পৃষ্টা সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা চল্লিশ পাতার মতো। অর্থাৎ উপরোক্ত সে মতবাদগুলি এখানে অসার্থক হয়ে যায়। সুতরাং ছোটগল্পের সার্থকতা তার আয়তনগত ধারণার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে প্রকৃতিগত মেজাজের উপর। প্রকৃতিগত মেজাজ কী হওয়া জরুরি তা পূর্ব এককে বিস্তারিত আলোচনা করা রয়েছে।

১৬.৫ একটি ছোটগল্প পর্যালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিচারক' গল্পটি আলোচনা করা যাক। 'বিচারক' গল্পে এক নারীর জীবন সংগ্রাম বর্ণিত। যে নারী পতিতাজীবন থেকে মুক্তিকামী। অর্থাৎ ক্ষীরোদা ওরফে হেমশশীর করুণ কাহিনিই এই গল্পের মুখ্য বিষয়। হেমশশী তার সামাজিক জীবন থেকে পতিত হয়ে আজ নাগর ধরার খেলায় ওস্তাদ খেলুড়ে। বিনোদচন্দ্র ওরফে মোহিতমোহন তাকে কুলটা করেছিল। আসলে পতিতা ক্ষীরোদা চাইছিল একটি স্থায়ী গৃহকোণ। কিন্তু একদিন তার শেষতম নাগরটিও ফাঁকি দিয়ে উড়ে গেল। তখন কপর্দকশূন্য

অবস্থায় তার সামনে একটাই পথ খোলা ছিল– আবার সন্ধ্যাতে খদ্দের ধরার মহড়া করা। কিন্তু সুখী গৃহকোণের অভিলাষী ক্ষীরোদা তা মানতে চাইল না। সে চাইছিল মুক্তি। সেই মুক্তির সন্ধানে সে ঝাঁপ দিল কূপে– পুকুরে। পুত্র সমেত। ফলে একটি মৃত্যু সংঘটিত হল। তার শিশুপুত্র মারা গেল। এই মৃত্যুই গল্পে অন্যমাত্রা আনল। বিচারক মোহিতমোহন ক্ষীরোদার ফাঁসি ঘোষণা করল। তারপর কৌতূহল মেটাতে ক্ষীরোদার কাছে গিয়ে তার হাতের আংটি দেখে সে জানল ক্ষীরোদাকে সে-ই এ পাপ পথে এনেছিল। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী মোহিতমোহন চিহ্নিত হয়ে পড়ল। আর ক্ষীরোদার সব পাপ যেন ধুয়ে মুছে গেল। ক্ষীরোদার উত্তরণ যেন পূর্ণ হল: '... তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়ের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।' মানবতাবাদের নবজাগরণ পর্বে পতিতা জীবনের প্রতি যে সহানুভূতি মানবমনে জেগেছিল সেই সমাজ অবস্থার চিত্রণে লেখক মন জারিত।

১৬.৬ রূপকথার সংজ্ঞা-স্বরূপ

লোকসাহিত্যে বিভিন্ন ধরনের বিভাগ রয়েছে। তবে গদ্যে লেখা কাহিনিগুলিই সবচেয়ে সমৃদ্ধ। লোককথা হল সেই সমৃদ্ধতম বিভাগের একটি অংশ। এই লোককথার সামগ্রিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় রূপকথায়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বাংলা রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক। যদিও এই প্রয়াসের সূচনা করেছিলেন লালবিহারী দে। তবে তাঁর বাংলা রূপকথা বিষয়ক সংকলনটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। বইটির নাম 'ফোকটেলস অফ বেঙ্গল', প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে। এখানে মোট বাইশটি গল্প ছিল তার মধ্যে চার-পাঁচটি রূপকথা বিষয়ক। তাই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের সময় অনুবাদক শ্রীমতী লীলা রায় নাম দিয়েছিলেন 'বাংলার উপকথা'।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রথম বাংলা ভাষায় আপামর বাঙালির হৃদয়ের রূপকথা শোনালেন। তাঁর রূপকথা বিষয়ক দুটি অনবদ্য গ্রন্থ হল 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে প্রকাশিত হয় ১৯০৭ ও ১৯০৯ সালে। দীনেশচন্দ্র সেনের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থটির প্রকাশকালে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। গ্রন্থভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন–"এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙালি বালকদের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকে শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানী গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।" যদিও রূপকথা ছোটদের সাম্রাজ্য কিন্তু এর রচনা বড়োদের হাত ধরেই হয়ে থাকে এবং বড়োরাও রূপকথার মধুর রোমান্সে পুলকিত, রোমাঞ্চিত হয়। আসলে রূপকথাগুলি হল আমাদের প্রাচীন জীবনের ছবি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রূপকথা প্রসঙ্গে বলেছেন– "আমাদের বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারের কি এক সম্পূর্ণ ছবি এই রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে!

ইহার রচনার কাল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ হইলেও ইহা নিঃসংশয়িত ভাবে বলা যায় যে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ সমাপ্ত হইবার পর ইহার জন্ম। সমস্ত রূপক ও বর্ণনা বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নীবিরোধ, সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়।''

১৬.৭ রূপকথার বৈশিষ্ট্য

১. রূপকথা মূলত রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্যা, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া কিংবা বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো উদ্ভট প্রসঙ্গযুক্ত এমন কাল্পনিক কাহিনি, যার প্রধানতম উপাদান রোমান্স রস।

২. অলৌকিকতার অস্বাভাবিক নানান উপকরণ রূপকথায় থাকতে পারে, যাকে আধুনিক যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন করা যায় না। এই সমস্ত কাহিনি যুক্তির অপেক্ষা করে না। কারণ যাদের জন্য রূপকথার আয়োজন সেখানে এ-ধরনের প্রশ্ন ওঠা অসম্ভব।

৩. রূপকথার জগৎ আদতে ফ্যান্টাসির জগৎ– সম্ভব-অসম্ভবের কোনও পরিধিতে বেঁধে রাখা যায় না। স্বপ্নরাজ্যের অলীকত্বের সঙ্গে রূপকথার ফ্যান্সি কল্পনার সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়।

৪. মূলত শ্রোতার মনোরঞ্জনই রূপকথার একমাত্র দায় বা উদ্দেশ্য যাই বলি না কেন– শ্রোতা পরিণত বুদ্ধি দিয়ে বিষয়কে বোঝে না বরং পুরোপুরি চালিত হয় নিজের অবোধ রঙিন হৃদয়বৃত্তির দ্বারা।

৫. বাংলা ছেলেভুলানো ছড়ার সঙ্গে গ্রাম্য বাংলা রূপকথার অসংবদ্ধ চিত্রাবলীর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা উভয় মৌখিক সাহিত্যই শিশুভোগ্য।

৬. রূপকথার গল্পগুলি লক্ষ করলে দেখা যায় গল্পগুলির সূচনাভাগ প্রায় একইরকমের। অতি সাধারণ এক বিবৃতি দিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। যেমন– 'এক যে ছিল রাজা' কিংবা 'এক দেশে এক রাজা ছিল' ইত্যাদি।

৭. আখ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে দুটি প্রচলিত রীতির কথা বলেছেন বিশেষজ্ঞরা– 'এরপর কী হল' এবং 'কেন এমন হল'। তবে রূপকথাতে দ্বিতীয় রীতি অনুসরণ করা হয়।

১৬.৮ রূপকথা ও ছোটগল্প

আধুনিক ছোটগল্পের শিল্প-বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে রূপকথাকে বিচার করলে একথা বলতেই হয় ছোটগল্প কখনই রূপকথা নয়। তবে আধুনিক ছোটগল্পের নানামাত্রায় রূপকথার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রয়োগ

আধুনিক ছোটগল্পের বিষয়বিন্যাস ও ব্যঞ্জনাধর্মিতার গুণে নতুন হয়ে ওঠে। তখন রূপকথা শুধুমাত্র রূপক বা নীতিকথায় আবদ্ধ না থেকে আধুনিক ছোটগল্পের বহুমাত্রিকতার একটি কৌশল হিসাবে বর্ণিত হয়। রূপকথা আধুনিক ছোটগল্পের সঙ্গে অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে– আধুনিক দৃষ্টিকোণের সম্পৃক্তিতে, মনস্তাত্ত্বিকতার যৌক্তিকতায় এবং বহুমুখী সন্দর্ভ রচনার আধুনিক দৃষ্টিকোণে। অর্থাৎ রূপকথার রূপক এবং নীতিকথা আধুনিক গল্প নিজ দেহে স্বীকরণ করে নিয়েছে আধুনিকতার মানদণ্ডে। উদাহরণ স্বরূপ আধুনিককালের অন্যতম গল্পকার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'এলাটিং বেলাটিং সই লো' গল্পটির কথা স্মরণ করা যায়। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি আধুনিক ছোটগল্প রূপকথাকে স্বীকার করে নিল আপন রঙে রাঙিয়ে। স্বতন্ত্র রূপকথার ক্ষেত্রে এটি সম্ভবপর নয়। পরিশেষে একটি কথা বলার, আধুনিক ছোটগল্পে রূপকথার প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু রূপকথা কখনই ছোটগল্প নয়।

১৬.৯ একটি রূপকথা পর্যালোচনা

'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা 'রূপকথাটি আলোচনা করা যাক– গল্পটিতে দেখি এক রাজপুত্রের সঙ্গে এক রাখাল ছেলের বন্ধুত্ব। রাজপুত্র সেই রাখাল বন্ধুকে কথা দেয় যদি সে রাজা হয় তাহলে তাকে মন্ত্রী করবে। কিন্তু দেখা যায় রাজপুত্র রাজা হয়ে কাঞ্চনমালাকে বিয়ে করে বন্ধুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে গেল। এই অপরাধে রাজার জীবনে ভাগ্যবিপর্যয় নেমে এল। তার দেহে সর্বত্র সূঁচ দেখা দিল। রাজা বসতে, খেতে, শুতে কিছুই পারে না। সর্বদা অস্বস্তি আর যন্ত্রণা। একদিন নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়েছে রানী। স্নান করছে সব পোষাক খুলে। তার দাসী কাঁকনমালা সেই ফাঁকে রানীর পোশাক ও অলংকার পরে নিয়ে নিজেই হল রানী, আর রানীকে করল দাসী। এরপর থেকে আসল রানী মনের দুঃখে দিন কাটায় আর প্রকৃত দাসীটি রাজসুখ ভোগ করে। গল্পে এরপরেই আবির্ভূত হয়েছে 'মিডিয়েটর', যার সহায়তায় রাজা ও কাঞ্চনমালার জীবনে আবার সৌভাগ্যের উদয় ঘটেছে। কাঞ্চনমালা একদিন নদীতে গিয়েছে। নদীর তীরে একজন মানুষকে প্রচুর সুতো নিয়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে জানল সে তার সুতোর জন্য প্রচুর সূঁচ চায়। রানী তাকে রাজপুরীতে ডেকে নিয়ে এলে কাঁকন যে এই রাজবাড়ির দাসী, প্রকৃত রানী নয়, সেটা বুঝতে লোকটির সময় লাগল না। তখন সে তার মন্ত্রঃপূত সূতোকে নির্দেশ দিল রাজার শরীর থেকে সূঁচ উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে যেন কাঁকনের চোখ-মুখ সেলাই করে দেয়। মুহূর্তে রাজার শরীর থেকে সব সূঁচ উঠে গেল। রাজা নিজের দোষ স্বীকার করে নিল এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো রাখাল বন্ধুকে মন্ত্রী করে কাঞ্চনমালাকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগল। এই রূপকথাটি একটু অন্য ধরনের। কাহিনিতে নীতিকথার মৃদু ছোঁয়া আছে বলে মনে হয়। প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা না করলে যে অপরাধ হয়, মানুষের ভাগ্যবিপর্যয় তার সাথে জড়িত।

১৬.১০ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ছোটগল্পের কাহিনি-বিন্যাসের ত্রিবিধ পদ্ধতি কী কী?

২. হেনরি জেমসের মতে ছোটগল্পের শব্দ সংখ্যা কত হবে?

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' গল্পটি সূচনা অংশে কোন রীতিতে লেখা?

৪. বাংলা রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক কে?

৫. 'ফোকটেল অফ বেঙ্গল' গ্রন্থটির সংকলক কে এবং কত সালে প্রকাশিত?

৬. 'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থটি ভূমিকা কে লেখেন এবং কার অনুরোধে লেখেন?

৭. দুটি রূপকথা বিষয়ক গ্রন্থের নাম লেখো।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. ছোটগল্পের আঙ্গিক বিচার করো।

২. রূপকথার সংজ্ঞা-স্বরূপ আলোচনা করো।

৩. রূপকথার বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে লেখো।

৪. রূপকথা ও ছোটগল্প বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৫. রূপকথার সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়ে একটি রূপকথা পর্যালোচনা করো।

১৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা ছোটগল্পের তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি– সোহরাব হোসেন

২. সাহিত্য প্রকরণ– হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৩. সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ– কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

৪. সাহিত্যের রূপভেদ: রূপরীতি নির্ণয়– সুধাংশুশেখর মণ্ডল

৫. সাহিত্যে ছোটগল্প– নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৬. লোককথার সাতকাহন– সম্পাদনা বরুণকুমার চক্রবর্তী

৭. বাংলা ছোটগল্প– শিশির দাশ

৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত– অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৯. বাংলার রূপকথা– দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

একক ১৭ ❑ অণুগল্প

গঠন

১৭.১ উদ্দেশ্য

১৭.২ প্রস্তাবনা

১৭.৩ অণুগল্পের উদ্ভব

১৭.৪ অণুগল্প: সংজ্ঞা

১৭.৫ অণুগল্পের বৈশিষ্ট্য

১৭.৬ অণুগল্প ও ছোটগল্পের পার্থক্য

১৭.৭ অণুগল্পের দৃষ্টান্ত

১৭.৮ একটি বাংলা সার্থক অণুগল্প

১৭.৯ একটি সার্থক অণুগল্প পর্যালোচনা

১৭.১০ প্রশ্নাবলী

১৭.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১৭.১ উদ্দেশ্য

সাহিত্যের নবীনতম রূপরীতি হল অণুগল্প। এই এককের উদ্দেশ্য হল– অণুগল্প কী এবং কীভাবে উত্তরাধুনিক যুগের সাহিত্যে এল তা দেখানো এবং সেইসঙ্গে অণুগল্প সম্পর্কে অনুশীলন ছাত্র-ছাত্রীরা এই একক পাঠে পাবে।

১৭.২ প্রস্তাবনা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই বদলায়। সাহিত্যও ব্যতিক্রম নয়। সাহিত্যও বদলায় রূপরীতির ধরনে। যেমন উপন্যাস থেকে ছোটগল্প আর ছোটগল্প থেকে অণুগল্প। আলোচ্য এই এককে অণুগল্প সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, প্রস্তাবনা অংশে সংক্ষেপে সেই প্রসঙ্গে দুই-একটি কথা বলব–

১. অণুগল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে এই শ্রেণির গল্পের মূল আকর্ষণীয় জায়গাটা কোথায়।

২. অণুগল্প ও ছোটগল্পের পার্থক্য কোথায় তা যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক একইভাবে অণুগল্পের বিশেষত্ব কোথায় তা বোঝানো হয়েছে একটি অণুগল্পের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে।

১৭.৩ অণুগল্পের উদ্ভব

যান্ত্রিক মনে অস্থিরতার পারদ থাকে শীর্ষে। ব্যস্ততা মানুষকে গ্রাস করে ক্ষণে ক্ষণে। দ্রুততার দৌড়ে জীবন কণ্টকময়। চায় অতিদ্রুত রিলের মতো স্ফূর্তি। আর এই চরমতম অবস্থার রূপ দেখা যায় এই নতুন শিল্প মাধ্যমে। ঈশপের বা তলস্তয়ের গল্পগুলোকে অণুগল্পের পূর্বপুরুষ বললে ভুল হবে না। যদিও তাঁরা তাঁদের মতো করে গল্পকে উপস্থাপন করেছেন। তবে সেখানে হালকা বর্ণনায় কাহিনিগুলি নীতিকথায় উপস্থাপিত হয়েছে। তবে ধীরে ধীরে অণুগল্প রূপ নিল প্রতীকী ভাবধারায়। তখন থেকেই অণুগল্পের পথচলা। বাংলা সাহিত্যে খাঁটি অণুগল্পের জন্মদাতা বনফুল। উপন্যাস যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তখন ছোটগল্প নির্মাণের পথচলা শুরু হয়। অতি ব্যস্ততার কারণে মানুষ স্বল্প পরিসরে শিল্প মাধ্যমের স্বাদ নিতে আগ্রহী হয় এবং খুব অল্পসময়ের মধ্যেই তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে বিশ্বসাহিত্যে। আধুনিককালে গল্পের আয়তন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে এক নতুন শিল্প মাধ্যমের জন্ম দিল। যা বাংলা সাহিত্যে অণুগল্পের আসন পেল। যেমন উপন্যাসকে ছোট করে উপন্যাসিকা, আরও ছোট করে বড় গল্প, আরও ছোট করে ছোটগল্প, আরো ছোট করে অণুগল্প। এভাবে আয়তনের মধ্যে ফেলে কোনও সাহিত্যের শিল্পরূপ মূল্যায়ন করা যায় না; শুধু নামকরণ ছাড়া।

অণুগল্পকে অনেকে মিনিগল্প বা ক্ষুদ্রগল্প বলে পরিসরে ছোট করে এক ধরনের কাহিনি তৈরি করে থাকেন যা নিশ্চয়ই অণুগল্প নয়। কারণ অণুগল্পের মধ্যে শিল্পরূপ থাকা আবশ্যক। অণুগল্প বানান প্রায় অনেকেই ভুল লেখেন। অর্থাৎ তারা লেখেন অনুগল্প। অনু হলো উপসর্গ। উপসর্গের অর্থ থাকে না কিন্তু অনুর অর্থ আছে। অনু অর্থ অনুরূপ বা পশ্চাৎ বা পেছন। সেক্ষেত্রে অনুগল্প অর্থ পেছনের গল্প। বানানের দিক দিয়ে হবে অণুগল্প। অণু অর্থ সূক্ষ্মতম। অণুকে যখন বীক্ষণ অর্থাৎ বিশেষভাবে দর্শন বা পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন হয় অণুবীক্ষণ; এটি যে যন্ত্রের মাধ্যমে করা হয় সেটি হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র। তাই অণুগল্প যে অর্থ বহন করে সেই অর্থ মিনিগল্প বহন করে না। গল্প ছোট করলে মিনিগল্প হতে পারে তবে অণুগল্প হতে পারে না। অণুগল্প উদ্ভবের কয়েকটি কারণ সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে–

১. ব্যস্ত জীবনে ক্ষণিকেই শিল্পরূপ আস্বাদনের জন্য অণুগল্পের জন্ম।

২. যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের ধৈর্যশক্তিকে হ্রাস করছে।

৩. আধুনিক বিশ্বে মনোগ্রাহী সাহিত্য পাঠকের সংখ্যা কমছে।

৪. অণুগল্প খুব সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে।

বিশ্বসাহিত্যের 'ফ্লাশ ফিকশন'ই বাংলায় অণুগল্প নামে পরিচিত। কয়েকটি শব্দে লেখা এমন অনেক গল্প আছে পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের যা পড়া শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার একটি রেশ পাঠকের মনে থেকে যায় । মার্কিন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে পৃথিবীর

সবচেয়ে ছোটগল্পটির লেখক। তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারও পান, ১৯৫৪ সালে। মাত্র ৬ টি শব্দে লেখা তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গল্পটি হল– "For sale. Baby shoes. Never worn." অর্থাৎ "বাচ্চার জন্য জুতো কেনা হয়েছিল, কিন্তু সেই বাচ্চাটি পৃথিবীর আলোই দেখেনি।" গল্পটির ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে, মা আর্তনাদ করছে কেননা তার গর্ভের সন্তান মারা গেছে।

১৭.৪ অণুগল্পের সংজ্ঞা

পৃথিবীর যে-কোনো শিল্পরূপের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কারণ শিল্পকে কোনো সংজ্ঞার মধ্যে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তবুও শিল্পের জন্মলগ্ন থেকেই কেউ-না-কেউ কোনও-না-কোনও সমালোচক শিল্পের সংজ্ঞা দিয়ে এসেছেন। তাকে বাঁধতে চেয়েছে বাঁধনহীনভাবে। এই অণুগল্পেরও সংজ্ঞা বাঁধনহীন পথে বেঁধে দেওয়া যায়। পৃথিবীতে অণুগল্পের অস্তিত্ব সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলেছে। সন্ধ্যাভাষার মতো অস্পষ্ট আলো-আঁধারির মায়াভুবনে অখণ্ড দেহকান্তি নিয়ে অণুগল্প সতত বিরাজমান। অণুগল্প এক আশ্চর্য বস্তু। এমন ছোট, অথচ দানবীয় শক্তির আধার। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ভেতরে কতখানি লুকায়িত আছে– বলা মুশকিল। কতখানি আগুন অণুগল্প ধারণ করে বসে আছে;ভাবতেই শিহরিত হতে হয়। চিন্তায় মননে দাবানল লাগাতে এর জুড়ি মেলা ভার। অণুগল্পের প্রতিটি শব্দ-বাক্য এমন কি যতি চিহ্ন পর্যন্ত একেকটি অগ্নিকণার ভূমিকা পালন করে। অণুগল্পকে মানব-ভ্রূণের সঙ্গে তুলনা করে বলা যেতে পারে– অণুগল্প হল, "মানব-ভ্রূণের প্রথম পর্ব। ভ্রূণের তিন-চার মাস পর্যন্ত বয়সকে অণুগল্পের সঙ্গে উপমিত করা যায়। ভ্রূণের এ-পর্বে যেমন এটিকে মানব বলে মনে হয় না অথচ মানব-জীবনের সবকিছুই এখানে বীজকারে নিহিত থাকে অণুগল্পের শিল্পরূপটিও তাই।" এই প্রসঙ্গে অণুগল্পকে মনোরঞ্জিত করে বলা যেতেই পারে অণুগল্প হল– সাম্প্রতিককালের T-20 ক্রিকেটের সেই উত্তেজিত রহস্যমণ্ডিত সুপার ওভার। আবার আমার কাছে অণুগল্প হচ্ছে অনুভূতির পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার মতো। পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার সাথে সাথে প্রথম যে ছোট্ট বৃত্তটি তৈরি হয় তা হল– অণুগল্প। তারপর বৃত্তের বাইরে একের পর এক বড়ো বৃত্ত তৈরি হয়। যা পাঠকের মন অণুগল্পের ভেতরের গল্পগুলো নিয়ে নিজের মধ্যে ভাবনার বড়ো বড়ো বৃত্ত সৃষ্টি করে।

১৭.৫ অণুগল্পের বৈশিষ্ট্য

অণুগল্পের বৈশিষ্ট্য গুলো হল–

১. অল্পের মাত্রা মাত্রাধিক। অর্থাৎ অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে অল্প কথায় অনন্য সৃষ্টি।

২. অণুগল্পে কোনও গল্প থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। তবে অণুগল্পে চমক থাকে।

৩. অনুভূতি ও ভাব-ভাবনার চমকপ্রদ উপস্থাপনে সময় বা ঘটনার অংশবিশেষের প্রতীকি কথাচিত্র।

৪. অতি ছোট কাহিনিকে রূপকের মোড়ে গড়ে তুলতে হবে।

৫. একটা বড়ো গল্প-ভাবনাকে চুম্বকে পরিণত করতে হবে। খুব ছোট আয়তনে ছোট গল্পের সব মাধুর্য এতে থাকবে।

৬. অণুগল্পে শুরু ও শেষে আকস্মিকতা লক্ষ করা যায়।

৭. বিশেষ চরিত্রের ওপর আলোকপাত করা, স্বল্প চরিত্র, ঘটনার বাহুল্য না থাকা, তত্ত্ব-উপদেশ একেবারেই নয়।

৮. কাহিনি একমুখী, অন্তরে অতৃপ্তিবোধ এবং চূড়ান্ত ব্যঞ্জনা থাকে।

৯. অণুগল্পের প্রতিটি লাইনে কাব্যময়তার ছাপ থাকে। অর্থাৎ অণুগল্পের বাক্য কবিতার মতো শক্তিশালী, দৃঢ় ও অলংকারময় অর্থাৎ উপমা ও চিত্রকল্পময়। অণুগল্প গদ্য হলেও উপস্থাপন কাব্যিক, ব্যঞ্জনাময়, রূপক বা প্রতীকী ও চিত্রকল্পময়।

১০. অণুগল্পের পরিধি বা আঙ্গিক ক্ষুদ্র অথচ বক্তব্য পূর্ণাঙ্গ, তাৎপর্যপূর্ণ ও বিস্তর অর্থপূর্ণ।

১১. মুহূর্তকে সুচারুভাবে উপস্থাপন করা অণুগল্পের বিশেষ দিক।

১২. অণুগল্পে বিনোদন বা হাস্যরসের সামান্য উপস্থিতি থাকলেও এই ধরনের গল্প সাধারণত মনন বা বোধের জায়গা দখল করে থাকে। এ-জাতীয় গল্পে বিনোদন অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ করে বেশি।

১৩. অল্প পরিসরে বোধের বিশালতাকে ধরার একটি মাধ্যম অণুগল্প।

১৪. জীবনের খণ্ডছবি উঠে আসে অণুগল্পে।

১৫. অণুগল্পে শব্দ সংখ্যা অল্প হওয়ায় বর্ণনার বাহুল্য নেই।

১৬. কিছু না-বলা কথা উহ্য রেখে এক দারুণ রহস্যের জগৎ সৃষ্টি করে পাঠকের মনে।

১৭. অণুগল্পের অপ্রাপ্তি পাঠক গল্প পাঠ করার পর নিজের মত করে অর্থ খুঁজে নেবে।

১৮. অণুগল্প পাঠক চিত্তকে আলোড়িত করে ভীষণভাবে।

১৭.৬ ছোটগল্প ও অণুগল্পের পার্থক্য

ছোটগল্প ও অণুগল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। সেগুলি হলো–

১. ছোটগল্প ছোট হবে, কিন্তু অণুগল্প হবে অতি সংক্ষিপ্ত। সাধারণত ছোটগল্প লেখা হয় কয়েক পৃষ্ঠায় অন্যদিকে অণুগল্প কয়েক'শ শব্দে।

২. ভাবনার সূক্ষতা ছোটগল্প অপেক্ষা অণুগল্পে গভীর।

৩. ছোটগল্পে কাহিনি বিস্তারের সামান্য অবকাশ থাকলেও অণুগল্পে সে সুযোগ থাকে না। অর্থাৎ ছোটগল্পে কাহিনি বিন্যাস স্পষ্ট ও বিস্তৃত বর্ণনায় বিন্যস্ত করতে হয়। যাতে পুরো ঘটনার সঠিক বিবরণ তুলে ধরা যায়। কিন্তু অণুগল্পে কাহিনি বিশেষ অভিঘাতে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণে তুলে ধরা হয়। তার সাথে জীবনদর্শনের সঠিক স্বচ্ছ ও স্পষ্ট অথচ যতটা সম্ভব নিটোল রাখতে হয়।

৪. 'শেষ হয়েও হইল না শেষ' ছোটগল্পের মূলকথা, অণুগল্প এই মুহূর্তকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে পাঠকের চিত্তকে নাড়া দেয়।

৫. ছোটগল্পের মধ্যে বহুরৈখিক মাত্রা সংযোজিত হতে পারে কিন্তু অণুগল্প মূলত একরৈখিক, বহুমাত্রা সংযোজনার কোনও অবকাশ থাকে না।

১৭.৭ অণুগল্পের দৃষ্টান্ত

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অণুগল্প অসংখ্য। কয়েকটি অণুগল্প এখানে উল্লেখ কত্রা হল– বনফুলের 'নিমগাছ', গৌতম রায়ের 'আকাশ অবশ্যই সূর্যের চেয়ে বড়', কৌশিক দের 'তেপান্তর', মাহবুব লীলেনের 'তৃষ্ণা', জাহিদ হোসেনের 'বাথটবে একা', মাহবুব আজাদের 'হাতিসোনা' প্রভৃতি।

১৭.৮ একটি সার্থক বাংলা অণুগল্প

নিমগাছ

বনফুল

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।
পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।
কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।
খোস দাদ হাজা চুলকুনিতে লাগাবে।
চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।
কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।
এমনি কাঁচাই....
কিংবা ভেজে বেগুন- সহযোগে।
যকৃতের পক্ষে ভারী উপকার।
কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক.....। দাঁত ভালো থাকে।
কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুসী হন।
বলেন-"নিমের হওয়া ভাল, থাক, কেটো না।"
কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।
আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।

শান দিয়ে বাধিয়েও দেয় কেউ- সে আর এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরণের লোক এল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙ্গলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠলো, ''বাঃ কি সুন্দর পাতাগুলো....কি রূপ। থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার....এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে।

বাঃ,''

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ীর গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষী বউটার ঠিক এই দশা।

১৭.৯ একটি সার্থক বাংলা অণুগল্প পর্যালোচনা

আলোচ্য অণুগল্পটি হল বনফুলের (১৮৯৯-১৯৭৯) 'নিমগাছ'। গল্পটি 'অদৃশ্যলোক' (১৯৪৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'নিমগাছ' গল্পটি পড়লে বোঝা যায় লেখক নিমগাছের বাহ্যিক উপকারিতার পাশাপাশি এক গভীর সত্যের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। আপাতভাবে গল্পে দেখা যায় নিমগাছের বর্ণনা, এর পাতা, বাকল, ছায়া ইত্যাদির বাহ্যিক উপকারিতা। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে নিমগাছকে ব্যবহার করছে। কবিরাজ যেমন তার চিকিৎসার কাজে, সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নিমগাছকে অনবরত ব্যবহার করে থাকে। অথচ কেউ এই গাছের প্রতি সামান্যও যত্নশীল নয়। যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণই আয়োজন। গল্পের মোড়ে একজন কবির আবির্ভাব। তিনি নিমগাছের বাহ্যিক প্রয়োজনীয়তাকে তুচ্ছ করে নিমগাছের গুণ ও রূপের প্রশংসা করেন। নিমগাছটির প্রতি কবির সহানুভূতির দৃষ্টি এবং সেই দৃষ্টির প্রতি মুগ্ধ হয়ে কবির সাথে চলে যেতে চাইল কিন্তু পারল না। কেননা মাটির গভীরে তার শিকড়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে।

লেখক নিমগাছের আড়ালে যেন ও-বাড়ির বউয়ের কথা বলে গেলেন। নিমগাছটিই ও-বাড়ির বউ। নিমগাছ যেমন উপকারী, প্রয়োজনের সঙ্গী ঠিক তেমনই ও-বাড়ির বউটিও উপকারী, প্রয়োজনে প্রিয়জন। নিমগাছকে যে যার মতো করে যেমন ব্যবহার করে ঠিক একইভাবে বউটিকেও যে যার মতো করে ব্যবহার করে, অন্য কোনও খোঁজ খবর নেয় না। নিমগাছটির মতোই বাড়ির প্রতি তার ভালোবাসা-দায়দায়িত্বর শিকড় গভীর থেকে গভীরতর। ফলত গাছটির মতো সেও যেতে পারে না। আসলে এই গল্পের শেষ বাক্যটিই অসীমতার বাণী শুনিয়ে যায়। যেখানে লেখক কথা না বলেই সীমাহীন কথার আখ্যান রচনা

করেছেন। যার ফলে ফুটে উঠেছে প্রতীকী-রূপক বা চিত্রকল্প। গল্পের শেষে যদি নিমগাছের পরিবর্তে ‘ও-বাড়ির বউটির’ উল্লেখ না থাকত তাহলে কোনোভাবেই গল্পটি অণুগল্প হত না। অল্প কথায় গভীর বক্তব্য উপস্থাপনের যে পরিচয় লেখক দক্ষতার সঙ্গে দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

১৭.১০ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. অণুগল্প কী?

২. অণুগল্পের ইংরেজি কী?

৩. অণুগল্প উদ্ভবের দুটি কারণ লিখুন।

৪. পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট অণুগল্পের লেখক কে?

৫. চারটি অণুগল্পের নাম লিখুন।

৬. ছোটগল্প ও অণুগল্পের দুটি পার্থক্য লিখুন।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. অণুগল্পের সংজ্ঞা-স্বরূপ আলোচনা করে, তার বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্তারিত লিখুন।

২. ছোটগল্প ও অণুগল্পের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

৩. অণুগল্পের উদ্ভব ও তার কারণ আলোচনা করে একটি অণুগল্পের ব্যাখ্যা করুন।

১৭.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা ছোটগল্পের তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি– সোহরাব হোসেন

২. সাহিত্য প্রকরণ– হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৩. সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ– কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

৪. সাহিত্যের রূপভেদ: রূপরাতি নির্ণয়– সুধাংশুশেখর মণ্ডল

৫. সাহিত্যে ছোটগল্প– নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৬. অণুগল্পের অস্তিত্ব আছে– বিলাল হোসেন

৭. অণুগল্পের উৎস ও গতিপ্রকৃতি– শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮. বাংলা ছোটগল্পে বাস্তবতাবোধের বিবর্তন– সোহরাব হোসেন

কোর কোর্স ১০
মডিউল ৩
(প্রবন্ধ ও সমালোচনা)

একক ১৮ ❑ বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ, ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ

গঠন

১৮.১ উদ্দেশ্য

১৮.২ প্রস্তাবনা

১৮.৩ প্রবন্ধের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ

১৮.৪ প্রবন্ধের উদ্ভব ও বিস্তার

১৮.৫ প্রবন্ধের শ্রেণিভেদ

১৮.৫.১ বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ

১৮.৫.২ ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ

১৮.৬ সারাংশ

১৮.৭ অনুশীলনী

১৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১৮.১ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করলে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন।
- এই পাঠের উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কে
- আলোকপাত করা।
- এই এককে প্রবন্ধের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা পাবেন।
- বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের উল্লেখযোগ্য বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১৮.২ প্রস্তাবনা

প্রবন্ধচর্চা একালে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এই সাহিত্যিক প্রকরণটির চর্চা নিতান্ত আধুনিক নয়। এর সুদীর্ঘ ধারাবাহিক ঐতিহ্য আছে। এই এককে তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের প্রবন্ধ রচনার কিছু উদাহরণসহ আলোচনা

করা হয়েছে। প্রবন্ধের শ্রেণিবিভাগ করে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের লক্ষণ, তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে এই এককে। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের সম্পর্কে আপনারা অবহিত হবেন।

১৮.৩ প্রবন্ধের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ

গদ্য সাহিত্যে প্রবন্ধের একটি বিশেষ স্থান আছে এই বিষয়ে সকলেই একমত। সাধারণত ইংরেজি 'Essay' শব্দের প্রতিশব্দরূপে বাংলায় 'প্রবন্ধ' শব্দটি বর্তমানে প্রচলিত। প্রাচীন প্রয়োগে 'প্রবন্ধ' শব্দটির অর্থ ছিল 'উপায়' বা 'ব্যবস্থা'। সংস্কৃত ভাষায় 'প্রবন্ধ' তথা 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন' বলতে বোঝাতো ছন্দের বন্ধন, বিষয়ের রূপ-বন্ধন, সর্গ/পর্ব অধ্যায়াদির বন্ধন, রচনাক্রমের পারম্পর্য ইত্যাদি এবং সাহিত্যের সব শাখাতেই প্রবন্ধের চল ছিল।

এখন তাহলে প্রবন্ধ বলতে কেমন ধরনের রচনাকে নির্দেশ করা হয়? মোটের ওপর যে-কোনো বিষয় নিয়ে লেখা নাতিদীর্ঘ সাহিত্যিক গদ্যরচনাকেই প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে, যদিও এবিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ড. স্যামুয়েল জনসন তাঁর অভিধানে (১৭৫৫) প্রবন্ধ বলতে এক জাতীয় শিথিল ও অনিয়মিত রচনার কথা বলেছিলেন– " a loose sally of the mind– an irregular– indigested piece–not a regular and orderly performance. অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে প্রদত্ত সংজ্ঞায় প্রবন্ধের নাতিদীর্ঘ রূপ, বিষয়ের অনির্দিষ্টতা ও জনসন নির্দেশিত শৃঙ্খলা ও গঠন-শৈথিল্যর কথা বলা হয়েছে– "A composition of moderate length on any particular subject or branch of a subject, originally implying want of finish, 'an irregular, indigested piece', but now said of a composition more or less elaborate in style, though limited in range." ড. জনসনের সংজ্ঞাকে মূলত না-বাচক বলে মনে করেছেন Hugh Walker– তাঁর মতে, প্রবন্ধের স্বভাবই হল কিছুটা অনিশ্চিত, অসম্পূর্ণতা "Something tentative, so that there is a justification for the conception of incompleteness and want of system." হাডসন তাঁর মন্তব্য প্রবন্ধের স্বল্প পরিসর গঠন ও সমগ্রতার অভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন– "The essay, then, may be regarded roughly as composition on any topic, the chief negative features of which are comparative brevity and the comparative want of exhaustiveness."

ম্যাথু আর্নল্ড প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষণরূপে উল্লেখ করেছেন রচনার যথার্থতা, ভারসাম্য রক্ষা, অন্তর্মুখিতা, ভাবগভীরতা, সরলতা প্রভৃতি কথা। শশীভূষণ দাশগুপ্তের বিচারে 'কোনো অংশ বা উপাদান যখন কোনো একটি প্রকৃষ্ট বন্ধনের ভিতর দিয়া পরস্পর অন্বিত হইয়াছে এবং একটি সমগ্রতা লাভ করিয়াছে তখনই তাকে প্রবন্ধ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে'। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, প্রবন্ধকে সংজ্ঞায়িত করা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন ও তর্কসাপেক্ষ প্রচেষ্টা। সাধারণভাবে বলা যায় লেখকের ভাবনা-অভিজ্ঞতা-মন-মননের প্রত্যয় দ্বারা যথাযথভাবে চিহ্নিত এবং তাঁর রসবোধে জারিত যে-কোন বিষয় নিয়েই প্রবন্ধ রচনা করা যেতে পারে। গুরুগম্ভীর কিংবা হালকা পরিহাসমণ্ডিত, গভীর ভাবোদ্দীপক কিংবা নিছক বস্তুগত কোনো বিষয়, কোনো সর্বজনীন প্রসঙ্গ বা সমস্যা কিংবা ব্যক্তিগত অভিনিবেশ, যে-কোনো কিছুই প্রবন্ধের বিষয়

হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ, প্রবন্ধকারের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষাশৈলী রচনাকে স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়। সাধারণত প্রবন্ধ ক্ষুদ্রায়তন গদ্যরচনা, তবে সবক্ষেত্রেই আয়তনের স্বল্পতা প্রবন্ধের শর্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে না। হিউমের 'A Treatise of Human Nature' - কে যদি প্রবন্ধ না বলি, তাহলে লকের 'An Essay Concerning Human Understanding'-কে কী বলা হবে? প্লেটোর 'Dialogues', সিসেরোর 'De Senectute', ড্রাইডেনের সমালোচনামূলক 'Essay on Dramatic Poesy', পোপের নীতিমূলক কাব্য 'An Essay on Criticism' ও পত্রকাব্য 'Esaay on Man', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র', 'কমলাকান্তের দপ্তর', রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থভুক্ত ধর্মসম্বন্ধীয় লেখাগুলোকে 'প্রবন্ধ' নাম দিলে, তার আয়তন, বিষয় ও রূপবন্ধের বিভিন্নতাও স্বীকার করতেই হয়।

এই সাহিত্যিক প্রকরণটির কয়েকটি লক্ষণ চিহ্নিত করা যেতে পারে–

১) গদ্যই প্রবন্ধশিল্পের স্বাভাবিক মাধ্যম, যদিও পদ্যেও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে।

২) যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদির আশ্রয়ে প্রবন্ধের প্রাথমিক লক্ষ্য তত্ত্ব ও তথ্যের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার।

৩) যুক্তি-তত্ত্ব-তথ্য এই ধরণের লেখার প্রাণসম্পদ। সঙ্গে থাকতে হবে যৌক্তিক পারম্পর্য তথা বিশ্লেষণী ঋজুতার সঙ্গে কল্পনা ও আবেগের প্রয়োগ

৪) বিষয় উপস্থাপনে বৈচিত্র্য থাকা দরকার।

১৮.৪ প্রবন্ধের উদ্ভব ও বিস্তার

প্রাচীনকালে গ্রিসে ও রোমে প্রবন্ধধর্মী চর্চা করেছিলেন থিওফ্রাসটাস, প্লুতার্ক (Plutarch), সিসেরো এবং সেনেকা। অনেকেই ফরাসি লেখক মিচেল মঁতেঁইকে (Michel de Montaigne) প্রবন্ধের জনক বলে মনে করেন। ষোড়শ শতকে মঁতেঁই তাঁর 'Essais' (1580) গ্রন্থের শিরোনামে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন 'essai' বা 'attempt', অর্থাৎ 'প্রয়াস', এই মূলগত অর্থে। মঁতেঁই- এর নির্দেশিত অর্থে ও রূপনীতিতে 'প্রবন্ধ'- কে প্রথম ইংরেজি ভাষায় প্রচলন করেন ফ্রান্সিস বেকন, তাঁর তিনটি সংস্করণে প্রকাশিত 'Essays' গ্রন্থে। প্রাচীন সাহিত্যে যে-কোনো উৎকৃষ্ট রচনাকে বলা হয়েছে প্রবন্ধ– যেমন, নাট্যপ্রবন্ধ, পয়ারপ্রবন্ধ, লাচাড়ীপ্রবন্ধ প্রভৃতি।

সংস্কৃত, গ্রিক ও লাতিন ভাষায় গদ্যরচনা অনেককাল থেকে হয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে লাতিন ভাষায় ধর্ম-সংক্রান্ত বহু লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়। রেনেসাঁসের সময়ে আর তার পরবর্তী সময়ে ইউরোপে যখন ছাপাখানায় কাজ শুরু হয়, তখন থেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মকেন্দ্রিক নানান লেখা দেশীয় ভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হতে থাকে। আমাদের দেশেও পন্ডিতেরা নানাগ্রন্থের আলাপ-আলোচনা, টীকা-টিপ্পনী লিখেছেন গদ্যাকারে। একটা সময় পর্যন্ত যে গদ্য শুধু চিঠিপত্র-দলিল-দস্তাবেজ লেখায় সীমাবদ্ধ ছিল, তারই এই আমূল পরিবর্তন দেখা যায় ঊনবিংশ শতকে এসে। যখন বলিষ্ঠ ভাব ও ভাবনায়

প্রবন্ধ লেখা শুরু হয়। যদিও বিশ্বসাহিত্যে কবিতাকারে লেখা প্রবন্ধের অভাব নেই– Plato-র কথোপকথন, Pliny আর Seneca-র পত্রাবলি, Pope- এর 'Essay on Man', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলাকাব্য', সতেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' প্রভৃতি।

বাংলা ভাষায় প্রবন্ধের সূচনা শ্রীরামপুর মিশনের ধর্মযাজকদের হাতে। বাংলা সাহিত্যে গদ্য ব্যবহারের সূচনা আর প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্ম প্রায় একইসঙ্গে ঘটেছিল। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' পত্রিকা, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ছাপা জ্ঞানগর্ভ, নীতিমূলক রচনা বাংলায় প্রবন্ধ রচনার আদিযুগের নিদর্শন হয়ে আছে, তবে সেগুলোর সাহিত্যমূল্য বিশেষ ছিল না। কেরি, মার্শম্যান, রবিনসন প্রমুখ মিশনারিরা ধর্ম ও শিক্ষা বিষয়ে তর্ক ও বিতণ্ডামূলক বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর অন্যতম মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ও 'বেদান্তচন্দ্রিকা'-তে প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাকরূপ লক্ষ করা গেছিল। তবে তথ্যের যথাযথ সমাবেশ, যুক্তির শৃঙ্খলা ও চিন্তার বলিষ্ঠতা বাংলা প্রবন্ধে প্রথম রামমোহন রায়ের লেখাতেই পাওয়া যায়। 'বেদান্তসার', 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের সম্বাদ' ইত্যাদি রচনা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে মননশীলতার পাশাপাশি ঋজু, বলিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ করেছিল। রামমোহনের পরবর্তীকালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ন বসুর হাতে নবযুগ এসেছিল বাংলা গদ্যে। অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর চিন্তাশীলতা, যুক্তিনিষ্ঠা, ভাষার ওজস্বিতাকে চিনিয়ে দেয় সার্থকভাবেই। প্রথমদিকের বাংলা প্রবন্ধে ভাব ও ভাষায় সাহিত্যগুণের যে ঘাটতি ছিল, তারই উত্তরণ ঘটে বিদ্যাসাগরের রচনায়। তাঁর নির্মোহ জ্ঞানবাদের সঙ্গে অকুণ্ঠ মানবপ্রেম ও সংস্কারমূলক সংকল্প বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের সীমানাকে বহুদূর প্রসারিত করে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চন্দ্রনাথ বসু, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম দাশ প্রমুখ প্রাবন্ধিক বাংলা প্রবন্ধকে ঐশ্বর্যের স্বর্ণশিখরে বসিয়েছেন।

১৮.৫ প্রবন্ধের শ্রেণিভেদ

প্রবন্ধ সাহিত্যকে মোটের ওপর দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায় -

১) বস্তুনিষ্ঠ, তন্ময়, আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধ (Formal or Informative essay)

২) ব্যক্তিনিষ্ঠ, মন্ময়, ভাবপ্রধান প্রবন্ধ (Familiar/Personal or Intimate essay)

১৮.৫.১ বস্তুনিষ্ঠ, তন্ময়, আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধ (Formal or Informative essay)

সাহিত্যের যা চিরন্তন উদ্দেশ্য– সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দদান, প্রবন্ধেরও তাই উদ্দেশ্য, একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে তোলে। বিষয়মাত্রই চিরপুরাতন ও সীমাবদ্ধ ; ভঙ্গিই তাকে চলিষ্ণু প্রাণবান করে তোলে। প্রবন্ধ সাহিত্যের

বিচারে এই বিষয়বস্তুর ও প্রকাশের ভঙ্গিই মুখ্য। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করে যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখা হয়,সেগুলিকেই তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলে। এই শ্রেণির প্রবন্ধ একটি সুনির্দিষ্ট, সুচিন্তিত সীমারেখার মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত চিন্তা-প্রধান সৃষ্টি। এই ধরণের প্রবন্ধ বুদ্ধিপ্রধান ও তাতে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য। লেখক তথা বিষয়ীর ব্যক্তিত্ব, সেখানে বস্তুনিষ্ঠা ও আনুষ্ঠানিকতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যে আচ্ছাদিত। প্রবন্ধকার এখানে নিয়মনিষ্ঠ ও সংযত; তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-বুদ্ধিই পাঠকের মনোযোগ দাবি করে, পাঠক ও লেখকের মধ্যে কোনো হৃদয়ের সংযোগ ঘটে না। লেখক অধিকাংশ সময় তাঁর জ্ঞানের পরিধি দেখিয়ে আমাদের বিস্মিত করেন অথবা তাঁর অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতা বা বুদ্ধির প্রখরতায় বিস্মিত করেন। সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে কিংবা বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়ে তথ্যনির্ভর, যুক্তিগ্রাহ্য যে-সব প্রবন্ধ, পর্যালোচনা ইত্যাদি লেখা হয়ে থাকে সেগুলিই বস্তুনিষ্ঠ বা আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধের উদাহরণ। 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রচিত অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি-বিষয়ক রচনাগুলি নৈর্ব্যক্তিক, তন্ময় শ্রেণির প্রবন্ধের উদাহরণ। যথা–

'পদার্থবিদ্যা', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'জিজ্ঞাসা', 'বিচিত্রজগৎ' ইত্যাদি। বিশুদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধির প্রাধান্যে, চিন্তাঋদ্ধ মননশীলতায়, তথ্যনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণশক্তিতে এইসব রচনা জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনীষার শিল্পগুণান্বিত পরিচয়। বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ

১) যুক্তিনিষ্ঠা ও ভাবনার নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা থাকবে।

২) বিষয়টিই মুখ্য হবে, সঙ্গে তত্ত্ব ও তথ্যের লক্ষ্যণীয় প্রাধান্য থাকবে।

৩) প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভবের চেয়ে বস্তুনিষ্ঠা, মনন ও চিন্তাশীলতা প্রাধান্য পাবে।

৪) প্রাবন্ধিক নিঃস্পৃহ, নিরপেক্ষ থেকে বৈজ্ঞানিক তথা বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেবেন।

৫) ভাষা ব্যবহারে ঋজুতা ও সংযম থাকা প্রয়োজন। সুচিন্তিত ভাবে, নির্দিষ্ট পরিসরে, গম্ভীর ভাষার মাধ্যমে প্রবন্ধের বক্তব্য প্রকাশিত হবে।

৬) এই প্রবন্ধে লেখকের পাঠকের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ থাকলেও, আত্মিক যোগ থাকবে না। বরং একটি সুনির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে প্রবন্ধকার শিক্ষক বা পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করবেন।

বস্তুনিষ্ঠ/তন্ময় প্রবন্ধের শ্রেণিভেদ–

১) আলোচনা/ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ – কোনো একটি বিষয়ে নিবিষ্ট ও সুশৃঙ্খল আলোচনা, বিষয়বস্তুর রসগ্রাহী বিচার অপেক্ষা তার বস্তুরূপের অনুসন্ধানই এ ধরণের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। ইংরেজ দার্শনিক জন লকের 'Essay Concerning Human Understanding'– রোমান্টিক কবি শেলির 'The Defence Of Poetry', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর অন্তর্ভুক্ত 'দ্রৌপদী', 'লোকশিক্ষা' ইত্যাদি রচনা এই শ্রেণির তন্ময় প্রবন্ধের উদাহরণ।

২) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ– মূল বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহার, যুক্তিনির্ভরতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যে বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে অবলম্বিত হয়, তাকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বলে।

যেহেতু এই ধরনের প্রবন্ধর আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞান, তাই কোন ধরনের কল্পনা বা অনুমান এক্ষেত্রে স্থান পায় না। আলোচ্য বিষয়কে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য ও তত্ত্বই গুরুত্ব পায়। পরিভাষার প্রয়োগ প্রাধান্য যেন আলোচনাকে আড়ষ্ট না করে দেয়, সেদিকেও লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যে জেমস জীনসের প্রবন্ধগুলি এই শ্রেণির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলা ভাষায় অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার শুরু। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞানরহস্য', রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়', জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলী', 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি এই শ্রেণির প্রবন্ধের উদাহরণ।

৩) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ – সমকালীন অথবা প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলী অবলম্বনে তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে রচিত হয় ইতিহাস নির্ভর প্রবন্ধ। ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক প্রবন্ধের মধ্যে পার্থক্য হল, ইতিহাসে প্রাচীন কথার বিবৃতিই মুখ্য। আর ঐতিহাসিক প্রবন্ধের নানা যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে সেই যুগ ঘটনা বা চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য করা। যুক্তি নিষ্ঠা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাবাহিক বিবর্তনের কথা এই ধরনের প্রবন্ধে গুরুত্ব পায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'বাঙালীর ইতিহাস', সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' এই ধরনের প্রবন্ধের উদাহরণ।

৪) জীবনীমূলক প্রবন্ধ– যে বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে কোন বরণীয় ব্যক্তির জীবন, তাঁর আবির্ভাব কালের প্রেক্ষাপটে তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির গুরুত্ব বিচার বিষয় হয়ে ওঠে, তখন তাকে বলে জীবনীধর্মী প্রবন্ধ। এই ধরনের প্রবন্ধে জীবনচরিতের মধ্যে লেখকের প্রতিষ্ঠা সম্ভাবনা ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুসন্ধান করা হয়। আবার লেখকের রচনার বস্তুনিষ্ঠ, বিষয়গ্রাহী বিশ্লেষণও করা হয়ে থাকে। তবে, ভাব ও আবেগ থাকলেও তা যেন যুক্তিকে আঘাত না করে সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

৫) রাজনৈতিক প্রবন্ধ– যে বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় রাজনীতি; রাজনৈতিক চিন্তা, তত্ত্ব, ঘটনাবলী, সে প্রবন্ধকে সাধারণভাবে রাজনৈতিক প্রবন্ধ বলা যেতে পারে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অথবা রাজনৈতিক ভাবনার ভালোমন্দ দিক, এ ধরণের প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়। প্রাধান্য পায় রাজনৈতিক দর্শন। মানবমঙ্গলের ভাবনা থাকলেও, প্রচারধর্মী বক্তব্যও অনেক সময় এ ধরণের প্রবন্ধে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' তাঁর রাজনৈতিক চেতনার ফলশ্রুতি। বর্ণবৈষম্য ও অর্থবৈষম্যের ভয়ানক পরিণতির চিত্র ও সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী এই প্রবন্ধগ্রন্থকে স্মরণীয় করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা প্রজা', 'কালান্তর' শীর্ষক রচনায় দেশ ও কালের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক চিন্তার ছোঁয়া পাঠককে প্রভাবিত করে।

৬) সামাজিক/ সমাজসমস্যামূলক প্রবন্ধ– কোনো সামাজিক বিষয়, প্রসঙ্গ, সমস্যা, প্রশ্ন ইত্যাদিকে আশ্রয় করে যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের পথ ধরে লিখিত হয় এই ধরনের বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ',ও রবীন্দ্রনাথের ' সভ্যতার সংকট' সামাজিক সমস্যা নিয়ে

লেখা সমাজচিন্তা তথা সমাজসংস্কারমূলক প্রবন্ধের উজ্জ্বল উদাহরণ।

এসব শ্রেণিবিভাগের কোনো স্পষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা কঠিন। এগুলি ছাড়াও বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের আরও কিছু শাখা-প্রশাখা চিহ্নিত করা সম্ভব। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণী সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধের ভান্ডার ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিশেষ সমৃদ্ধ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যেসব প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, তন্ময় প্রবন্ধের সেও আর এক স্বতন্ত্র শ্রেণি।

সব বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধই বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ। প্রবন্ধকার সতর্ক বিশ্লেষণী রীতিতে নানাবিধ তথ্যের সন্নিবেশে, যুক্তি-তর্ক-বিচারের নিবিড়তায়,ভাব ও ভাষার সুসামঞ্জস্যে রচনা করেন নানা স্বাদ ও গোত্রের বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ। নিছক তথ্যের সমাবেশ সাহিত্যমূল্য পেতে পারে না। তাই বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকে সাহিত্য পদবাচ্য হতে হলে তাকে স্থায়ী সাহিত্যমূল্য অর্জন করতে হবে। বিষয় নির্বাচন, বিষয়োপযোগী ভাষাশৈলীর শিল্পিত নির্মাণ, সমগ্র রচনার সুসংহত বিন্যাস ও সর্বোপরি পাঠকের মন ও মননের উপযুক্ত যোগান থাকলেই বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে।

বঙ্গদেশের কৃষক (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) : একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৮৭২-৭৩-এ 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় লেখা সামাজিক- অর্থনৈতিক বিষয়ে একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক সমীক্ষা। উপেক্ষিত ও পীড়িত কৃষকদের নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধ চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' -তে রাজা, ভূস্বামী ও বণিকের শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক দরিদ্র কৃষকের চরম দুরবস্থার কথা আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জমিদার' এ প্রজাদের প্রধান শত্রুরূপে ভূস্বামীদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সামন্ত- ইংরেজ সখ্যের কথাও বলেছে। 'প্রাকৃতিক নিয়ম' শীর্ষক তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীদের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের ধারায় বঙ্কিম বঙ্গদেশের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষদের দারিদ্র্যের কারণরূপে ভৌগোলিক পরিবেশ ও সামাজিক কাঠামোকে দায়ী করেছেন। 'আইন' নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রাবন্ধিক 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ও অন্যান্য রাজস্ব আইনের সমালোচনা করেছেন।

জমিদারদের অমানবিকতা ও অত্যাচারী মনোভাব রাষ্ট্রীয় আইন ও তার নানা ত্রুটি, লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদির কারণে কৃষিজীবী মানুষদের চরম দুর্দশার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। যথেষ্ট গভীরভাবে যুক্তিগর্ভ, তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন বঙ্কিম। দেশের বঞ্চিত কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি যথেষ্ট ভাবাবেগপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ, চিন্তা-উদ্রেককারী এমন রচনা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। যদিও সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আলোচনায়, প্রাবন্ধিক্ ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যনীতিকে অভিযুক্ত করলেও, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ চাননি এবং সামাজিক বিপ্লবের কোনো ভাবনাকেও অনুমোদন করেননি। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, যুক্তিনির্ভর, বলিষ্ঠ, দার্ঢ্যমণ্ডিত গদ্যেও বঙ্কিম এক অনুভবী কলমের ছাপ রেখে গেছেন।

১৮.৫.২ ব্যক্তিনিষ্ঠ / মন্ময় / আত্মগৌরবী প্রবন্ধ

এই শ্রেণির প্রবন্ধে ব্যক্তিচিন্তার চেয়ে ব্যক্তিহৃদয় প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এখানে, জ্ঞানের বিষয়কে লঘু-কল্পনা প্রদীপ্ত করে হাস্যোজ্জ্বলরূপে তাকে উপস্থাপন করে, একইসঙ্গে আমাদের রসবোধ এবং জ্ঞানপিপাসাকে চরিতার্থ করা হয়।

বস্তুনিষ্ঠ তথা বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ যুক্তি-তর্ক, তত্ত্ব-তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠককে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করতে প্রয়াসী হয়। ব্যক্তিগত তথা আত্মগৌরবী প্রবন্ধে পাঠকের সঙ্গে প্রাবন্ধিকের গড়ে ওঠে এক নিকট বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তত্ত্ব, তথ্য, জ্ঞান ইত্যাদি এ-জাতীয় রচনায় লেখকের হৃদয়ানুভূতির রসে জারিত হয়ে পাঠকের আবেগ ও কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে। যে-কোনো বিষয়ই ব্যক্তিনিষ্ঠ বা মন্ময় প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠতে পারে যদি প্রবন্ধকারের ব্যক্তিত্ব ও হৃদয়াবেগের সজীব স্পর্শ তাতে থাকে। কোনো মত বা বাণী প্রচারে সোচ্চার না হয়ে ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ পাঠককে কাছে টেনে নেয়। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ গুরুগম্ভীর প্রশ্ন বা জীবন-সমস্যা অবলম্বনে সূক্ষ্ম আলোচনা করে মীমাংসার সন্ধান করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধবিদ বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যকে আত্মগত ভাবরসে স্নিগ্ধ করে, পাঠকের চারিদিকে সুন্দর, শান্ত ও কান্ত একটি ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করেন। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখকের বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা প্রধান, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে অনুভূতি-স্নিগ্ধ, সরস হাস্য-মধুর আত্ম-স্পর্শ প্রধান। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের ভূমিকা গুরুর। তিনি পাঠকের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেন, কিন্তু এখানে পাঠকের সঙ্গে তাঁর কিছুটা দূরত্ব থাকে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ও পাঠকের হৃদয়ের সংযোগ ঘটে, ফলে সেখানে নৈকট্যের সম্পর্ক। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক আত্মপ্রচার করেন, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখক আত্মনিবেদন করেন; একজনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আর একজনকে ভালবাসি। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মৃদু আলোক-রেখায় আমরা একটি বিশেষ লোককে চিনতে পারি এবং সেই আলোতে নিজেকে চিনি।

তবে অনেকে মনে করেন ব্যক্তিগত প্রবন্ধ শুধু হাস্যরসের আধারে রচিত লঘু প্রবন্ধ কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এই জাতীয় প্রবন্ধের রচনারীতি সরস হতে পারে, কিন্তু হাস্যরস প্রয়োগের বাধ্যবাধকতা নেই। বরং প্রাবন্ধিকের মনের উন্মোচন ঘটে বলে এ প্রবন্ধ ক্ষেত্রবিশেষে রহস্যময়ও হয়ে ওঠে ।

সুতরাং, মন্ময় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১) এ ধরনের রচনার বিষয়বস্তু লেখকের কল্পনার স্পর্শে সঞ্জীবিত, পরিশুদ্ধ হয়। ভাষাভঙ্গি হয় সরস।

২) যুক্তির চেয়ে লেখকের হৃদয়াবেগ এধরনের রচনায় বেশি গুরুত্ব পায়।

৩) এ ধরনের প্রবন্ধ উদ্দেশ্যমূলক নয়।

৪) এ শ্রেণির প্রবন্ধ আত্মমগ্ন, রহস্যময় এবং মননশীল।

৫) সরস ভাষাভঙ্গি, সরল ভাব, মর্মস্পর্শী আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের দ্বারা এ শ্রেণির প্রবন্ধ পাঠককে আপন করে নেয়।

৬) এই ধরনের প্রবন্ধের ভাষা বিষয় অনুসারে পরিবর্তিত হয়।

ফরাসি প্রাবন্ধিক মঁতেন প্রথম এজাতীয় রচনার সূত্রপাত করেছিলেন রোমান্টিক যুগের ইংরেজ প্রবন্ধকার চার্লস ল্যাম্ব তাঁর 'Essay of Elia'-র প্রবন্ধগুলিতে আত্মপ্রক্ষেপময় সরসতা ও বিষণ্ণতার আশ্চর্য মিশ্রণে উজ্জ্বল এক জগত নির্মাণ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' আত্মগৌরবী প্রবন্ধের যথার্থ উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-তেও ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের অনেক লক্ষণই পাওয়া যায়।

১৮.৬ সারাংশ

প্রবন্ধ শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হল 'প্রকৃষ্টবন্ধন'। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিগ্রাহ্য প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত কোনো রচনা করেন লেখক, তখন তা প্রবন্ধ হয়ে ওঠে।

প্রবন্ধ মূলত দুপ্রকার—বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে যেমন যুক্তির ভার ও বিন্যাস খুব স্পষ্ট তেমনই ব্যক্তিগত প্রবন্ধে সরস ভাষাভঙ্গি প্রাবন্ধিকের মনের আত্মগত উপলব্ধির জায়গা নিয়ে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাবন্ধিক স্মরণীয় কিছু বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখেছেন। আবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রাবন্ধিক বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁদের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের জন্য।

১৮.৭ অনুশীলনী

১) প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য লিখুন। উদাহরণ হিসেবে কিছু বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করুন।

২) বাংলা প্রবন্ধের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩) বাংলা প্রবন্ধকে কটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? আলোচনা করুন।

৪) বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ কাকে বলে? বৈশিষ্ট্য কী? উদাহরনসহ আলোচনা করুন।

৫) ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ কাকে বলে? বৈশিষ্ট্য কী? উদাহরনসহ আলোচনা করুন।

৬) বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৭) টীকা লিখুন—আলোচনাধর্মী প্রবন্ধ, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, জীবনীমূলক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ।

১৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) শশীভূষণ দাশগুপ্ত– বাংলা সাহিত্যের একদিক

২) শ্রীশচন্দ্র দাশ– সাহিত্য-সন্দর্শন

৩) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার– সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি

৪) কুন্তল চট্টোপাধ্যায়– সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

৫) হীরেন চট্টোপাধ্যায়– সাহিত্য প্রকরণ

Note

একক ১৯ ❑ লঘু প্রবন্ধ, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ

গঠন

১৯.১ উদ্দেশ্য

১৯.২ প্রস্তাবনা

১৯.৩ লঘু প্রবন্ধ

১৯.৪ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ

১৯.৫ অনুশীলনী

১৯.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৯.১ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করলে লঘু ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন।
- এই পাঠের উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যে লঘু ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা।
- বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের উল্লেখযোগ্য লঘু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১৯.২ প্রস্তাবনা

লঘু প্রবন্ধচর্চা একালে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এই বিদ্যার চর্চা নিতান্ত আধুনিক নয়, এর একটা ধারাবাহিক ও পুরাতন ঐতিহ্য আছে। এই এককে তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। লঘু ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে এই এককে। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য লঘু ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। 'রম্য রচনা' এই লঘু প্রবন্ধের অন্তর্গত। কিন্তু অনেকসময় লঘুচালের এই লেখাগুলির মধ্যেই লেখকের গভীর চিন্তাভাবনা ও দার্শনিক মনের প্রতিফলন ঘটে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তর' এ প্রসঙ্গে স্মরণে আসতে পারে অথবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কেকাধ্বণি'। এগুলিকে লঘুচালের প্রবন্ধ বলে চিহ্নিত করলেই হয় না, গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় এর মধ্যে লেখক ও কবিমনের যে অনুভূতিময় প্রক্ষেপণ আছে তা লঘুতার গণ্ডি অতিক্রম করে যায়। গভীর তাৎপর্যবাহী দ্যোতনা আনে পাঠকের মনে। তাই বলা

যায়, সাহিত্যিকের সাহিত্যরসের অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে সুলিখিত লঘুচালের প্রবন্ধ, রম্যরচনা। সাধারণের পক্ষে সেপথ অগম্য। লঘুচালের প্রবন্ধকে জমিয়ে তুলতে গেলে রসসম্পৃক্ত করে তুলতে হলে সাহিত্যিকের কল্পনার উৎকর্ষ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ প্রয়োজন।

১৯.৩ লঘু প্রবন্ধ

Saintsbury প্রবন্ধকে 'work of prose art' বলে অভিহিত করেছেন। সাধারণত কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করেন, তাকেই প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধের ভাষা ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বৈচিত্র্য থাকলেও এটা সাধারণত গদ্যে এবং নাতিদীর্ঘ করে লেখা হয়। অবশ্য, Locke-এর 'Essay on the Human Understanding'– Mill-এর 'Liberty', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' বা 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং শরৎচন্দ্রের ' নারীর মূল্য' পড়লে বোঝা যায় দৈর্ঘ্য এইসব রচনার ক্ষেত্রে অশোভন নয়। Pope-এর 'Essay on Man' বা সুরেন্দ্র মজুমদারের ' মহিলা কাব্য', কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা', কালিদাস রায়ের 'আসাম' কবিতাকারে প্রবন্ধ বিশেষ। সুতরাং পদ্যে প্রবন্ধ লেখা যায় না, এমন নয়, কিন্তু গদ্যে লেখবার রীতিটিই বেশি প্রচলিত।

বিষয়মাত্রই চিরপুরাতন ও সীমাবদ্ধ; ভঙ্গিই তাকে চলিষ্ণু প্রাণবান করে তোলে প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচারে এই বিষয়বস্তুর ও প্রকাশের ভঙ্গিই মুখ্য। কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে গদ্যাকারে লেখা অথচ তত্ত্ব ও তথ্যবহুল নয় এবং যেখানে রচনাকারের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন ঘটে, সাধারণত সেগুলিই লঘু প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে ওঠে। লেখক এখানে পাঠকের অনেক নিকটবর্তী হয়ে নিজের মনের কথা প্রকাশ করেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,"গীতিকবিতার আত্মগতভাব, নাটকের চমৎকারিত্ব, কাহিনীর সরসতা, রোমান্টিক সৌন্দর্য, নিস্পৃহ দার্শনিকতা, সরস কৌতুকপ্রবণতা, জগৎ, জীবন, পরিবেশ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে উদার, সহনশীল ভাব– এসব গুণ না থাকলে সার্থক রচনাসাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না।"এই লঘু প্রবন্ধকে 'রম্যরচনা' নামেও অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই ধরনের প্রবন্ধের মূল্য বিষয় গৌরবে নয়, রচনাসম্ভোগে। 'রম্যরচনা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ, যে রচনা রমণীয় বা সুন্দর। কিন্তু এই সংজ্ঞা মেনে নিলে, সাহিত্যের সব শাখাকেই এই অভিধান দিতে হয়– যেহেতু সাহিত্যের ধর্মই রমণীয়তা ও সৌন্দর্যসৃষ্টি। 'রম্যরচনা' শব্দটি এসেছে ফরাসি 'বেল-লেতর'- এর প্রতিশব্দরূপে। ফরাসি এই অভিধায় এক ধরনের 'লঘু-রচনা' (fine-writing)-কে বোঝাতো যা সুচারু, পরিমার্জিত, সুললিত গদ্যে রচিত হত, স্বাদে ও স্বভাবে যা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের রচনা থেকে আলাদা। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় জোনাথন সুইফট কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় এই ধরনের হালকা প্রবন্ধধর্মী রচনা ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় Max Beerbohm- এর প্রবন্ধাবলী, Andrew Lang- এর 'Letters to Dead Authors'- এর ।

'লঘু প্রবন্ধ' বা 'রম্যরচনা' অভিধাটি যথোপযুক্ত কিনা তা নিয়ে অবশ্য মতপার্থক্য আছে। 'লঘু প্রবন্ধ 'নামে গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া নয়, বরং এই ধরনের প্রবন্ধে হালকা, বৈঠকী ভঙ্গিতে, লঘু চালে লেখার প্রচলন এবং এতে লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন পাওয়া যায়। একথা ঠিক যে, 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ'- এর সঙ্গে এই ধরনের লঘু রচনার প্রভেদ নির্দেশ করা সর্বদা সহজসাধ্য নয়। কোনো 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বা হালকা 'familiar essay' 'রম্যরচনা'-র গোত্রভুক্ত হতেই পারে, যদিও 'রম্যরচনা' ব্যক্তিগত হবেই এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা গদ্যের দুটি সমান্তরাল ধারা লক্ষ করা যায়। একটি ভারী বা পণ্ডিতি-সুরবিশিষ্ট, অন্যটি সহজ বা ঘরোয়া। ঐ ভারী জাতের বিচার-বিশ্লেষণমূলক গদ্যরচনাকে বলা হয়েছে প্রবন্ধ, আর হালকা সুরের রচনার ধারাটি 'লঘু প্রবন্ধ' বা ইদানিং 'রম্যরচনা' অভিধান পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রভাবতী সম্ভাষণ 'আত্মচরিত'-এ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর কোথাও কোথাও, সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনির, চন্দ্রনাথ বসুর 'একটি পাখী', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'ঐহিক অমরতা' জাতীয় লেখায় প্রাথমিকভাবে রম্যরচনার হালকা ছাঁদটা পাওয়া যায় ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' কিংবা 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এও এই লঘু চালে সরস লেখার খোঁজ মেলে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে সেই সরসতম রমণীয়তা পূর্ণ রূপ পেয়েছিল। সেই থেকে শুরু করে পরবর্তীতে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, দিলীপকুমার রায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতির্ময় রায়, বিনয় ঘোষ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, হিমানীশ গোস্বামী, তারাপদ রায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে এই বিশেষ শ্রেণির রচনা ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কথা বলার সহজ, সরস, মজলিশি ভঙ্গিতে রম্যরচনার অনবদ্য রূপকার মুজতবা আলি। ভাষা ও ভঙ্গির রম্যতায় অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ও তাঁর কলমে অনন্য হয়ে উঠেছে। তাঁর 'দেশেবিদেশে' বা 'চাচাকাহিনী' উচ্চাঙ্গের রম্যরচনা। পূর্বসূরি প্রমথ চৌধুরীর সেই শাণিত বীরবলী 'উইট' মুজতবার লেখনীতেও মেলে।

লঘু প্রবন্ধ/রম্যরচনার বৈশিষ্ট্য–

১) হালকা বৈঠকি চালে, ঘরোয়া মেজাজে, লঘু হাস্যরসাত্মক, রম্য কল্পনার স্পর্শযুক্ত, যে-কোনো গদ্য রচনাকেই রম্যরচনা বলা যায়।

২) রবীন্দ্রনাথের মতে 'বাজে কথা'র প্রবন্ধগুলি হল রম্যরচনা। তাঁর মতে, ''অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারন মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে''।

৩) প্রমথ চৌধুরী রম্যরচনাকে বলেছেন 'গুণপনাযুক্ত ছ্যাবলামি'। তাঁর মতে এ রচনায় থাকে মজলিসি মেজাজ। লেখক ও পাঠকের নিবিড় সান্নিধ্য ও লঘু-সরস আড্ডা এ রচনার প্রাণ।

৪) ভার-বর্জনের প্রয়াস যেমন থাকবে ভাষা ও আঙ্গিকে, তেমনি থাকবে বিষয়েও। কোনো গভীর তত্ত্বকথা প্রকাশের তাগিদ বা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের বাসনা থাকবে না লেখাতে।

৫) দরকারি বিষয়ের গম্ভীর আলোচনার পরিবর্তে মজাদার আলাপচারিতায় রম্যরচনায় প্রত্যাশিত।

প্রবন্ধের জনক ফরাসি লেখক মঁতেনের মন্তব্যটি স্মরণ করলে মনে হতে পারে যে, এই লঘু প্রবন্ধ বা রম্যরচনা আসলে ব্যক্তিগত প্রবন্ধরই নামান্তর– Reader, myself am the matter of my work'। তবে এ দুটি অভিধাকে অভিন্ন মনে করা সঙ্গত নয়। যে-কোনো ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লঘুচপল কল্পনার রঙে রঞ্জিত হলে তাকে 'রম্যরচনা' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে বটে, তবে কেবল রমণীয়তার গুণেই কোনো রচনা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের গোত্রভুক্ত হতে পারে না। এমনকী বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধেও রমণীয়তার ছাপ থাকা সম্ভব। তবে, বিষয়ের লঘুতা ও আঙ্গিকগত ভারশূন্যতার কারণে রম্যরচনা প্রবন্ধের চেয়ে বেশি উপভোগ্য, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও গতিময়। রঙ্গরস, হালকা কৌতুকপরতা অর্থাৎ 'fun' বা 'humour' লঘু প্রবন্ধের একটি আবশ্যক শর্ত। বিষয়নিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর প্রবন্ধে তেমন স্বতঃস্ফূর্ত সরস স্নিগ্ধতার অবকাশ কম; সব ধরনের ব্যক্তিগত প্রবন্ধেও তা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না। অনেক রম্যরচনায় ছোটগল্পের উপাদান থাকতে পারে। তবে ছোটোগল্প একটি সুসংহত আঙ্গিক বা আখ্যান ও শৈলীর সচেতন সমন্বয়ে সার্থক। রম্যরচনা তুলনায় বন্ধনমুক্ত, আপন খেয়ালি চাপল্যে সঞ্চরমান। ছোটগল্পের ঘনসংবদ্ধতা ও সমগ্রের ঐক্য, প্রতীতি তার লক্ষ্য নয়। তাছাড়া এক্ষেত্রেও মজলিসি রঙ্গরসের কৌতুকস্পর্শ আবশ্যিক শর্ত বলে গণ্য হতে পারে না। কখনও কখনও রম্যরচনা তাই ছোটোগল্প সদৃশ হলেও এই দুইয়ের গোত্র ভিন্ন মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র রম্যতার গুণেই যে-কোনো প্রবন্ধ 'রম্যরচনা' বলে বিবেচিত হতে পারে না। তবে একথাও ঠিক যে, সুরম্য প্রবন্ধ ও রম্যরচনার তফাতটি নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। ভাষার সরস রমণীয়তা ছাড়াও দেখতে হয়, আড্ডা বা মজলিসের বৈঠকি চাল, আলোচ্য বিষয়ের স্বতঃস্ফূর্ত নির্ভার ছন্দ ও শিথিল গতি, সেন্স অব হিউমার, পাঠকের সঙ্গে লেখকের খোলামেলা আলাপচারিতা ইত্যাদি বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কথোপকথন, নকশা, কড়চা, চিঠিপত্র, জার্নাল প্রভৃতি নানা আঙ্গিকেই রম্যরচনার স্বরূপটি প্রকাশিত হতে পারে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসা', বীরবলের 'তেল- নুন-লকড়ী', বীরবলের 'হালখাতা', মুজতবা আলির 'চাচাকাহিনী' ও 'পঞ্চতন্ত্র', বুদ্ধদেব বসুর 'ক্লাইভ স্ট্রিটে চাঁদ', বিনয় ঘোষের 'কালপেঁচার নকশা', গৌরকিশোর ঘোষের 'রূপদর্শীর নকশা', নীললোহিত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অজিতকৃষ্ণ বসু, হিমানীশ গোস্বামী,তারাপদ রায় প্রমুখের বহু সরস রচনা 'রম্যরচনা'-রূপে স্বীকৃত।

একটি সার্থক রম্যরচনা– শিব্রাম চক্রবর্তীর 'কলকাতার হালচাল'

বিশ শতকের মধ্যভাগের অন্যতম সরস লিখিয়ে শিব্রাম চক্রবর্তী। তাঁর লেখায় রয়েছে Pun -এর প্রাচুর্য, রয়েছে Humour, Satire-এর সম্ভার। 'হর্ষবর্ধনের বাস-লীলা' গল্পে গৌহাটির বিখ্যাত 'বর্ধন এন্ড বর্ধন কোম্পানি-র দুই ভাই হর্ষবর্ধন এবং গোবর্ধন শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে কর্মচারিকে না দেখে ভাবে কলকাতার লোকেরা ভালো মিশতে চায় না। যেতে হবে তাদের ভবানীপুর ১৩/১২ রসা রোড। তাই গাড়ি ভাড়া করার কথা ভাবে তারা। হর্ষবর্ধন ভাইকে হর্ষের সঙ্গে বলে ''বড় গাড়িতে বেশি ভাড়া লাগবে, এই তো? কলকাতায় ফূর্তি করতে আসা, টাকার মায়া করলে চলবে কেন?'' বাসে উঠেই হর্ষবর্ধন কন্ডাক্টরকে একশ টাকার নোট দেয় এবং জানায় বাকি টাকা ফেরত দিতে হবে না। কেননা আজকে যারাই এ গাড়িতে উঠুক তাদের ভাড়া দিতে হবে না। এই বাসযাত্রায় নানা ধরনের মানুষের ভাড়া দেবার

আকুলতা দেখে হর্ষবর্ধন দাদাকে বলে তার দুটি উপলব্ধির কথা–

''কে বলেছিল গো কলকাতার লোকেরা মিশুকে নয়?''

খ) ''কলকাতার লোকগুলো ভারি খরচে কিন্তু দাদা!''

'গোবর্ধনের গৃহারোহণ', গৃহপ্রবেশ ও শেষ রক্ষা', ইঁদুর চরিতামৃত, 'বে-দন্তবাগীশের বিবরে' ইত্যাদি গল্পে শিব্রাম যে হাস্যরসের আমদানি করেছেন, তা যথার্থই রম্য, সেখানে কৌতুকের ছড়াছড়ি।

১৯.৪ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ

কোনো একটি বিষয়ে নিবিষ্ট ও সুশৃঙ্খল আলোচনা, বিষয়বস্তুর রসগ্রাহী বিচার অপেক্ষা তার বস্তুরূপের অনুসন্ধানই এ ধরনের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইংরেজ দার্শনিকপ্রবর জন লকের 'Essay Concerning Human Understanding', রোমান্টিক কবি শেলির 'The Defence of Poetry', বঙ্কিমচন্দ্রের 'দ্রৌপদী', 'লোকশিক্ষা' ইত্যাদি রচনা এই শ্রেণির তন্ময় প্রবন্ধের উদাহরণ।

এ ধরণের প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষণগুলি হল–

১) কোনো একটি বিষয়ের উপর লেখকের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ হওয়া।

২) ঐ বিষয়ের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে নানান যুক্তির উপস্থাপনা।

৩) আলোচিত বস্তুর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

৪) বস্তুর রসরূপের চেয়ে তার প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষণে প্রয়াসী হওয়া

৫) এর উপস্থাপনভঙ্গি হয় আঁটোসাঁটো, ভাষা ক্ল্যাসিকধর্মী।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি। যেখানে যুক্তিক্রমে সাজানো বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের একটা ছাঁদ ছিল অক্ষয়কুমার দত্তের রচনায়। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা বিষয়নিষ্ঠ এই ধরনের প্রবন্ধগুলি থেকে কিঞ্চিৎ তফাৎ লক্ষ করেছি। এই পার্থক্য মূলত প্রবন্ধের রূপগত দিক থেকে এসেছে। বিদ্যায়তনিক প্রবন্ধের ধারায় বিকাশ ঘটেছে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের। পাশ্চাত্য বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রের প্রভাব, বিশেষত বলতে হয় ইংরেজি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ এই রূপগত বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে খুব বড় জায়গা নিয়েছে তথ্যপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি। মূল বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুক্তিক্রম বিন্যস্ত করা হয় সেখানে অন্যান্য সূত্রের ব্যবহার ও টীকা নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদিও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে মূলত প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত মতামত বিন্যাসকেই গুরুত্বসহ বিন্যস্ত হতে দেখি আমরা। যেমন বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটি অথবা অশোক মিত্রের 'ভারতের কৃষিসমস্যা' প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু তথ্য প্রচুর সন্নিবিষ্ট হলেও তার সূচি বা গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া হয় নি। কিন্তু বর্তমানে যেসব গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখিত হচ্ছে সেখানে কিন্তু ইংরেজি প্রবন্ধের ছাঁদটি থাকছে। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে প্রবন্ধ পেশের বাধ্যবাধকতা সেই বিষয়গুলি নিয়ে আসছে।

আমরা একটি সার্থক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের উদাহরণ হিসেবে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাবনা, ভাষার ক্ষেত্রে বহুল বৈচিত্র্য যে দেশের সম্পদ, সে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' প্রবন্ধে যুক্তি ও দৃষ্টান্তসহ তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর এই প্রবন্ধে মূলত দুটো দিকে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, ধর্মকেন্দ্রিক নানান মতের আলোচনা ও দিকদর্শন; দ্বিতীয়ত, ভাষাকেন্দ্রিক নানান ভাবনার আলোচনা ও দিকদর্শন।

তবে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি শুধু দেশের পরিস্থিতিগুলোকে তুলে ধরে মন্তব্য করেননি। বিশ্বের নানা ঘটনার প্রেক্ষাপটে প্রসঙ্গগুলিকে স্থাপন করে তিনি তার মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। ধর্মকেন্দ্রিক আলোচনায় প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পর্বে দেশ বিভাজন ঘটেছে ধর্মের উপর ভিত্তি করেই। স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান বর্মার মতই সংখ্যাগরিষ্ঠদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেশকে মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে। বর্মা যেমন বৌদ্ধরাষ্ট্র হয়ে যাওয়ার পর সে দেশের সংখ্যালঘুরা অসহায় হয়ে পড়েছিল,পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ভারত স্বাধীনতার পর হিন্দুরাষ্ট্র হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে সে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু যদি নিছক আবেগের বশবর্তী হয়ে, ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তবে পাকিস্তানের চেয়ে তার অবস্থা কিছু ভালো হবে না। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, বর্মার শান, কারেন প্রভৃতি পার্বত্য জাতি রাষ্ট্রকে বৌদ্ধরাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করার বিরোধিতা শুরু করে এবং বৌদ্ধ রাষ্ট্রের অবসান ঘটায়। শুরু হয় ফ্যাসিস্ট শাসন। দূরদর্শী প্রাবন্ধিক জানিয়ে পাকিস্তানেও একই ঘটনা ঘটতে চলেছে। এই প্রবন্ধ রচনার এত বছর পরেও প্রাবন্ধিকের উক্তির সারবত্তা অনুভূত হয় ভাষাও দেশ ও সমাজের ক্ষেত্রে একটি সংবেদনশীল বিষয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বহু ভাষার দেশ ভারতে, দেখা দিয়েছে ভাষা নিয়ে বহু সমস্যা। প্রাবন্ধিক বিশ্ব ইতিহাস থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দেখিয়েছেন, বেলজিয়ামে ও সুইজারল্যান্ডের মতো বহুভাষী দেশে যেকোন একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতি করলেই আন্দোলন হয়েছে।

বহুভাষী দেশে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলে তারা হয়ে যাবে দেশের প্রথম শ্রেণির নাগরিক। আর দেশের অন্য ভাষাভাষীর মানুষরা হবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার উপর ঊর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার ফলে সেখানে তৈরি হয়েছিল বিশৃঙ্খলা। পরে সেই ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করেই পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

অন্নদাশঙ্কর রসিকতা করে বলেছেন সুবোধ মল্লিক যেমন লোকের মুখে মুখে রাজা ছিলেন, কংগ্রেস সভাপতিকে যেমন রাষ্ট্রপতি বলা হত, তেমনি হিন্দী ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা বলা হয়।কিন্তু সংবিধানে একে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়নি। তাই প্রাবন্ধিকের মত,স্বাধীনতার পর আরো অন্তত পঞ্চাশ বছর ভারতের প্রধান ভাষারূপে ইংরেজিকে রাখা দরকার। হিন্দীকে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে ব্যবহার করতে হলে,তার আগে 'সহচর' শব্দটা যোগ করতে হবে। সর্বোপরি, দেশব্যাপী জনমত নিয়েই রাষ্ট্রভাষার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। এইভাবে দূরদর্শী প্রাজ্ঞ প্রাবন্ধিক ভারতের ধর্ম ও ভাষাকেন্দ্রিক সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এই বস্তুনিষ্ঠ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে সেই সমস্যার সমাধানের সূত্রগুলি চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

১৯.৫ অনুশীলনী

১) গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ কাকে বলে? বৈশিষ্ট্য কী? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২) লঘু প্রবন্ধ কাকে বলে? বৈশিষ্ট্য কী? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩) লঘু ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

১৯.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) শশীভূষণ দাশগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের একদিক

২) শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত্য-সন্দর্শন

৩) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি

৪) কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

৫) হীরেন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য প্রকরণ

Note

মডিউল : ৪
সাহিত্যের রূপরীতি ও সাহিত্য আন্দোলন

একক ২৪ ❑ পাশ্চাত্য সাহিত্য আন্দোলনঃ ক্ল্যাসিসিজম, রোম্যান্টিসিজম,

গঠন

২৪.১ উদ্দেশ্য

২৪.২ প্রস্তাবনা

২৪.৩ ক্ল্যাসিসিজম

২৪.৪ রোম্যান্টিসিজম

২৪.১ উদ্দেশ্য

- সাহিত্যিক মতবাদ ও সাহিত্যে তার প্রভাব বিষয়ে একটি পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- সাহিত্যসৃষ্টি ব্যক্তিগত বিষয় নাকি সাহিত্য, শিল্পী ও সমাজের মিলিত মিথস্ক্রিয়া সে বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ক্ল্যাসিসিজম ও রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভব ও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

২৪.২ প্রস্তাবনা

খুব সাধারণভাবে দেখতে গেলে মনে হতে পারে সাহিত্য সৃষ্টি নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়াস, সুতরাং সামাজিক ও গোষ্ঠীগত পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা সম্পূর্ণত তা নয়, যদি তা হতো তবে সাহিত্যের কোন ইতিহাস থাকত না, কারণ প্রত্যেক শিল্পের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন মানস প্রবণতা নিয়ে কোনো ইতিহাস রচনা করা যায় না। সময়, দেশ-কাল শিল্পী সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজ এবং সাহিত্য এদের কে কাকে প্রভাবিত করে? কার অধিকার বেশি? সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ না হলে সাহিত্যকারের কর্ম বিচ্যুতি ঘটে কিনা? সাহিত্যকে স্বাধীন বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত কিনা? এই সমস্ত প্রশ্ন থেকে যায়। এই প্রশ্নগুলির আজও কোনো সুষ্ঠ মীমাংসা হয়নি, তার দরকারও নেই বোধ হয়। এই প্রশ্নগুলি সময়ের ইতিহাসের সরণিতে সাহিত্য সম্পর্কে বেশ কিছু মতবাদের মাইল ফলক দাঁড় করিয়ে রাখে।

সমাজের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং যুগরুচি সাহিত্যকে কিছু পরিমানে নিয়ন্ত্রণ তো করেই, কিন্তু বিভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলনও সাহিত্যকে বিশেষ এক ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন করে তুলতে

সাহায্য করে। এইসব আন্দোলন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জন্ম নেয় দার্শনিক পরিমণ্ডলে, পরে তা সাহিত্যিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। একটি দার্শনিক বা সাহিত্যিক মতবাদ যে মানসিকতার কথা বলে সেরকম কোনো একটি মতবাদ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে অন্য আরেকটি দার্শনিক বা সাহিত্যিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এভাবেই দার্শনিক বা সাহিত্যিক মতবাদগুলি সাহিত্য সৃষ্টির বা সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করার বিভিন্ন মাধ্যম হিসেবে পঠিত হয়ে আসছে আমাদের কাছে।

২৪.৩ ক্ল্যাসিসিজম

ক্লাসিক শব্দটি সেই সব মানুষ প্রেরণা সঞ্জাত কর্মকে বোঝায় "Whose value is assumed they are can be no arrangement" Classic- এর আদর্শ সবটাই প্রশ্নাতীত। 'It has sometime been used to deny the need for reassessment– re-interpretation and change'। প্রাচীন গ্রীস ও রোমান সাহিত্যকে ক্লাসিক বা ধ্রুপদী সাহিত্য বলা হয়। যে সাহিত্য কাল জয়ী বা চিরকালীন, যার ভাষা সংযুক্ত চিন্তা সুসংহত এবং যা ঐতিহ্যের অনুবর্তনে ও মহান আদর্শের রূপায়ণে বলিষ্ঠতার দ্যোতক- তাকেই বলা হয় ক্লাসিক বা ক্লাসিক্যাল সাহিত্য। ক্লাসিক ও ক্লাসিসিজমের সাধারণ আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে; "The world classic system is used loosely to summarize the general characteristic of the Classic art and literature of ancient Rome and Greece- simplicity– restraint and other- and the adjective classic and classical are thus applied to any work which reflects those qualities"। অর্থাৎ প্রাচীনকালের কালজয়ী রচনার আদর্শকে অনুসরণ করার প্রবণতা ক্লাসিসিজম। এ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস গ্রন্থে ক্ল্যাসিসিজমের লক্ষণ হিসেবে যে পরিমিতিবোধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, গ্রীক ক্ল্যাসিসিজমের মূল কথা সেটিকেই বলা যেতে পারে। পরিমিতিবোধ ছাড়াও প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে আমরা আরো দুটি লক্ষণ দেখতে পাই, তারা হল যে কোনো রকমের অসম্ভাব্যতা বর্জন এবং কল্পনার মধ্যেও একটা সংগতি রক্ষা।

ক্লাসিক সাহিত্যের স্রষ্টারা বস্তুকে তার স্বরূপে দেখেন এবং দেখার মধ্যে যেমন ধীর, স্থির ও প্রশান্ত দৃষ্টি বর্তমান, তেমনি তার প্রকাশভঙ্গিও বলিষ্ঠ, সংযত এবং উপাদান সমূহ নিবিড় ঐক্যবন্ধনে দৃঢ়। ক্লাসিক সাহিত্য নৈতিক এবং সত্যকে বা সর্বজনীন কোনো মহৎ ভাব বা ধ্যান ধারণাকে সর্বকালের সর্বলোকের গ্রহণযোগ্য করে পরিবেশন করে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন সর্বাঙ্গ সুন্দরতার পারফেকশন, এবং শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় মনে করেন যে ক্লাসিক সাহিত্যের এটাই সর্বসম্মত উচ্চতম স্তরের উৎকর্ষ।

Graeco Roman Critic Longinus Sublime উচ্চতর উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে ক্লাসিক সাহিত্যের সাবলিমিটি পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, এবং সেগুলি হল;

১। Grandeur of thought বা মহান চিন্তার প্রকাশীল ক্ষমতা।

২। Intensity of emotion বা আবেগের বা ভাবের গভীরতা।

৩। The appropriate use of Figures বা কল্পনাশক্তির সাহচর্যে বাক্যালঙ্কার প্রয়োগের গভীরতা।

৪। Nobility of diction বা রচনাশৈলীর আভিজাত্য।

৫। Dignity of elevation of word-order বা শব্দ বৈচিত্র্য সৃজন।

যীশুখ্রিষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী সময়কে বলা হয়েছে প্রাচীন ক্লাসিক যুগ। এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মহাকাব্য হল 'Gilgamesh Saga' প্রাচীন গ্রীসের হোমার রচিত 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' এবং প্রাচীন ভারতের 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' সেইসঙ্গে আলেকজেন্দ্রিয়ার 'Argonautica'। প্রাচীন গ্রীসের ক্লাসিক কমেডির স্রষ্টার নাম অ্যারিস্টোফেনিস। তার রচিত কমেডি নাটকগুলিও ক্ল্যাসিক।

প্রাচীন গ্রিসের পরেই রোমের অভ্যুত্থানএই যুগের বিখ্যাত ক্লাসিক মহাকাব্য রচয়িতা হলেন ভার্জিল। ট্রাজেডি রচয়িতা হলেন সেনেকা। অগাস্টাসকে কেন্দ্র করে যেমন প্রাচীন রোমের স্বর্ণযুগে ক্লাসিক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনিভাবে দান্তের 'ডিভাইন কমেডিয়া'-কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল ইটালিক ক্লাসিকযুগ। ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালকে বলা হয় ফরাসি ক্লাসিক যুগ।

পূর্বেই উল্লেখিত যে প্রাচীন ক্লাসিক মহাকাব্যের রচয়িতা হলেন পাশ্চাত্যের হোমার এবং প্রাচ্যের বাল্মীকি ও ব্যাস। হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'-র সঙ্গে প্রাচ্যদেশের 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-এর মিল ও অমিল দুইই আছে, কিন্তু উভয় দেশের মহাকাব্যই ক্লাসিক লক্ষণাক্রান্ত বলে ক্লাসিকের লক্ষণগুলি উভয় ক্ষেত্রেই এক বা সাদৃশ্যযুক্ত। এখানে ক্লাসিক সাহিত্যের সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। A narrative or heroic action বা শৌর্য-বীর্য ও পরাক্রমপূর্ণ দীর্ঘ আখ্যান - মহাকাব্যের নায়ক এক বা একাধিক হতে পারে এবং বিষয়বস্তু হবে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কোন যুদ্ধ বা বিজয় কাহিনি। ঘটনা বা আখ্যান সরল ও বাস্তবচিত্র তা কোনোভাবেই কল্পনার জারণে জারিত নয়। বিষয় গুরুগম্ভীর হলেও তা প্রত্যক্ষবৎ। এমনকি স্বর্গ ও দেবতাদের ক্রিয়া-কলাপ বর্ণনার মধ্যেও স্পষ্ট প্রত্যক্ষতার দৃষ্টি বজায় থাকবে। ইলিয়াড ও মহাভারতের বিষয় যেমন রাজবংশের ভাতৃ-ঘাতী যুদ্ধ ঠিক তেমনই 'ওডিসি' ও 'রামায়ণ'-এ রয়েছে ভ্রাম্যমান রাজপুত্রের পত্নীকে এবং রাজ্য ফিরেপাবার কাহিনি। 'হিরোইন অ্যাকশন' এর অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য। মহাকাব্যের যুদ্ধ প্রসঙ্গগুলিতে দেখা যায় যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে মর্তে কিন্তু স্বর্গের দেবতারা সেই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। দেবতারাও মর্ত মানবের মতোই স্বার্থ, হিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহায় জর্জরিত।

২। Grandeur of thought বা চিন্তা ও মহত্বের উচ্চভাব বা বিশালতা - হোমারের ইলিয়াড এবং ওডিসিতে যেমন মহান আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে প্রাচ্যের রামায়ণ ও মহাভারতেও সেই একই আদর্শের সুর প্রতিধ্বনিত। এই আদর্শকে অবহেলা করার জন্যই যেমন ইলিয়াডের ট্রজান ওয়্যার, রাম ও রাবণের যুদ্ধ বা কৌরব ও পান্ডবদের যুদ্ধও সেই আদর্শের ব্যত্যয় ঘটেছে। ম্যানিউলাসের স্ত্রী হেলেনকে অপহরণ করা ট্রয় যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ, কিন্তু এর মধ্যে যে আদর্শের নীতিকে লঙ্ঘন করা হয়েছে তা হল আথিত্য

ধর্ম। অপরদিকে রামায়ণ ও মহাভারতে যে পারিবারিক তথা সামাজিক আদর্শ বোধকে তুলে ধরা হয়েছে, রাবণ ও কৌরবেরা সেই আদর্শবোধকে লঙ্ঘন করেছে। মহাকবি হোমার Achilles-এর তীব্র ক্রোধ, Agamemnon-এর নারী অপহরণ, Patroclus হত্যার প্রতিশোধ নিতে হেক্টর হত্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তেমনি উৎকৃষ্ট উদাহরণ উচ্চগ্রামে বর্ণিত হয়েছে মহাভারতের শকুনি, জরাসন্ধ- ভীম-অশ্বত্থামার মধ্যে। পাণ্ডব বনবাস বা রামচন্দ্রের বনবাসের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ-তিতিক্ষা হতাশা-বঞ্চনা চরম উৎকর্ষতা পেয়েছে মহাকবিদের বর্ণনায়।

৩। The nobility of diction with appropriate use of Figures বা অলঙ্কার সহযোগে রচনাশৈলীর আভিজাত্য - গুরুগম্ভীর ভাষা ছন্দ ও অলঙ্কার বিন্যাসে এমন এক আভিজাত্য সৃষ্টি করে যা শিল্পগৌরবের উৎকর্ষতায় পাঠকের হৃদয় ও মস্তিষ্কে এক বিপুল আবেদন বিস্তার করে। বর্ণনাও এতই প্রত্যক্ষ যে সৌন্দর্য, ঔদার্য, গাম্ভীর্য ইত্যাদি আঙ্গিকের সুপরিকল্পিত বিন্যাসে; ঘটনা-বিন্যাসের সংযমে, ভাবের-ভারসাম্যে মহিমাময় হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়; যুক্তি, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিমার্জিত বিশ্লেষণ যেন সাহিত্যের এক অভিনব রূপকে গৌরবোজ্জ্বল স্থাপত্যশিল্পের মহিমায় উন্নীত করে। অলঙ্কার সহযোগে সৃষ্ট হয় অপূর্ব শব্দসম্ভার বা এপিক সিমিলি। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এ শয়তানের সঙ্গে তিমি-র সাধারণ তুলনাকে এপিক সিমিলিতে পরিণত করা হয়েছে।

৪। Traditional Delivery বা ঐতিহ্যের অনুবর্তন - প্রত্যেক দেশেরই পূর্বপুরুষদের দ্বারা অনুসৃত রীতিনীতি পরম্পরাক্রমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্যরূপে উপস্থিত হয়। সামগ্রিকভাবে এই ঐতিহ্যই কালক্রমে জাতীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়। ক্লাসিক সাহিত্যের স্রষ্টাকে ও কলচারাল ট্র্যাডিশন-এর থিওরিটিক্যাল দিকটিকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং এ বিষয়ে তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেন। ইংরেজি সাহিত্যে স্পেনসর ক্লাসিক কবি নন। তিনি ক্লাসিক্যাল রীতির সঙ্গে আধুনিক ভাবধারার সমন্বয় সাধক। এলিয়টট ক্লাসিকধর্মী হলেও, তাঁর ক্লাসিকধর্মীতা আধুনিক যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের নির্দেশ দেয়। কিন্তু প্রকৃত ক্লাসিক সাহিত্যের স্রষ্টাকে প্রাচীন রীতিনীতি, আচার-আচরণ সামাজিক প্রচলিত নিয়ম কানুন, রচনার আঙ্গিক ভাষা-শৈলী সবকিছুকেই মেনে চলতে হয়। তিনি এর বাইরে যেতে পারবেন না। যেমন পুত্রের কর্তব্য পিতার সত্যকে রক্ষা করা এবং সেজন্যই ভীষ্মকে চিরকাল অকৃতদার থাকতে হয়, রামকে বনবাসে যেতে হয়। মাতার আদেশে দ্রৌপদী পঞ্চপান্ডবের ভার্যা হন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্রস্নেহ, পুত্রবিচ্ছেদে দশরথের বিলাপ, পরপুরুষ সংসর্গে পতিতা অহল্যার পাষাণ পরিণতি- এসবই ভারতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের নিদর্শন।

৫। Sublimity in character বা চারিত্রিক সমুন্নতি - ক্লাসিক সাহিত্যের প্রধান প্রধান চরিত্রকে তাঁদের স্বাভাবিক চরিত্র গুনে মহান হতে হবে তারা সর্বদাই 'অ্যাবাউট দা অ্যাভারেজ'। তাঁরা মর্তমানব, কিন্তু চরিত্রগুনে তাঁরা দেবতাদের থেকেও উন্নত। মনুষ্যত্বের মহিমা ঘোষণা ক্লাসিক সাহিত্যস্রষ্টার অন্যতম লক্ষ্য। Longinus বলেছেন- 'Sublimity' হল 'the echo of greatness of spirit' ক্লাসিক স্রষ্টা তাঁর প্রধান প্রধান চরিত্রের মধ্যে এই Greatness-কেই উদ্ভাসিত করেন। মহাভারতের সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, দাতা কর্ণ,

পিতামহ ভীষ্ম এবং নারী চরিত্রদের মধ্যে কুন্তী গান্ধারী, রামায়ণের রামচন্দ্র, লক্ষণ, সীতা প্রমূখ সকলেই সমুন্নত চরিত্রগুণে মহান এবং আদর্শ স্থানীয়।

নিও ক্লাসিক বা নব্য ধ্রুপদী সাহিত্য

নিও ক্লাসিসিজমকে এক কথায় বলা যায় 'Renaissance of classical culture'- যা ইতালিতে শুরু হয়ে প্রথমে ফ্রান্সে ও পরে ইংরেজি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ব্রিটেনে ষোড়শ শতাব্দীতে Thomas More, Thomas Wyatt, Henry Howard প্রমুখ লেখক ক্লাসিকধর্মী যে অবদান সৃষ্টি করেছিলেন, সিডনির 'An Apology of Poetry' তত্ত্ব রেনেসাঁ ক্রিটিসিজমের Epitom রূপে ড্রামাটিক ক্রিটিসিজমে এক পরিবর্তনের আভাস সূচনা করলো। Ronald হলেন এই পরিবর্তনের পথিকৃৎ। দ্বিতীয় পর্যায়ে Thomas Rymer, Boileau প্রমুখ তাত্ত্বিকের অনুপ্রেরণায় ড্রাইডেন ও স্যামুয়েল জনসন Neo classic তত্ত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। কালক্রমে নিও ক্ল্যাসিসিজম রোমান কালচারের পরিবর্তে গ্রীক কালচার এর উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ল এবং রুশের প্রভাবে রোমান্টিসিজমের পরিপূরক হয়ে উঠল। উইলিয়াম ব্লেক সৃষ্টি করলেন 'neo classic inspiration in his graphic art', কিটসের বহু কবিতাতেই ক্লাসিকাল থিম প্রেক্ষাপট রচনা করল। অষ্টাদশ শতকের বার্নস ওয়ালপোলদের রচনাতেও উভয়তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটেছে বারংবার। নিও ক্লাসিক সাহিত্যিক এবং দার্শনিকগণ মনে করতেন উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় মানুষ যা নয় সেই রকম ক্ষমতাশালী বলে দম্ভ করে। এই দম্ভ ভুলে গিয়ে নিজের শক্তির সীমা সম্বন্ধে তার সচেতন থাকা উচিত। প্রকৃতি ও মানবজগৎ একই নিয়মের বন্ধনে বাঁধা, সেই নিয়ম-শৃংখলাকে মেনে চলায় মানুষের উচিত। এই নিয়ম-শৃঙ্খলা না মানলে কী হয়, কিছু ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তার পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন। মহাকাব্য এবং ট্রাজেডি সম্বন্ধে তাঁদের উচ্চ ধারণা থাকলেও তাঁরা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন মূলত ব্যঙ্গাত্মক কমেডি, গদ্য ধর্মী কবিতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধে। শেষোক্ত শ্রেণিটি নিও ক্লাসিক কবিদের হাতেই সবচেয়ে সমৃদ্ধ।

সাহিত্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী নন্দনভাবনা রোমান্টিসিজমের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও একেবারেই তা ক্লাসিসিজম বর্জিত নাও হতে পারে। তাই 'ক্লাসিক্যাল' বলে কোনো রচনাকেই চিহ্নিত করা যায় না- অথচ ক্লাসিসিজমের উপাদান অনেক ক্ষেত্রেই নিহিত থাকে। উনিশ ও বিশ শতাব্দীর আধুনিক ভাবধারার মধ্যেও ক্লাসিক্যাল উপাদান বর্তমান। যখনই আবেগনির্ভর রোমান্টিকতা মাত্রা ছাড়ায়, তখনই নৈব্যক্তিকতা ও ঐতিহ্য অনুযায়ী আভিজাত্য প্রভাবিত ক্লাসিক উপাদানের কথা স্মরণে আসে। সেকারণেই টি.এস. এলিয়ট যিনি নিজেকে 'Classicist in Literature' বলে ঘোষণা করেন, তাঁর 'Tradition and Individual Talent' নামক প্রবন্ধে রোমান্টিসিজমের আধিক্যের বিরুদ্ধে 'Paved the way for the rise of Neo-classicism'-এর কথা বলেছেন।

২৪.৪ রোম্যান্টিসিজম

রোম্যান্টিকতার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই- কোন একটি বিশেষ বাক্যের দ্বারা এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যায় না। রোম্যান্টিকতা একটি বিশেষ নান্দনিক ধারণা যা পূর্ববর্তী কোন যুগ বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। বহু অর্থবোধক ও বহুমাত্রিক এই শব্দটি বহু সময়ব্যাপী বিবর্তনের ধারায় বিকশিত হয়ে ওঠে বলেই কোন দেশ ও কালের সীমায় এর অর্থ সীমাবদ্ধ নয়। রোম্যান্টিসিজম হল সাহিত্যের এক বিশেষ অভিব্যক্তি বা প্রবণতা যা কল্পনার পাখায় ভর করে জীবনের নগ্ন বাস্তবতা হতে দূরে বিস্ময় ও কৌতুহলের রাজ্যে স্রষ্টাকে নিয়ে যায় এবং স্বতন্ত্রপথে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কল্পনা সত্যকে প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়। এ জগৎ অন্তর্মুখীন ছায়াচ্ছন্ন এবং ভাববস্তুর দ্বারা আবেগমণ্ডিত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে নিও ক্লাসিক সাহিত্যিকগণ ফর্ম সর্বস্বতা এবং রুচিবাদ নিয়ে এমন প্রাণহীন সাহিত্যের দিকে ঝুঁকতে থাকেন যে এই জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমা হতে থাকে। এঁদের বিরুদ্ধে ক্ষীণ বিদ্রোহ জানাতে থাকেন গ্রে, ব্লেক বার্নস প্রভৃতি কবি এবং তার ফলেই ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের সূত্রপাত ঘটে।

অনেকে মনে করেন ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের সূত্রপাত ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লব থেকে, আবার মতান্তরে এই মতটিই বেশি গৃহীত হয়েছে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'লিরিক্যাল ব্যালাডস' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রোমান্টিক যুগের প্রবর্তন ঘটে। এঁদের প্রধান কথাই ছিল, সাহিত্যের অনুভূতির জন্ম নেয় হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয় - সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে হৃদয় দিয়েই, বুদ্ধি দিয়ে নয়।

অবশ্য এইভাবে এক কথায় রোমান্টিকতার বা সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যথার্থ রোমান্টিক মানসিকতা বোঝানো আরো শক্ত। কারণ সাধারণভাবে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা, তা যেমন করেই হোক তৈরি হয়েছে যে রোমান্টিক বলতে বোঝায় জীবনবিমুখ এবং কল্পনাবিলাসী এক ধরনের রস সাধনা - কখনো তা ধ্রুপদী সংযমের বিরোধী, কখনো কল্পমায়ার আধ্যাত্মলীলা। আসলে রোমান্টিকতা সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা তৈরি হবার কারণ হলো রোমান্টিকতার এক ধরনের অতিরেক, ইংরেজিতে যাকে বলে Romantic extravagance এবং এই অতিরিকের আরেকটি দিকই হল Romantic transcendentalism বা রোমান্টিক অতীন্দ্রিয়বাদ। বস্তুত, বিশুদ্ধ রোমান্টিকতার সঙ্গে জীবন বিমুখতার কোন সম্পর্ক নেই, থাকতেই পারে না। কারণ জীবনকে বলিষ্ঠ, সুন্দর এবং আরো সজীব প্রাণময়তা দেবার জন্যই তো ছটফট করেন রোমান্টিক শিল্পীরা।

রোম্যান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য-

প্রকৃতিপ্রীতি - আধুনিক ইমেজিস্ট কবিরা প্রকৃতিকে পরিহার করতে চাইলেও রোমান্টিক কবিতায়

প্রকৃতি এসেছে বিষয় হয়ে। প্রকৃতির মধ্যেই মানুষের আবির্ভাব এবং প্রকৃতির মধ্যেই তার লয়। Cult of noble savage - এর কবিরা আদিম প্রকৃতির সরলতা, শান্তি ও স্নিগ্ধতার যে ছবি এঁকেছিলেন, রুশো আহ্বান জানালেন সেই আদিম প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যেতে। ওয়ার্ডসওবার্থ গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলেন বলেই প্রকৃতির তিনি প্রেমিক ও পূজারী। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে মানব মনের বিচিত্র ভাবাবেগ ও রহস্য চেতনা, ক্রম বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় জেমস টমশন থেকে শুরু করে ব্লেকের সময়কাল পর্যন্ত। প্রকৃতি থেকে শিক্ষালাভ, প্রকৃতির মধ্যে এক সজীব প্রাণদায়ী শক্তির উপলব্ধি, শৈশবের প্রতি প্রবল আগ্রহ ইত্যাদি অনেক বিষয় যা রোমান্টিক কবিদের প্রেরণা ও রচনাশৈলীর বিষয়।

মানবপ্রীতি - ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলীর প্রকৃতিপ্রেমই পরিণত হয়েছে মানব প্রেমে। মানব প্রীতির বীজ সুপ্ত ছিল ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারায় এবং রুশোর প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশে। প্রকৃতি রোমান্টিক কবিদের কাছে আদিম সারল্যের প্রতিমূর্তি আর সেই প্রকৃতি ও তার সান্নিধ্যধন্য জীবনের মৌলিক সারল্যের প্রতি রোমান্টিকদের ছিল অগাদ মমত্ববোধ। ওয়ার্ডওয়ার্থ লুসিকে নিয়ে যে অসামান্য কবিতাগুলি লিখেছিলেন, তাতে এক সাধারণ গ্রাম্য বালিকা রূপান্তরিত হয়েছিল আনন্দ ও পবিত্রতার প্রতীকে, প্রকৃতির অন্তলীন এক একাত্ম অনুভবে। ব্লেক শৈশবের সরল স্বপ্নময়তাকে প্রজ্জ্বল করেছিলেন তাঁর কবিতায়। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এমন নৈসর্গ-তন্ময়তা ও প্রকৃতি মানুষের নিবিড় সংযোগ দেখা গিয়েছিল বিহারীলালের রচনায়, তাঁর ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, রবীন্দ্রোত্তর পর্বে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। প্রকৃতি ও মানব অস্তিত্বের আত্মমগ্ন মনন বিভূতিভূষণের রচনাতেও দেখা যায়।

অতীতচারিতা - রোমান্টিক কবিরা সমকালীন জীবনের রাজনৈতিক সামাজিক অনুশাসন ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এতটাই বিতরাগ ও আসক্তহীন ছিলেন যে, তাঁরা বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন অতীতে, দূরবর্তী ও অতিক্রান্ত জীবনধারার কাল্পনিক সৌন্দর্য ও মায়াময় স্মৃতিতে। যেমন জীবনানন্দ তাঁর অজস্র কবিতায় ফিরে গেছেন ব্যাবিলন মিশরের প্রাচীন সভ্যতায়। প্রাচীন গাথা, লোককথা, কিংবদন্তি, পুরাণ ও ইতিহাসের বিচিত্র ভান্ডার থেকে রোমান্টিক কবি তাঁর সৌন্দর্যলোক নির্মাণের উপাদান সংগ্রহ করেন। স্কটের উপন্যাসে ও কোলরিজের কবিতায় মধ্যযুগ, কীটস ও শেলীর কাব্যে প্রাচীন গ্রীষ্মের রূপক ও পুরান নতুন করে বর্ণময় হয়ে ওঠে অপরূপ স্মৃতি মেদুরতায়।

বিদ্রোহ - ফরাসি বিপ্লব, রুশোর দার্শনিক প্রভাব রোমান্টিক কবিদের ভাব-বিদ্রোহী করে তুলেছিল। এই বিদ্রোহ সমসাময়িক ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে। কোলরিজ নিয়ে এসেছিলেন কবিতার মধ্যে মধ্য মধ্যযুগীয় অতিপ্রাকৃত বাতাবরণ যা ব্লেকের কল্পরাজ্যের অনুষঙ্গি। কবি বায়রণের বিদ্রোহ সবকিছু নিয়ম-নীতি আচার ও আচরণের বিরুদ্ধে। জীবনকে উপভোগ করার অদম্য পিপাসা রয়েছে তাঁর কাব্য কবিতায়। শেলী দাবি করেন ন্যায় বিচার, সমাজ বিপ্লব। তাঁর 'প্রমিথিউস আনবাউন্ড' এবং 'দা রিভল্ট অফ ইসলাম'-এ রয়েছে সমাজ বিপ্লবের ইশারা। কীটস-এর বিদ্রোহ কালের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তিনি অনুভব করেছিলেন 'a thing of beauty is joy forever'।

আধ্যাত্মিকতা - কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় মতবাদ নয়, রোমান্টিকতার হতে উৎসারিত হয় এক

ধরনের আধ্যাত্মিকতা যা কখনো বা তত্ত্বমুখি কখনো বা ঈশ্বরীয় অনুভূতি সম্পন্ন। বায়রনের মত অশান্ত কবিও শেষপর্যন্ত প্রকৃতিতে আবিষ্ট হয়ে 'গ্রেট হোল'-এর অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়েছেন। শেলীকে বলা হয় 'the poet of hopes in despair'। রোমান্টিক জীবন জিজ্ঞাসা তাঁকে আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী করে তুলেছে। প্রমিথিউসের উপসংহারে যে ব্যক্তিগত নৈতিক অনুভূতির সুর বর্তমান, 'অ্যাডোনাইস' কবিতাতেও তা বর্তমান। জীবনের বাহ্যরূপের অন্তরালে উদ্ভাসিত হয় শাশ্বত সত্যলোক। কবি কীটসের রোমান্টিক প্রত্যয়ও আধ্যাত্মিকতায় মন্ডিত।

অতিপ্রাকৃতর প্রতি আকর্ষণ - কোলরিজের কবিতায় অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে। অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রেও অতিপ্রাকৃত বিষয় প্রবেশ করেছে কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও বা অস্পষ্টভাবে। কিটস-এর 'ল্যামিয়া', 'ইসাবেলা' ইত্যাদি কবিতায় অতিপ্রাকৃতির রূপ স্পষ্ট। শেলীর 'কুইন ম্যাবে' কবিতায় পরীরা নেমে আসে মাটিতে। ওয়ার্ডওয়ার্থ-এর 'প্রিলিউড' বা স্কটের উপন্যাসে অলৌকিক উপাদান অতিপ্রাকৃতিরই পরোক্ষ প্রভাব।

বিস্ময়বোধ - এলিজাবেথীয় যুগকে বলা হত 'বিস্ময়ের নবজাগরণ'। এযুগ হতে 'রোমান্টিক রিভাইভল'- এর কালের ব্যবধান প্রায় আড়াইশো বছর। 'রোমান্টিক রিভাইভাল'-এর কবিরা তাঁদের আবেগ ও উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে এমন এক বিস্ময়ের কল্পরাজ্যে প্রবেশ করলেন যেখানে মানসিক ঐশ্বর্য ও ঐশ্বরীয় লীলার সমন্বয় ঘটলো। প্রকৃতির মধ্যে ঐশীশক্তির আবিষ্কার ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে বিস্ময়ের, অতিপ্রাকৃতির লীলার মধ্যেই বিস্ময়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কোলরিজ, আত্মমুগ্ধ বিস্ময়ের বন্যায় আবেগে তাড়িত হয়ে উঠেছিলেন শেলী, প্রেমের শিহরণে বিস্মিত হয়েছিলেন বায়রণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের মধ্যে পরমের সন্ধানে বিস্ময়বোধ করেছিলেন কীটস। এককথায় এই কবিদের রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে চরম বিস্ময়বোধ।

বেদনাবোধ - সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা জীবনের এই দুইটি দিক। এই দুইয়ের মধ্যে টানা পোড়েনের মতোই রোমান্টিক কবিদের আদর্শে কল্পরাজ্যের সঙ্গে বাস্তবের রয়েছে এক অনিবার্য দ্বন্দ্ব। এর থেকেই সৃষ্টি হয় বেদনাবোধ। প্রকৃতিগতভাবে শেলী বিষন্ন এবং এই বিষণ্ণতা কখনো অখন্ড সৌন্দর্যবোধে লীন না হতে পারার জন্য, আবার কখনো মৃত্যুচিন্তা পর্যন্ত হতে উৎসারিত। আকাঙ্ক্ষা ও অপ্রাপ্তির মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্বের জন্যই তিনি বলেন 'Our sweetheart song are those that tell us saddest thought'। বায়রনের মধ্যে দুই প্রতিবাদী প্রবণতার দ্বন্দ্ব তাঁর মানসিক সংগঠনকে জটিল করে তুলেছে। কবি কীটসের জীবনটাই বিপদে ভরা। প্রেমিকার প্রত্যাখ্যান, জীবনব্যাপী ক্ষয়রোগ, দারিদ্র্য এবং বেদনায় ভরা এই ব্যক্তিজীবন উঁকি দিয়েছে তাঁর কাব্য ও কবিতায়।

আত্মনিমগ্নতা - রোমান্টিক কবিদের আত্মমগ্নতা পল্লবীত হয়েছে তাদের আদর্শ কল্পজগতকে ঘিরে। ওয়ার্ডওয়ার্থ ও কোলরিজ যেমন প্রকৃতিজগৎ ও অতিপ্রাকৃত জগতে আত্মমগ্ন, তেমনই শেলীর আত্মমগ্নতা নিহিত ছিল আপোষসহীন সংগ্রাম ও অত্যাচারের অবসান কামনায় এবং কীটস আত্মমগ্ন থেকেছেন সৌন্দর্যচেতনার মধ্যে সত্য শাশ্বত ও চিরন্তনের অন্বেষণে। তাঁদের সৃষ্ট কল্পজগতে সম্ভব অসম্ভবের কোন সংশয় নেই, বাস্তব ও অবাস্তবের কোন প্রশ্ন নেই। এ তাঁদের নিজেদের বিশেষ অনুভূতির ক্ষেত্র।

একক ২৫ ❑ সুররিয়ালিজম, সিম্বলিজম, ন্যাচারালিজম ইত্যাদি সাহিত্য আন্দোলনগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

গঠন

২৫.১ উদ্দেশ্য

২৫.২ সুররিয়ালিজম

২৪.৩ সিম্বলিজম

২৪.৪ ন্যাচারালিজম

২৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে সাহিত্য আন্দোলনের কয়েকটি পর্যায় সম্বন্ধে জানতে পারা যাবে। ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক যুগের পরবর্তীতে পাশ্চাত্যে সুররিয়ালিজম, ন্যাচারালিজম ইত্যাদি সাহিত্য আন্দোলন সম্বন্ধে যে আলাপ হয়েছিল সেগুলি সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে একটা ধারণাদেবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

২৫.২ সুররিয়ালিজম

সুররিয়্যালিজম এর বাংলা প্রতিশব্দ পরাবাস্তববাদ বা অধিবাস্তববাদ। ১৯২৪ সালে আঁদ্রে ব্রোতোঁ কর্তৃক প্রকাশিত ম্যানিফেস্টো অন সুররিয়্যালিজম এর মাধ্যমে সুররিয়্যালিজিম মতবাদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটে। 'Surrealist' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন কবি গীয়ম অ্যাপোলেনীয়র ১৯১৭ সালে। তথাপি ব্রতোঁই যে এই আন্দোলনের মুখপাত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ভাবধারার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো মানবমনের সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রকাশ এবং মানবমনের উপর ক্রিয়াশীল সমস্ত শৃঙ্খলা ও বন্ধনের মুক্তি, মানবমনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিশীলিত করে যুক্তি ও বিশ্লেষণ, সামাজিক প্রথা ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধীয় রীতি নীতি প্রবর্তন। পরাবাস্তববাদী প্রবক্তারা এইসব নিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মানবমনের গভীরতল থেকে উৎসারিত নিখাদ অনুভূতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে এই অনুভূতিই শিল্প ও জ্ঞানের উৎস। তাই তাঁদের মূল লক্ষ্য হলো শিল্প কীর্তিতে অবচেতন মনের আত্মপ্রকাশ ঘটানো, এবং সেই কারণেই তাঁদের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম আপাত যুক্তিহীন অসংলগ্ন এবং পারম্পরজ্যবিহীন।

সুররিয়্যালিজম এক অর্থে ডাডাইজম এবং ফ্রয়েডিও মনোবিজ্ঞানের যুগপৎ বিক্রিয়াজাত এক ভাবধারা। একদিকে যেমন ডাডাইজেমের নিহিলিস্ট মতে আস্থা রেখে,সুররিয়্যালিস্টরা সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করে স্বাধীন মনোবৃত্তি প্রকাশকে প্রাধান্য দেয়, অন্যদিকে তেমনি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের গভীর অনুশীলন করে অবচেতন মনের বিভিন্ন অনুভূতির উদ্ভব ও প্রকাশভঙ্গির আঙ্গিককেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। এই অবচেতন স্তর যেন এক অধিবাস্তব চেতনলোক যেখানে স্বপ্ন, কল্পনা, চিন্তা এক সঙ্গে মিশে যায়। পরাবাস্তবতা বলতে শিল্পী ম্যাক্স আর্নষ্টও এমনটাই বুঝিয়েছেন এবং তিনিও সুররিইয়্যালিস্টদের কাজের লক্ষ্য নির্ধারণে বলেছেন- "to create a super-reality in which real and unreal– meditation and action– meet and mingle"।

ফ্রয়েড মানবমনকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন; সচেতন এবং অবচেতন। অবচেতন স্তর হল মানবমনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ যেখানে সবরকম প্রবৃত্তি জন্ম লাভ করে বা উদ্ভব হয়। এই স্তর প্রবৃত্তিজাত অনুভূতি গুলি সর্বদা সতেজ। কোন ব্যক্তির শৈশবাবস্থায় অবদমিত কোন আবেগের অনুভূতি বা প্রবৃত্তি তার বৃদ্ধাবস্থা ও জাগ্রত ও সতেজ থাকে। সঙ্গত কারণেই এই অবচেতন স্তর প্রবৃত্তি তাড়িত হওয়ায় সেখানে যুক্তি, নীতিবোধ ইত্যাদি কাজ করে না, অবচেতন মনের এই ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে ফ্লাইট নাম দিয়েছেন ইড বা মগ্নচৈতন্যের জগত। সুররিয়্যালিস্টরা ফ্রয়েডের বর্ণিত এই ইড বা মগ্নচৈতন্যকে শিল্পসাহিত্যে রূপায়িত করতে চাইলেন। কিন্তু অবচেতন স্তর যেহেতু স্বতঃউদ্ভূত এবং সচেতন ইচ্ছা অনিচ্ছা নিরপেক্ষ, তাই অবচেতন মানসকে আবাসিত করতে যুক্তি ও শৃঙ্খলা মুক্ত এক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির প্রয়োজন। পরাবাস্তববাদীরা বিশেষ করে আগ্রহী ছিলেন স্বপ্নাচ্ছন্ন ও মোহবিষ্ট অবস্থার পরিবেশনে। ফ্রয়েডের মতে মানবমনের অবচেতনস্তরে আবেগ ও অনুভূতির দুইটি তল আছে। একটি তলে জাতিগতভাবে অবদমিত অভিজ্ঞতা ধরা থাকে এবং এই অবস্থায় ওই অবদমিত অভিজ্ঞতা বা আবেগ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রকাশ পায়। অপর আরেকটি তলে ব্যক্তিগত অবদমিত প্রবৃত্তি বা অভিজ্ঞতা ধরা থাকে। এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-কলাপকে প্রকাশ করার জন্য পরাবাস্তববাদীরা অবচেতন মনকে প্রকাশ করার ঐকান্তিক প্রয়াসী। অবচেতনে উদ্ভাসিত আবেগকে সাহিত্য ও শিল্পে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষে তাঁদের মত হল যে একমাত্র এতেই সত্যের সার্বিক পূর্ণতা থাকে। কল্পনার কারণে জারিত হয়ে, নিয়মতান্ত্রিকতার জালে আবদ্ধ থেকে যে সত্য সাহিত্য বা শিল্পে প্রকাশিত হয়, তা পরিপূর্ণ সত্য নয়- হয়তো কল্পনা সমৃদ্ধ সত্যের আভাস মাত্র। প্রকৃত সত্য হলো সেটাই যা বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব বহির্ভূত অবস্থায় অবচেতন স্তর হতে উদ্ভাসিত হয়। কাব্যের মধ্যে যে সত্য তা ব্যক্তি মানুষ তারা পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত কিন্তু অবচেতন হতে উচ্চগ্রামের বাস্তবতা আছে।

এখানে সংক্ষেপে পরাবাস্তবতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে দেখা যেতে পারে-

১। পরাবাস্তববাদীরা অবচেতনের অবধামিত প্রবৃত্তি বা আবেগের প্রকাশক। এইসব অবদমিত আবেগ যেমন যৌনতা, সমকামিতা, রুচিরবিকৃতি,নীতিহীন ভাবনা যা সমাজ জীবনে আপত্তিকর বা নিন্দনীয়- তার সাহিত্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে এবং এর জন্য এরা সর্বপ্রকারের প্রচলিত আদর্শ ও মূল্যবোধকে পরিহার করে।

২। পরাবাস্তববাদীরা অভিনব প্রতিধর্মিতার সাহায্যে এবং প্রচলিত ছন্দবৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বর্জন করে চমকপ্রদ শব্দের প্রয়োগে যে সাহিত্য ভাবনা সৃষ্টি করেন তা অনেক সময়ই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। আপাত অসংলগ্ন ও প্রতীক ধর্মী ভাবনার সম্যক অর্থ বোঝার জন্যে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়।

৩। পরাবাস্তবাদের উদ্ভব হয়েছিল 'ডাডাবাদ' ও স্বপ্ন তথ্যকে ভিত্তি করে। তাই পরাবাস্তববাদীদের বক্তব্য বোঝার জন্য এই দুই মতবাদের সম্যক অর্থ বোঝা দরকার।

ফরাসি তথা ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্যে এই মতবাদের প্রভাব বেশ গভীর। এই মতবাদকে সামনে রেখে সাহিত্য রচনা করেছেন রেনেকার, পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ প্রমুখ। পরাবাস্তববাদের প্রভাব ক্রমশ ফ্রান্সের বাইরে ছড়িয়ে পড়তেই সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ এবং শিল্পকলা এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। চিত্রকলায় পরাবাস্তবাদের প্রয়োগ করেছেন সালভাদোর দালি, জন মিরো, পিকাসো, ম্যাস্ক আর্নষ্ট প্রমুখরা।

বাংলা সাহিত্যের পরাবাস্তববাদের অভিঘাত এসে পৌঁছে ছিল কল্লোল গোষ্ঠীর কবি সাহিত্যিকদের কাছে। অনেকে মনে করেন এই মতবাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। তার বহু কবিতাতেই এর লক্ষ ফুটে ওঠে। কবির ঘোড়া হাঁস প্যাঁচা ইঁদুর প্রভৃতি প্রতীকের মধ্যে প্রকৃত ও অপ্রকৃতির এই রহস্যময় সম্মিলন ফুটে উঠেছে। এছাড়া বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নানা কবিতায় এর ছাপ লক্ষ করা যায়।

২৫.৩ সিম্বলিজম

সিম্বলিস্ট বা প্রতিকবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় উনিশ শতকে ফ্রান্সে। বিজ্ঞানের জড়বাদ ও বাস্তববাদী সাহিত্য ভাবনার বিরুদ্ধে প্রতিকবাদীরা বস্তুজগতের বাইরের ভাবলোককে আবাসিত করতে চাইলেন প্রতীকের মাধ্যমে। প্রতীককে সাধারণভাবে বলা যায় "The refinement of the art of ambiguity to express indeterminate in human sensibilities and in natural phenomena"। প্রতীকবাদী আন্দোলন হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে যা পরিচিত তার প্রথম উদ্ভব ঘটে ফরাসি কাব্য সাহিত্যে বোদলেয়ারের হাতে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'Fleurs du mal' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই এর সূচনা ঘটে. অবশ্য তারপরেই বেশ কিছু সমর্থ কবি এই মতবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে পড়েন এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিতে এই কাব্য আন্দোলন রীতিমতো প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এঁরা হলেন রঁ্যাঁবো, ভার্লেন, মালার্মে এবং ভালেরি।

অর্থ ও ব্যবহারের দিক থেকে প্রতীকবাদকে দুই ভাগে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। বৃহত্তর অর্থে প্রতীকবাদের ভূমিকা ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র, সমাজবিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত। বিশেষভাবে প্রতীকবাদের প্রয়োগ শিল্পকলা ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত। সাহিত্যক্ষেত্রে সিম্বল ও অ্যালেগরির মধ্যে পার্থক্য করা হয়। প্রতীকের বাস্তব অবস্থান আছে, কিন্তু অ্যালেগোরিক্যাল চিহ্ন বা লেখকের ইচ্ছা প্রণোদিত। প্রতীক বলতে বোঝায় এমন কিছু যার একটা আলাদা ব্যঞ্জন আছে, এক হিসাবে ভাষায়

ব্যবহৃত শব্দগুলিও প্রতীক, কারণ প্রতীক সৃষ্টি করা ভাষার প্রধান ধর্ম। প্রত্যেক ভাষারঅবশ্য কিছু বহু ব্যবহৃত প্রতীক আছে, পুরনো আমলের কবিরায় তাঁদের বহুব্যবহারে রীতিশুদ্ধ ও মলিন করেন। পরবর্তীকালে কবিরা কখনো কখনো এই রীতি পাল্টান ফলে তারা ভিন্ন অনুসঙ্গ বহন করে। প্রচলিত রীতির প্রতীকের উদাহরণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি সূর্য, ময়ুখ্ক, পর্বত ইত্যাদি। কবিরা একটি শব্দকে উপমা-রূপকের গণ্ডি পেরিয়ে প্রতীকারিত করতে পারেন। প্রতীকবাদী সাহিত্য আন্দোলন কবিতাকে আশ্রয় করে শুরু হলেও পরবর্তীকালে ইংরেজি ও ইউরোপীয় কথা সাহিত্য ও নাটকে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত প্রতীকবাদই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সাহিত্যের প্রধান লক্ষণীয় বিষয় ছিল। কবি ও উপন্যাসিক নাট্যকার প্রত্যেকেই প্রতীকী সাহিত্যকেই রচনাশ্রেষ্ঠ মাধ্যম এবং শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ কৌশল বলে মনে করেছেন। এমন একটা ধারণাও প্রায় পৃথিবী জুড়ে সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায় যে মহৎ সাহিত্য মাত্রই ব্যঞ্জনাধর্মী - প্রতীকোদ্যেতনা ছাড়া মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই প্রতীকী আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা নন, কিন্তু প্রতীক ধর্ম তাঁর অনেক মহত্ব রচনারী সম্পদ স্বরূপ। গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতায় এই প্রতীক পেয়েছে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, বলাকা পর্বে তা মহাজাগতিক ব্যঞ্জনায় পরিণত হয়েছে। নাটকে প্রতীকী ব্যঞ্জনা তাঁর রচনায় স্বভাবধর্ম; ‘রাজা’, ‘ডাকঘর’ নাটকে তা আধ্যাত্মিক ফুর্তি পেয়েছে, এরপর ‘রক্তকরবী’ ও ‘মুক্তধারা’ নাটকে প্রতীক ধর্মের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছে। রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের মধ্যে সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত এবং উচ্চাঙ্গের প্রতীকি কবিতা আমরা পাই কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার মধ্যে। প্রতীকী ধারা অব্যাহত আছে বলা যায় এখনও। সাহিত্যের মহৎ ব্যঞ্জন সৃষ্টিতে প্রতীক অপরিহার্য বলেই মনে হয়।

২৫.৪ ন্যাচারালিজম

ন্যাচারালিজিম এর বাংলা প্রতিশব্দ যথাস্থিতবাদ এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রকৃতিবাদ।এই মতবাদ রিয়্যালিজম এর চূড়ান্ত রূপভেদ, কেননা এই মতবাদে মানুষকে প্রাণীরূপে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রেখে বিচার করা হয়। “Naturalism is claim to be an even more accurate picture of life then is realism”। ন্যাচারালিজিমে রিয়্যালিজমের সব লক্ষণই থাকে। কিন্তু তা সাধারণভাবে নয়, প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাট দিক, প্রকৃতি জগতের সামগ্রিক ঘটনা এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় পর্যন্ত উল্লেখিত হবে। এই মতবাদ সাহিত্যিক মতবাদ রূপে উপন্যাস সংরূপের সঙ্গে যুক্ত।

ন্যাচারালিজম বা যথাস্থিতবাদের দার্শনিক অবস্থান হল ডারউইন পরবর্তীতে জীববিজ্ঞানের চিন্তাধারা যা মানুষকে উন্নত শ্রেণীর প্রাণীরূপে বিবেচনা করে এবং প্রাকৃতিক জগতের বাইরের যে কোন দর্শন বা আধ্যাত্ন ভাবনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্রহিত অবস্থায় কেবলমাত্র বংশগতি এবং পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যথাস্থিতবাদী উপন্যাসও তাই বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞার উপরে নির্ভর করে মানুষের প্রবৃত্তি সঞ্জাত খুদা ও কামজ বাসনা এবং পরিবেশ নির্ভর সমাজ ভাবনা, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক ও নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।

ন্যাচারিলিজমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হলো-

১। রিয়্যালিজমের চরম রূপ হল ন্যাচারালিজম বা প্রকৃতিবাদ। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছুর যথাযথ রূপায়ণই ন্যাচারালিজমের লক্ষ্য।

২। প্রকৃতিবাদ ১৯ শতকের মধ্যভাগে ডারউইনের জীব বিদ্যা বিষয়ক তত্ত্বানুযায়ী মানুষকে তার বংশগতি ও পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীরূপে বিবেচনা করে মানব প্রকৃতির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তি প্রণোদিত নানাবিধ প্রবণতা যেমন কামজ বাসনা, হত্যা বা আত্মহত্যার প্রবণতা প্রভৃতিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ করে।

৩। প্রকৃতিবাদ বিশ্বাস করে যে মানব প্রকৃতির অভ্যন্তরে অপ্রকাশ্য এবং অব্যক্ত এমন কিছু বাসনা, কামনা ও আকাঙ্ক্ষা আছে যা সাধারণ বর্ণনায় অপ্রকাশ্য থাকার সম্ভাবনা বিদ্যমান। প্রকৃতিবাদী লেখক বীক্ষণাগারের নমুনা হিসাবে একটি চরিত্রকে উপস্থিত করেন এবং বিশেষ পর্যবেক্ষণে তার অন্তরলীন পাশবিক চৈতন্যের নানা রূপ ও দিকে আলোকপাত করেন।

৪। প্রকৃতিবাদী অন্তর্লীন পাশবিক চৈতন্য যেমন কামজ বাসনা, লোভ ও লালসা পতিতাবৃত্তি বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত করতে গিয়ে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন এবং উপন্যাস বা নাটক ট্রাজিক পরিণতি লাভ করে।

৫। প্রকৃতিবাদী সাহিত্যে মানবিক মহত্ব ও গৌরব, সৌন্দর্যচেতনা ও প্রেম - এসবের কোন স্থান নেই।

৬। প্রকৃতিবাদী সাহিত্যে চরিত্র মাত্রই সামাজিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের চাপে বিপর্যস্ত এবং প্রবৃত্তির কাছে অসহায়।

৭। প্রকৃতিবাদী সাহিত্যের ভিত্তি হল প্রাণিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা এবং অর্থনীতি। এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে চরিত্রসৃজনের সময় লেখকেরাও হয়ে ওঠেন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানী দৃষ্টিতে জড়বাদী বিশ্লেষণের ফলে এই মতবাদে ঈশ্বর, ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কার সবকিছুই বর্জিত।

ন্যাচারালিজিমের সূত্রপাত হয় ফরাসি দেশে। Edmond ও Jules Goncourt ভ্রাতৃদ্বয় 'Germinic Lacerteux' নামক এক সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে এই আন্দোলনের সূচনা করেন। Naturalism-এর প্রকৃত প্রবর্তক এমলি জোলা। এমলি জোলা তাঁর 'Le Roman Experimenta'-এ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার রীতি অনুযায়ী উপন্যাস রচনার কথা বলেন এবং উপন্যাস রচয়িতাদের নিরপেক্ষভাবে ক্ষুধা, যৌনচেতনা বংশানুক্রমিক নানাবিধ বিচ্যুতির খুঁটিনাটি বর্ণনা সহযোগে চরিত্র চিত্রণের উপদেশ দেন। মোপাসাঁর রচনাকে প্রথম রিয়ালিস্টিক বলে মনে করা হলেও পরে ন্যাচারালিজমের প্রবক্তারা তাকে আদর্শ ন্যাচারালিস্ট বলে মনে করেছেন। ন্যাচারালিস্টদের তালিকায় বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন সুইডিশ নাট্যকার অগাষ্ট স্ট্রিণ্ডুবার্গ, জার্মান নাট্যকার গেরহার্ট হাউপ্টম্যান এবং রাশিয়ান লেখক ম্যাক্সিম গোর্কী। ব্রিটিশ উপন্যাসিকদের মধ্যে টমাস হার্ডি, জর্জ মুর প্রমুখ। টমাস হার্ডির উপন্যাসে প্রকৃতিবাদী প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ডারউইনের মতবাদের ফলে মানুষের মহত্বের অবিশ্বাস, অকিঞ্চিৎকর নগণ্য

মানুষের লোভ, যৌনতা, হত্যা ও আত্মহত্যার প্রতি সাধারণ প্রবণতা - এসব নিয়েই তাঁর উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিবাদী ভাবনার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে শরৎচন্দ্রের লেখায়। বঙ্কিম ও রবীন্দ্র সাহিত্যে বাংলার পাঠক বাস্তবতার কিছুটা আঁচ পেলেও পল্লী বাংলার সেই বাস্তবতার ভয়াবহ রূপ দেখা গিয়েছিল শরৎ সাহিত্যে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প ও উপন্যাসে মানুষের ক্ষুধা, পিপাসা, কান্না, মধ্যবিত্তের ভাবধারার চোরাগোলি এসবের চরমতম প্রকাশ ঘটেছে। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিবাদী লেখকের সংখ্যা কম নয়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রত্যেকে এই বিশেষ মতবাদকে আশ্রয় করে সাহিত্য রচনা করেছেন।

একক ২৬ ❑ রিয়ালিজম ও সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম

গঠন

২৬.১ উদ্দেশ্য

২৬.২ রিয়ালিজস

২৬.৩ সোসালিস্ট রিয়ালিজম

২৬.৪ অনুশীলনী

২৬.৫ গ্রন্থপঞ্জি

২৬.১ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করলে সাহিত্য আন্দোলনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় সম্পর্কে জানা যাবে
- এই এককে রিয়ালিজম ও সোশ্যালিষ্ট রিয়ালিজম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

২৬.২ রিয়ালিজম

জগত জীবন ও প্রকৃতিকে বাস্তবনিষ্ঠ ও যথাযথ রূপে চিত্রিত করাযই রিয়ালিজম বাস্তববাদের মূল উদ্দেশ্য। রোমান্টিক ভাবকল্পনা, আদর্শবাদ, দুর্গামি ও অলৌকিক বিস্ময় ও রহস্য ইত্যাদির পরিবর্তে বস্তুজগতের বহিরঙ্গের নিখুঁত ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্রাঙ্কনই বাস্তববাদী লেখক শিল্পীদের অভিপ্রায়। স্থান কাল পাত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপায়ণে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নানা বিষয় ও সমস্যার উদঘাটন ও বিশ্লেষণে, বাস্তবসম্মত ভাষা ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে রিয়ালিস্টরা সৃষ্টি করতে চান সত্যের প্রতিয়মানতা।

ইউরোপে রিয়ালিস্টিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু সেই আন্দোলনের কোন গৃহীত নিয়ম, নীতি ও সিদ্ধান্ত ছিল না- এমনকি সাহিত্যের উপস্থাপনার রীতি বা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও বিষয় নির্বাচনেও কোন ঘোষিত নিয়ম বা ইঙ্গিত ছিল না। রিয়ালিস্টিক সাহিত্যকে কোন দিক থেকে বিচার করা হবে তার বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুপস্থিতির জন্য ফরাসি সাহিত্যে ফ্ল্যুবেয়ার, বালজাক ও মোপাসাঁর মধ্যে এবং আমেরিকান সাহিত্যে স্টেইনবেগ ও আন্ডারসনের মধ্যে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির বহু পার্থক্য লক্ষিত হয়। মধ্যযুগে রিয়ালিজম শব্দটি দর্শন ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। দর্শনের ক্ষেত্রে রিয়ালিস্টরা সংজ্ঞাবাদীদের বিরোধিতা করে শ্রেণীর ওপরেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করতেন। অর্থাৎ কোন একটি বস্তুর অস্তিত্বের উপর রিয়ালিটি আরোপিত না হয়ে তাদের শ্রেণী চরিত্রের উপর এই শব্দ আরোপিত হত। এই সমস্ত বিতর্ক দূরে সরিয়ে রেখে মোটামুটি ভাবে বলা যায় রিয়ালিজমের অর্থ হল নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে মানব চরিত্রের হৃদয় ও আবেগকে উন্মোচিত করা। উপন্যাসই বাস্তবকে যথাযথ রূপ দিতে পারে কেননা উপন্যাস সমাজ জীবনের নিচের তলার বাস্তবতাকেও টেনে আনতে পারে। বাস্তবতা উপন্যাস ও নাটকে যেভাবে কার্যকরী কাব্য বা কবিতায় ততখানি নয়, কারণ কবির কল্পনায় সেখানে সমধিক প্রাধান্য পায়। এই প্রসঙ্গে রিয়ালিজমের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

১। চরিত্র ও ঘটনাসমূহের বাস্তবনিষ্ঠা এবং পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ করা হয় রিয়ালিস্টট সাহিত্যে।

২। স্রষ্টা নিরপেক্ষ নিরাশক্তি সহকারে বাস্তবতা বর্ণনা করবেন।

৩। রূঢ় বাস্তবের মধ্যে গভীর জীবনসত্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়।

৪। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কথ্য ভাষা ব্যবহার করে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত ও উপেক্ষিতদের সমাজবাস্তবতার খুঁটিনাটিও সামগ্রিক বিষয় হিসেবে যথাযথ বর্ণিত হয়।

৫। জীবনের নগ্নতা বা ভয়ংকর তাকে মনস্তাত্ত্বিক পথে বিশ্লেষণ করা হয়।

৬। শৈল্পিক দক্ষতায় স্রষ্টা Probable impossibility-কে ও প্রাধান্য দিতে পারেন যেহেতু চরিত্রের বাস্তবতা জীবনের নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, হয় শিল্পীর নীতির দ্বারা।

৭। যেকোনো ধরনের 'ইম্পসিবল প্রবাবিলিটি' যেমন স্বপ্ন দর্শন, রোমান্টিক কল্পনা, প্রাচীন মূল্যবোধ ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি এখানে বর্জ্জিত হয়।

৮। রিয়ালিজম এক ধরনের যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিবাদী জীবন বিশ্লেষণ।

৯। রিয়ালিজম অতীত বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থেকে শুধুমাত্র বর্তমান কে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে।

১০। রিয়ালিজমের অর্থ 'ফটোগ্রাফিক পিকচার'-এর প্রদর্শন নয়, শৈল্পিক উৎকর্ষতার জন্য শিল্পীর মানসিক প্রতিফলনে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা থাকবে।

রিয়ালিজমের উদ্ভব ও বিকাশ

বাস্তববাদী বা রিয়ালিষ্ট লেখক বলতে বৃহত্তর অর্থে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের বহু লেখককে চিহ্নিত করা যায়। চতুর্দশ শতকের ইংরেজি কবি চসারের ' দ্য কান্ট্রিবেরি টেলস' বাস্তবতার এক অসামান্য উদাহরণ। এই গ্রন্থে চসারব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ব্যক্তির বিশ্বাস ও সংস্কার, নারীচরিত্রের মনস্তত্ত্ব, কথ্য সংলাপের ব্যবহার বাস্তববাদী দৃষ্টিতে চরিত্র উপস্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে ড্রামাটিক রিয়ালিজম এর সূত্রপাত করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ডিফো ও ফিল্ডিং-এর কথা সাহিত্যে বাস্তবতার নিদর্শন ছিল সাধারণ মানুষের সংলাপ ও আচার ব্যবহারের নিখুঁত অনুসরণে। এরপরেই উনিশ শতকে রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স ও

ইংল্যান্ডে। রিয়ালিজমের বিজয় যাত্রা শুরু হয়। রাশিয়ায় রিয়ালিজমের প্রভাব পড়ে গোর্কি, টলস্টয়, গোগল, টুর্গেনিভের রচনায় এবং আমেরিকার উইলিয়ম ডিন হাওয়েল-এর উপন্যাসে। রাশিয়ার সাম্যবাদী রিয়ালিজম নিয়ে উপন্যাস লেখেন হাঙ্গেরীর গেয়র্স লুকাস এবং জার্মানির ব্রেখট, যদিও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক।

ইংল্যান্ডে ডিফো, জেন অস্টিন, জর্জ এলিয়ট ও ফিল্ডিং-এর পর চার্লস ডিকেন্স-এর 'ডেভিড কপারফিল্ড' ও 'অলিভার টুইস্ট' গ্রন্থে লন্ডনের নিচেকার গোপন বাস্তবতাকে উপন্যাসের আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলেন। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাস্তববাদী প্রবণতার প্রভাব পড়ে নাট্যসাহিত্যে। ভিক্টোরিয়ান যুগে ইংল্যান্ডে নাটক ছিল, কিন্তু ভিক্টোরিয়ানরা সমাজের অন্ধকার দিকের প্রতিফলন নাটকের মধ্যে দেখাতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সময়ে নরওয়ের নাট্যকার ইবসন 'পিলার্স অফ সোসাইটি', 'এ ডল'স হাউস' প্রভৃতি নাটকে বাস্তববাদী বিশ্লেষণ এবং গভীর জীবন সত্য অন্বেষণের ছবি অঙ্কন করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদী আন্দোলনের অভিবাদ এসেছে বেশ কিছুটা দেরি করে। প্রধানত 'কল্লোল' ও অন্য কয়েকটি পত্রিকা কে কেন্দ্র করে কথাসাহিত্যে 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত যে সময়, সেই সময়েই কিছু তরুণ সাহিত্যিক এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনীষ ঘটক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক ভাবে বাস্তববাদী আন্দোলনকে আত্মস্থ করেন জগদীশ গুপ্ত।

২৬.৩ সোসালিস্ট রিয়ালিজম

সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম বা 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' কথাটির প্রবর্তক ম্যাক্সিম গোর্কি। গোর্কি সাহিত্যের বাস্তববাদকে সমাজতান্ত্রিক শব্দের দ্বারা বিশেষিত করার প্রেরণা পেয়েছিলেন কোথা থেকে তা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। গোর্কি বলেছেন 'সোসালিস্ট রিয়ালিজম'কথাটির সৃষ্টির প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন ইঙ্গেলস এর একটি মন্তব্য থেকে, যেখানে বলা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন গতি ও বিবর্তন, জীবনের চিরস্থির সত্য কিছু নেই। এই মতবাদটিকেই সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগ করে গোর্কি পূর্বেকার বাস্তবতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন। বালজাক বা ডিকেন্স-এর সঙ্গে একজন সমাজতাত্ত্বিক বাস্তববাদী পার্থক্য কোথায় তার সঙ্গত কারণে মার্কস বা এঙ্গেলস -এর দ্বারা আলোচিত হয়নি। রিয়ালিজম-এর যে ব্যাখ্যা তাঁদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, সেখানে গোর্কির অভিমত খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তার বিপরীত নয়, সুক্ষতর ও বিস্তৃতর বিশ্লেষণ মাত্র। মার্কস ও এণ্নগেলস শিল্প সাহিত্যকে 'উপরিকাঠামো'র অঙ্গ বলে মনে করেছিলেন এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি তার যুগ ও সময়ের সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বলে রায় দিয়েছিলেন। নিছক রীতি সর্বস্বতা নয়, বিষয় ও রূপরীতির ঐক্যই ছিল তাদের মতে শিল্প সাহিত্যের সার্থকতার শর্ত। শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন যান্ত্রিক বাস্তবতার কথা তারা বলেননি; এমনকি বালজাকের মতো অত্যন্ত সচেতন প্রতিক্রিয়াশীল লেখক ও প্রশংসা করেছিলেন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ গতি সম্বন্ধে এই ফরাসি রিয়ালিস্টর গভীর বোধের কারণে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতবাদ কিংবা দলীয় বক্তব্য প্রচারের

যন্ত্র বলে তারা শিল্প সাহিত্যকে মনে করেননি। নিছক শ্রমিকদের জীবন নিয়ে লেখা প্রকৃতিবাদী ও প্রচারধর্মী সাহিত্যকে তাঁরা প্রকৃত বাস্তববাদী রচনাবলে মনে করেননি; বাস্তববাদী সাহিত্য বলতে প্রতিনিধিমূলক পরিস্থিতিতে প্রতিনিধিত্বস্থানীয় চরিত্রের সত্যনিষ্ঠ রূপায়ণকে বুঝিয়েছেন।

সাহিত্যের এই বাস্তববাদী দৃষ্টিকে গোর্কি সাহিত্যে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্যই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' কথাটি গঠন করেন। ইতিহাস নিত্য বিবর্তনশীল, মানব জীবন এবং সাহিত্যও তাই। দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের অগ্রগতি। নবীন ও প্রাচীন প্রথার দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের অবসানে নবীনের প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়ম যদি এই হয়, তাহলে পৃথিবীতে এমন কোন সত্য আছে কি যা এক ও ধ্রুব? বাস্তবকে এদিকে লক্ষ্য করে গোর্কি বলেছেন- সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীর লক্ষ্য হচ্ছে, প্রাচীন পৃথিবীর টিকে থাকার ও তার ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং সেই প্রভাবকে সমূলে উৎপাটিত করা। বুর্জোয়া সাহিত্য যে বাস্তবানুরাগ চোখে পড়ে, গোর্কি মনে করেন তা হচ্ছে সমালোচনামূলক। এই সমালোচনার পিছনে থাকা শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার জন্য এক ধরনের রণকৌশল। বুর্জোয়াদের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিয়ে তাদের শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখায় মূলকথা। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার লক্ষ্য সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং বিপ্লবী সম্ভাবনার উন্নতিসাধন। এক কথায় বলা যেতে পারে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার মূল লক্ষ্য হল - জীবন হচ্ছে শ্রীজনধর্মী কর্মযজ্ঞ, যার লক্ষ্য স্থায়িত্ব ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে পৃথিবীতে সুখে বাস করার জন্য নিজেদের একই পরিবারভুক্ত মানুষ হিসাবে গণ্য করা।

আলোচনার এই প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যেতে পারে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' সাহিত্য রচনা পদ্ধতি হিসেবে কেমন? এটি সাহিত্য আন্দোলন হিসেবে কতটা বিশেষত্বপূর্ণ? যদি কোন বিশিষ্ট রচনার ইতি কে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বলি তাহলে সেই রীতিটি কার? গোর্কির? না ব্রেশটের? মায়াকভস্কির? না পল এলুয়ারের? ইতিহাসের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যখন প্রাচীন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে প্রলেতারিও বিপ্লব পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জয়যুক্ত হচ্ছে তখনকার সাহিত্য রচনা পদ্ধতি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী পদ্ধতি। এর জন্য রাশিয়ায়, যদিও এখন এর বিস্তার পৃথিবীব্যাপী। লক্ষ্য করা যায় সামাজিক বিরোধ ও বৈপরীত্য যখন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে থাকে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের সমস্যা প্রবল হতে থাকে তখনই এই ধরনের সাহিত্য শাখার জন্ম ও বিস্তার। অতএব এর জন্মের পিছনে একটা বিশেষ সামাজিক পরিবেশ সক্রিয়। তাহলে কি এই ধরনের সাহিত্যকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শিল্পকর্মের উপর গণ্য করা হবে? আর্নাস্ত ফিশার সম্ভবত এই কারণেই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' ও 'সমাজতান্ত্রিক শিল্প'কে সমার্থক দুটি কথা বলে গণ্য করেছিলেন। গোর্কির সমকাল মার্কসবাদী সাহিত্যকে 'প্রলেতারিও শিল্প' বা 'সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রী শিল্প' বলে চিহ্নিত করা হতো। রাশিয়ার শিল্প সাহিত্যের উপজীব্য ও ভঙ্গিকে বিশেষ নামে চিহ্নিত করার প্রয়াস থেকে এই সোশালি স্টিয়ালিজম কথাটিআলেক্সি তলস্তয়-এর 'মনুমেন্টাল রিয়ালিজিম' বা পরবর্তীকালে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য রোজার গরোদি এবং আর্নস্ত ফিশার কর্তৃক সমর্থিত 'লিমিটলেস রিয়ালিজম' কথাটির চেয়ে শুধু জনপ্রিয় নয়, তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুপ্রতিষ্ঠিতও।

গোর্কির মতে সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের কেন্দ্রে হল মানুষ। অসংখ্য দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে

লেখককে যুক্ত হতে হবে, যুক্ত হতে হবে শ্রমের সঙ্গে, জাগিয়ে তুলতে হবে সমষ্টিগত দায়িত্বের চেতনা, মানুষের জন্যই শিল্প; জীবনের জন্যই শিল্প। তাঁর কথাতেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সারতত্ত্বটি নির্দেশ করা যাক; "Its main task– however– is to promote a socialist and revolutionary world understanding and worldsensation"

২৬.৪ অনুশীলনী

১। ক্ল্যাসিসিজম কাকে বলে? এর উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে আলোচনা করো।

২। রোম্যান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৩। ক্ল্যাসিসিজম ও রোম্যান্টিসিজমের মধ্যে পার্থক্যগুলি লেখো।

৪। অধিবাস্তববাদ সাহিত্য বলতে কী বোঝ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করো।

৫। বাস্তববাদী সাহিত্য আন্দোলনের মূল কথাগুলি আলোচনা করো।

৬। ন্যাচারালিজম ও রিয়ালিজম সাহিত্য আন্দোলনের পার্থক্যগুলি সূত্রাকারে লেখ।

৭। প্রতীকবাদী সাহিত্য আন্দোলনের চর্চা কোথায় প্রথম শুরু হয়? প্রতীকবাদী সাহিত্য বলতে তুমি কী বোঝো।

৮। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রবর্তক কে? কোথায় এই আন্দোলন প্রথম শুরু হয়? এই আন্দোলনের মূল কথাগুলি লেখো।

২৬.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় - সাহিত্য বিবেক

২। কুন্তল চট্টোপাধ্যায় - সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

৩। হীরেণ চট্টোপাধ্যায় - সাহিত্য প্রকরণ

৪। নবেন্দু সেন - পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা

৫। সাহিত্য সন্দর্শন , শ্রীশচন্দ্র দাস

একক ২৭ ❑ কল্লোল যুগ, হাংরি আন্দোলন

গঠন

২৭.১ উদ্দেশ্য

২৭.২ প্রস্তাবনা

২৭.৩ কল্লোল যুগ

২৭.৪ হাংরি আন্দোলন

২৭.৫ অনুশীলনী

২৭.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে-

- কল্লোল যুগের সাহিত্য চেতনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।
- হাংরি আন্দোলন কোন সময় হয়েছিল এবং এই বিশেষ সময়ে সাহিত্যিক প্রবণতা গুলি কেমন ছিল সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারবেন।

২৭.২ প্রস্তাবনা

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আন্দোলন বলতে সেটাকেই বোঝানো হয় যা সাহিত্যকে অন্যখাতে বইয়ে দিয়ে প্রচলিত সাহিত্য ধারার পরিবর্তন ঘটায়, গতানুগতিকতাকে অস্বীকার করে নতুনত্বের সন্ধানী হয়। চিরাচরিত ধারাকে সমালোচনার কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে সাহিত্যের নানান পরীক্ষা চালায় এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাময়িক কিংবা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। বিশ্ব-শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিনায় নানান আন্দোলন ঘটে গেছে নানা সময়। এক একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এক এক সময়ে শিল্পের এক একটি রীতিকে কেন্দ্র করে। বাংলা সাহিত্যে এমনই দুটি আন্দোলন হল কল্লোল ও হাংরি।

২৭.৩ কল্লোল যুগ

গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সাহিত্যে এসেছিল নতুন প্রাণ প্রবাহ। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের জীবনকালে তাদের পরিব্যাপ্ত প্রভাবের দিনেই বাংলা সাহিত্যের এসেছিল নতুন চেতনা। একদল তরুণ কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল এই সময় পর্বে। যাঁরা বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত হয়েছিলেন নতুনত্বের দাবি নিয়ে। জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে সৃষ্টির জন্য নানা উপকরণ সংগ্রহ করে এনেছিলেন এঁরা। সেই বহুল উপকরণ দিয়ে তাদের সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম এক নতুন পরিচয় লাভ করেছিল। সুগভীর দেহত্তীর্ণ প্রেম চেতনার সঙ্গে বিক্ষুব্ধ দেহকামনার জটিল সম্পর্ককে অবচেতনার মাধ্যমে নতুন তাৎপর্যদান, নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের সংশয় সংগ্রাম ও জটিল রূপ বিন্যাস, মানুষের আদিম প্রাণপিপাসা ও প্রবৃত্তির অনাবৃত রূপ - তাঁদের সাহিত্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল।

বন্ধন অসহিষ্ণু তরুণ সাহিত্যিকরা ভাঙতে চেয়েছিলেন পুরনো মূল্যবোধ, যদিও নতুন মূল্যবোধ বা জীবনপ্রত্যয় তখনও করায়ত্ব হয়নি সুনিশ্চিতভাবে। এই দ্বিধা বা অনিশ্চয়তা এ যুগের তরুণ সাহিত্যিকদের যন্ত্রণার অন্যতম উৎস। এই যুগে তরুন লেখক গোষ্ঠী মুখ্যত 'কল্লোল' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩০), 'কালিকলম' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩) এবং 'প্রগতি' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩) পত্রিকা কে কেন্দ্র করে সাহিত্যে রবীন্দ্র উত্তর যুগ প্রবর্তনের সংকল্প করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে ভাবসঙ্গতির দিক থেকে সমকালীন 'উত্তরা', 'আত্মশক্তি', 'ধূপছায়া' ইত্যাদি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে পুরধা পত্রিকা 'কল্লোল'এর নাম অনুসারে এই লেখকবৃন্দ মুখ্যত 'কল্লোল গোষ্ঠী' নামে অভিহিত হন। এরা বাংলা সাহিত্যের এই পর্বকে 'কল্লোল যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। এই গোষ্ঠীর অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, ''যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষ্যই বিদ্রোহ আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ"। কেবল সাহিত্য সম্পর্কে নয়, সমাজ রাজনীতি ধর্ম নৈতিক চেতনা - এক কথায় সমগ্র জীবন সম্পর্কে এক সংশয়পীড়িত মূল্যবোধ দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল পর্বে। প্রচলিত মূল্যবোধ এই সময় পর্বের তরুণ যুবকদের কাছে ম্লান-বিবর্ণ মনে হয়েছিল। চারপাশের কোন কিছুর প্রতি গভীর আস্থা বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা এই যুব সমাজের অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যবোধকে তীব্রতর করেছিল। কল্লোল সময় পর্বে যেসব বিশিষ্ট লেখক বা সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্য নির্মাণ করছেন, তাঁদের সকলেরই কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে মহাযুদ্ধের সূচনা পর্বে ও তার অব্যবহিত পরবর্তী সময় পর্বে। স্বাভাবিকভাবেই বিপর্যস্ত মানসিকতা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁদের সাহিত্যে।

বাস্তবতার সীমাকে প্রসারিত করার জন্য সমাজের অবজ্ঞাত অংশকে সাহিত্যে তুলে ধরার চেষ্টা কল্লোলের সব কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে লিখেছেন, কল্লোল 'সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লা কুঠিতে,খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যিক্ত এলাকায়।' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন অকৃতার্থ মানুষের জীবনের ছবি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসটিতে বস্তিবাসী

মানুষ ও পরিবেশের ছবি তুলে ধরেছেন। যুবনাশ্বের 'পটলডাঙ্গার পাঁচালি'তে পটলডাঙ্গা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের নিম্নবিত্তীয় মানুষদের জীবনসংগ্রামের নগ্নরূপকেই ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া এই সময়পর্বের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল - গোকুল নাগের 'পথিক', বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া', 'ধূসর গোধূলি' ইত্যাদি। কল্লোল যুগের সাহিত্য প্রবণতাগুলিকে সুত্রাকারে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন :

ক। কল্লোলের সাধনাই ছিল নবীনতার সাধনা। যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি। এই দিক থেকে এরা নিজেদের আধুনিক বা প্রগতীপন্থী মনে করেছেন। 'কল্লোল' বলতে এই গোষ্ঠীর লেখকেরা বুঝতেন, উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আন্দোলন। কারণ আধুনিক মানেই প্রগতিপন্থী। প্রগতি মানেই প্রচলিত মতানুগত না হওয়া।

খ। প্রচলিত সমাজ ধর্ম নীতি ও প্রেম সম্পর্কে আদর্শবাদী চিন্তাধারার অভাব। এক ধরনের সংশয় ও নাস্তিক বুদ্ধির উদ্ভব। সেই সঙ্গে প্রচলিত মূল্যবোধ ও কথা সাহিত্যের বিষয় ভাব ও আঙ্গিক ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের মনোভাবেই রবীন্দ্র বিরোধিতার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়েছিল। রবীন্দ্র বিরোধিতার আগে থেকেই দেখা দিয়েছিল বিদেশি সাহিত্য ও ভাবধারার ব্যাপক অভিঘাত।

গ। এই বিদ্রোহের অন্যতম পরিচয় হলো, কথা সাহিত্যের বিষয় সীমার প্রসার ও বৈচিত্র সাধন। উপন্যাস গল্পের কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পূর্বতন সাহিত্যের যেসব উপকরণের অভাব ও স্বল্পতা ছিল, সেই সব উপকরণ নিয়ে গল্প উপন্যাস রচনার মনোননিবেশ করা হয় এই সময়ের সাহিত্যে।

ঘ। তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠ বা রিয়ালিজম এর দিকে ঝোঁক । ভারতবর্ষ প্রবাসী বসুমতি বঙ্গবাণী ইত্যাদি সমকালীন পত্রিকায় যে বাস্তব প্রবণতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল কল্লোল গোষ্ঠী তাকে আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তুললেন। এই বাস্তব প্রবণতার একদিকে যৌনমনস্তত্ত্বের অসংখ্য রূপায়ণ অন্যদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের অভাব অভিযোগ জনিত দুঃখবোধের প্রকাশ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অনুসরণ করে নিরাশক্তভাবে সমগ্র জীবনকে নিরীক্ষণ করার নামে অনেক ক্ষেত্রেই এরা কেবল জীবনের পঙ্কিল কদর্য ঘৃণ্য দিকটাকেই একমাত্র বাস্তব সত্য বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ বাস্তবতার অনুসরণ করতে গিয়ে এঁরা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে। বাস্তবতার সঙ্গে নিয়ে প্রচলিত বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও স্বীকার করতে হয় যে পূর্বতন আদর্শ বাদের বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় এ যুগের লেখকদের হাতে, অন্তত বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাস্তবতার পরিচয় অবশ্যই ফুটে উঠেছে।

ঙ। কল্লোল একদিকে বাস্তব বিষয় তথা বাস্তব জীবনের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে কল্লোল পন্থীরা হলেন ভাঙন ধর্মী নেতিবাচক যৌবন চেতনার শিল্পী। সবকিছু পুরনো প্রচলিতকে ভেঙে ফেলার যে উন্মাদনা, যে দুঃসাহস এবং অনির্দেশ্য সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার যে বেপরোয়া মনোভাব তার মূলে আছে রোমান্টিক প্রবনতা। এই রোমান্টিক প্রবণতার প্রকাশ হয়েছে এ যুগের গল্প উপন্যাসের রূপায়িত মধ্যবিত্ত তরুণের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়। এ যুগের গল্প উপন্যাসে যে রোমান্টিক তরুণের সাক্ষাৎ

পাওয়া যায় তার সাধারণ রূপটির বর্ণনা প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন "আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে - এই যন্ত্রণাটা এই যুগের যন্ত্রনা"

২৭.৪ হাংরি আন্দোলন

হাংরি অন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এপ্রিল, ১৯৬২ সালে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও দেবী রায়। হাংরি সাহিত্য আন্দোলন একটি আভাঁগার্দ সাহিত্য আন্দোলন। আভাঁগার্দ কবি বা লেখকেরা কোন নির্দিষ্ট ধরনের চিন্তা বা বিশ্বাসের জেলখানায় বন্দি থাকেন না। লেখা তাদের কাছে এক ধরনের গরিলা যুদ্ধ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মানুষকে পুতুল করে ফেলে। ক্রমাগত পুতুল সমাজের ভন্ডামি সততা ও মানবিক বিপন্নতা দেখতে দেখতে এ ধরনের লেখকেরা বিপন্ন বোধ করেন। পুতুল সমাজকে তারা সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রমাগত ভাষার উপর আক্রমণ চালিয়ে যান এবং তৈরি করে নেন এক 'অপর ভাষা'। বিশ্ব সাহিত্যে যতগুলি সাহিত্য আন্দোলন হয়েছে হাংরি সাহিত্য আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম। এই সাহিত্য আন্দোলনের একটি বড় অংশই কবিতা। এটা মূলত একটি ভাষা আন্দোলন। ভাষাকে আক্রমণ করে ভাষাকে বাঁচানোই ছিল হাংরি সাহিত্য আন্দোলনের মূল স্পিরিট। ফলত প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক কবি লেখকেরা যারা ক্ষমতার নির্দিষ্ট ভাষায় লিখে থাকেন তাদের আক্রমণ শুরু হল এদের উপর। আমেরিকার বিখ্যাত 'টাইম ম্যাগাজিন' বাংলা সাহিত্যের হাংরি আন্দোলনকারীদের নিয়ে ছবিসহ খবর করেছিল। শৈলেশ্বর ঘোষ টাইম ম্যাগাজিনের সাক্ষাৎকারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন- 'মাই থিম ইস মি', এটাই পরবর্তী হাংরি সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। হাংরি রচয়িতারা সকলেই নিজেকে ব্যবহার করতে শুরু করে তাদের লেখায়।

মুক্ত কবিতার ইস্তেহারে শৈলেশ্বর ঘোষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে হাংরি সাহিত্যকে বিচার করতে হবে। "সমস্ত ভন্ডামীর চেহারা মিলে ধরা। শিল্প নামক তথাকথিত ভুসিমালে বিশ্বাস না করা। আপাদমস্তক কেবল নিজেকেই ব্যবহার করা। এস্টাবলিসমেন্ট-এর চাকর না হওয়া। যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে ঘৃণা করা। সত্যকে সরাসরি বলা। যুক্তির স্তর পার হয়ে গিয়ে দ্রষ্টা হিসেবে জীবনকে দেখা ও প্রকাশ করা। সাধারণ কথ্য ভাষাকে দুমড়ে-মুচড়ে ব্যবহার করা। অভিজ্ঞতা ছাড়া সত্যকে ধরবার কোন উপায় নাই। শুদ্ধ বুদ্ধি জীবন সত্যকে ধরতে পারেনা। সমাজ যেসব শব্দকে অশ্লীল বলে বর্জন করে এবং যে চিন্তাকে দূষণীয় বলে ধিক্কার দেয় তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমসাময়িক জীবনের অনেক সত্য সেগুলিকে ব্যবহার করা। অস্তিত্বের গোপনতম প্রদেশে লুকানো যা কিছু ক্রমাগত মানুষকে মিথ্যের দিকে নিয়ে যায়, মুখোশের দিকে নিয়ে যায় তাকে প্রকাশ করা। জীবনের ভয়ানক রিলেশনগুলি প্রকাশ করা। চেতনাকে অরাজক করে তুলে বুদ্ধির জগতের বাইরে গিয়ে বোধের জগতে চলে যাওয়া। মধ্যবিত্তের রুচি ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করা। মৃত্যু আর যৌনতা যা মানুষের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেয় লেখায় সেই রুদ্ধ চেতনাকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া। অবশেশন গুলিকে লেখায় মুক্তি দিতে হবে জীবনকে ত্যাগ করে নয় জীবনের কাদামাটি অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে গিয়ে আবার বেরিয়ে

আসা। জীবন বিরোধী এই সভ্যতায় নিজেকে করে তুলতে হবে প্রতিবাদের প্রতীক। বুর্জোয়া সুখ ও সিকিউরিটি বর্জন করা।"

এই সাহিত্য আন্দোলনের একেবারে প্রাথমিক পর্ব থেকে কবিতা লিখেছেন প্রদীপ চৌধুরী সুবো আচার্য, শৈলেশ্বর ঘোষ। এর একটু পরে ফাল্গুনি রায়, অরুণেশ ঘোষ। আজ এ কথা জোরে সঙ্গে বলার সময় এসেছে যে এরা সকলেই প্রতিভাধর। শুধু এদের মধ্যে কেন সমগ্র বাংলা কবিতার সঠিক ইতিহাস রচিত হলে শৈলেশ্বর গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাবেন- এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

গদ্যকার হিসেবে শক্তিশালী বাসুদেব দাশগুপ্ত ও সুভাষ ঘোষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাসুদেব বাংলা গদ্যের প্রচলিত রীতিনীতি ভেঙে দিয়েছিলেন। বাসুদেব তার গদ্যে স্বপ্নের ভাষা ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতপক্ষেই বাসুদেব স্বপ্ন বাস্তবের দ্রষ্টা। অন্যদিকে সুভাষ ঘোষ যিনি বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে আমৃত্যু আপোশহীন যোদ্ধা। সুভাষের লেখায় কোন গল্প নেই। গল্পকে খুন করেছে তাঁর গদ্য। সুভাষ তাঁর রচনায় গা-গতরের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

২৭.৫ অনুশীলনী

১। বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগ কোন সময়টাকে বলা হয়? কোন কোন পত্রিকাকে একত্রে কল্লোল গোষ্ঠী বলা হয়? এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ প্রবণতার কথাগুলি লেখো।

২। হাংরি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে এই সময় পর্বের সাহিত্যিক প্রবণতাগুলি আলোচনা করো।

২৭.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। সমীর চৌধুরী সম্পাদিত - হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন

২। মলয় রায়চৌধুরী - হাংরি কিংবদন্তী

৩। শৈলেশ্বর ঘোষ - হাংরি জেনারেশন আন্দোলন

৪। সন্দীপ দত্ত - বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price: ₹475.00
[Not for sale]

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector - I, Salt Lake, Kolkata - 700 064 and
Printed at Classic Print & Process, 20B, Sankharitola Street, Kolkata - 700 014, Mob. : 98303 48209